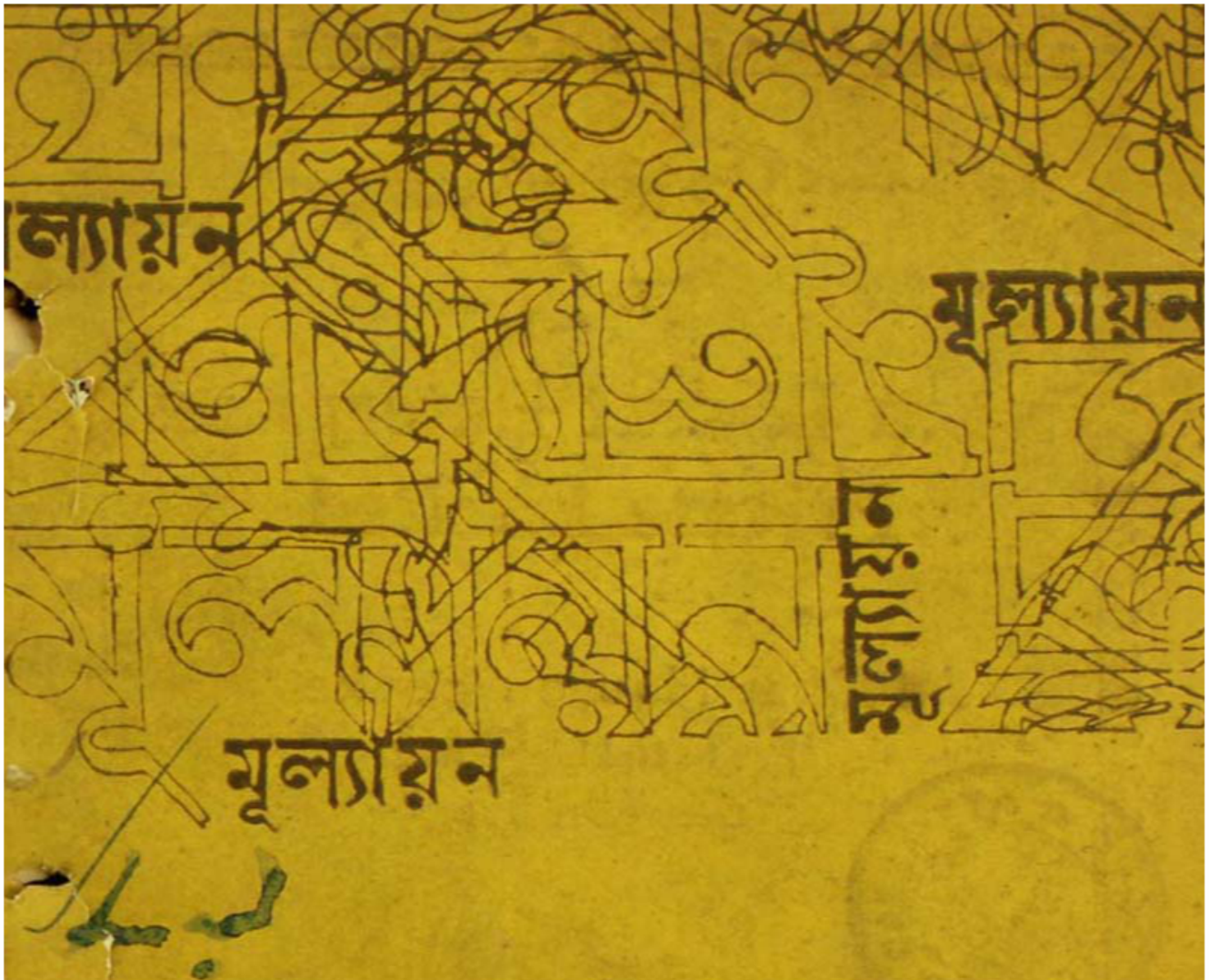

নেহরুর সমাজতন্ত্র ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ / জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা / সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম / জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা / নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ / বিদ্যাসাগর ও রায়ত / জাতীয় আন্দোলনের অপব্যাখ্যা / ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ সমীক্ষা / শ্রমের নান্দনিকতা / আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্ভব / ব্যক্তিপূজা / সি পি আই-সি পি এম : মৈত্রীর সমস্যা / চীন নিয়ে সি পি এম-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব / কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস / সোভিয়েতের স্তালিন-চিন্তা / চে গুয়েভারা

শারদীয়
১৩৮৭

দাম : পাঁচ টাকা

With Best Compliments From :

Nava Bharat Enterprises Private Limited

Nilhat House Annexe

11 R. N. Mukherjee Road

Calcutta-700001

Regd. Office :

"Nava Bharat House"

6-3-654 Somajiguda

Hyderabad-500004

Other Branches :

BOMBAY ● COCHIN

MADRAS ● GUNTUR

With Best Compliments From :

M/s EAST INDIA CORPORATION

14, Netaji Subhas Road, (2nd Floor)
Calcutta-1

Phone : 22-7975 & 22-1987

Milkos & Milk Up

The Sterilised Flavoured Milk Drink

Eastern Milk Foods

249 Bepin Behary Ganguly Street
Calcutta-12

With Compliments From :

M. Dutta Agency

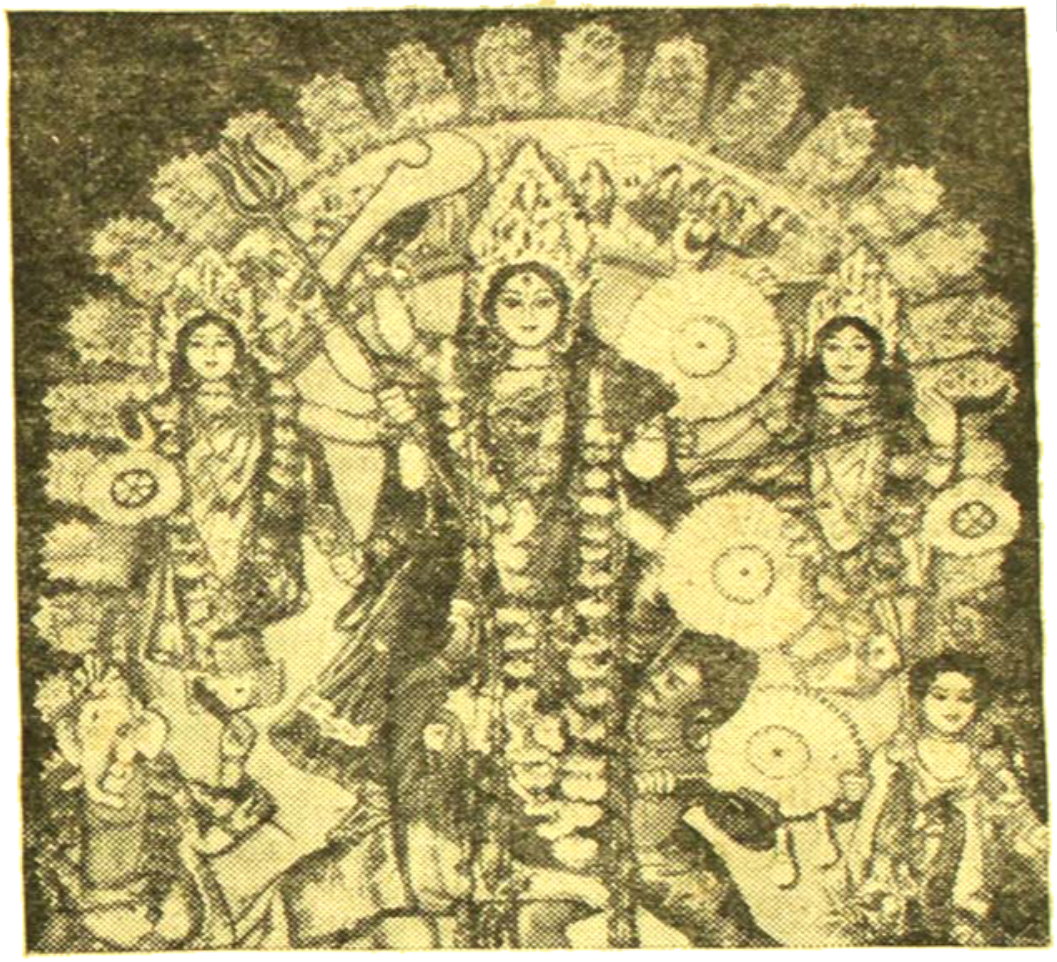

উৎসবের আনন্দে

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

Dey's

দে'জ মেডিকেলের তৈরী

PK/K.P 2A/80

Central Bank's Family Welfare Plans

Extra income every month without work or worry

MONTHLY INTEREST DEPOSIT SCHEME
Deposit Rs. 1.000/- or more for 12 months and over—get interest in cash every month—extra money to meet extra expenses. Interest ranges from 7% to 10% p.a. for 12 to 120 months.

Save right at home without stepping out.

CENTRAL'S MINI DEPOSIT SCHEME
You can open an account With as little as Re. 1/- and thereafter save any amount in multiples of 50 Paise for 36 months or 60 months. Our Authorised Collection Agent Will come to your doorstep at your convenience to collect your deposit. Interest at 6% and 7% p. a.

Gift a future to your young ones

MONEY MULTIPLIER DEPOSIT SCHEME
Deposit Rs. 100/- or multiple of it for 12 to 120 months. Your deposit becomes more than double in 87 months and becomes more than $2\frac{1}{2}$ times in 120 months. Take care of your family's future requirements. Interest from 7% to 10% p. a. compounded quarterly

A little means a lot

RECURRING DEPOSIT SCHEME
The ideal scheme for salaried people. Save as little as Rs. 5/- or its multiples every month for any period form 12 to 120 months. See your money grow with interest. Interest at 7% to 10% p.a. compounded quarterly.

And that's not all

You have Central's QUARTERLY INTEREST DEPOSIT SCHEME to take care of your 'extra' expenses. And HOME SAVINGS SAFE ACCOUNT to save when you can, withdraw when you need. Come. Open an account at your nearest Central Bank branch. Watch your plans take concrete shape.

CENTRAL BANK OF INDIA

(A Government of India Undertaking)
The Bank that moves out to people and places

-: UNITS :-

Wide choice for
Wise men
Who care for

1) Safety of Capital
2) Attractive Return
3) Easy Encashability
4) Exclusive tax-exemptions while selecting media of investment

DIVIDEND DECLARED FOR 79-80—10%

For details, Contact—Any Bank/Post Office/ approved agents or.

UNIT TRUST OF INDIA

(A Public Sector Financial Institution)
4, Fairlie Place, Calcutta-700 001
Phone : 23-9391, 23-1638

With best compliments from :

Phone : 58-2019

M/s GREAT INDIAN BAKERY

Bakers & Confectioners

Barasat Road, Sodepur
24 Parganas

Manufacturers of :

Sliced and Plain Bread, Pastries, Cakes, Vegetables, Mutton and Chicken Patties etc.

With Best Compliments From :

M|s BENGAL POTTERIES Ltd.

Makers of Fine Dinerware & Insulator

Regd. Office

THAPAR HOUSE (8th Floor)
25 Brabourne Road
Calcutta-1

Phone : 27-6149, 27-2741 & 27-9913

Factory-1	Factory-2	Factory-3
45 Tangra Road,	3, Pagladanga Road,	P-24, Taratola Road
Calcutta-15	Calcutta-10	Calcutta
Phone : 24-7869 24-7506	Phone : 24-2482	

With Compliments From :

Phone : 26-6606

U. P. Glass Stores

AGENT :

Bengal Potteries Ltd.

Crockery, Enamel, Glassware, Crystalware & Cutlery
Merchants and General Order Suppliers.

Head Office :
16, Synogogue Street
Calcutta-700001

Show Room :
109A/1A, Biplabi
Rashbehari Bose Road
(Canning Street)
Calcutta-700001

With Best Compliments From :

STEEL CITY BEVERAGES PRIVATE LTD.

NO.-1, TARATOLA ROAD
CALCUTTA-700043
Phone : 45-5958

Authorised Bottler of "DOUBLE SEVEN"
"NOVA"—ORANGE, LIME AND SODA

With Best Compliments Of :

East Anglia Plastics (India) Limited

145 JESSORE ROAD

CALCUTTA-700 055

Phone : 57-2821 (3 lines)

With best compliments of :

Phone : 35-7511
35-8226

Santosh Biscuit Co. (P.) Ltd.

Santosh Bhawan
Calcutta-54

Space Donated by :

A Well Wisher

With Best Compliments of :

The Indian Tool Manufacturers Ltd.

101 Sion Road, Sion, Bombay 400 022

Make a Precision Decision—Choose from—
"DAGGER" Twist Drills, Reamers, Cutters, Taps, Tool Bites and Outside Micrometers
"DAGALLOY" Carbide Tools, Tips, Inserts and Wear Resistant Parts
"DAGGER-SAACKE" Gear Hobs and Gear Shaping Cutters
Factory : BOMBAY ● NASIK ● AURANGABAD

Phones : Regd. Office
44-1201
44-1206
44-1253
Sodpur : 58-2919
58-2938
Belgharia : 58-1674

Gram : KINGTOR
Telex : TORKING CA 7083

With Best Compliments From :

Agarwal Hardware Works Private Ltd.

Works & Godown :

2, Ishwar Chatterjee Road, Sodpur
5/1B M. M. Fidder Road,
Calcutta-57

Regd. Office :

3A Shakespeare Sarani
Calcutta-700071

With Best Compliments From ;

Messrs. Paul Bakery & Biscuit Factory

Kankarbagh Road
Patna-20 (Bihar)

With Best Compliments From :

Patna Confectionary Store

Karbigahiya
Patna-800001
(Bihar)

With Best Compliments From :

Global Enterprises

4, Synagogue Street, (6th Floor)
Calcutta-1

Space Donated by :

A Well Wisher

The chosen one.

For your transistor.

Red Eveready

নিজসংগ্রহে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ
পাঠাগারে রাখার মত বই

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নাট্যচিন্তা ঃ শিল্পজিজ্ঞাসা

দাম ঃ ত্রিশ টাকা

নির্মল সাহিত্য মন্দির
৩৬১বি, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬

মনীষা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানে পাবেন।

M/s Lal Bihari Sharma & Sons
Railway Station, Gaya Jn. (Bihar)

"Famous fruit seller at the Station and Station
Premises at Reasonable Rate."

BHARAT BAKERY

*"Specialists in Manufacturing of Buns—
Pastry and Biscuits."*

Swaraj Puri Road, Gaya,
near Bharat Seva Asram Sangha, Gaya.

With Best Compliments From :

Imperial Calendar Co. (Pvt.) Ltd.

46, Metcalf Street

Calcutta-700013

With Best Compliments From t

Veena Trading Corporation

Khazanchi Road
Patna-4

Govt. & General Order Suppliers of
Sweet Box, Ex. Book, Register, File

With Best Compliments From :

Golden

Ice Cream

MFD. BY : **Golden Dairy Products**
Exhibition Road, Patna-800001
Tel.-23307

With Best Compliments From :

Girju Press

Kadam Kuan
Rajendra Rajpath
Patna-4 (Bihar)

With the Compliments of :

Display Crafts of Calcutta

321/1 Diamond Harbour Road
Calcutta-700034

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

ভারতীয় বনৌষধি—কালিপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ,
মুখ্য সম্পাদিকা—ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়—
(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতি খণ্ড ৩০·০০

লোকনাট্য যাত্রাগান—মন্মথ রায় ৫·০০

ঋষি কবি গুণী শিল্পী—দিলীপ রায় ৬·০০

মনসা মঙ্গল—দ্বারিকা দাস সম্পাদিত—ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ২৫·০০

মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা)
—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৫·০০

Asoka—D. R. Bhandarkar 20·00

Dictionary of Indian History
Sachchidananda Bhattacharya 50·00

Elements of Science of Language
—I. J. S. Taraporewalla 60·00

East Indian Bronzes—
Edited—Sisir Kumar Mitra 140·00

Romance of Indian Journalism
—Jitendranath Bose 75·00

প্রকাশন বিভাগ :
৪৮, হাজরা রোড
কলিকাতা-১৯

বিজ্ঞপ্তি

গত কয়েক বছর ধরে আমাদের সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্ত্বেও মূল্যায়ন নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এর প্রধানতম কারণ হ'ল নিদারুণ মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রচণ্ড ব্যয়বৃদ্ধির চাপ।

এ অবস্থায় সব দিক বিবেচনা করে মূল্যায়নের পরিচালকবর্গ পত্রিকার প্রকাশকাল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন থেকে মূল্যায়ন ত্রৈমাসিক হিসেবে বছরে ৪টি সংখ্যা বেরুবে, আমাদের বিশ্বাস আছে যে এখন থেকে গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারব এবং মূল্যায়নের প্রকাশ নিয়মিত হবে।

মূল্যায়ন

ষোড়শ-বর্ষ
শারদীয়
১৩৮৭

সূচী

	পৃষ্ঠা
সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম / পরিমলচন্দ্র ঘোষ	১
কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের আর এক অধ্যায় / রণেন সেন	১৫
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা / রণধীর দাশগুপ্ত	২৫
ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ : একটি সমীক্ষা / শঙ্কর রায়	৩৭
জাতীয় আন্দোলনের অপব্যাখ্যা / দীপিকা বসু	৪৬
জাতীয় মুক্তি আন্দোলন : মার্কসীয় দৃষ্টিতে কয়েকটি সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা / শোভনলাল দত্তগুপ্ত	৬১
নেহরুর সমাজতন্ত্র ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ / নরহরি কবিরাজ	৬৭
শ্রমের নান্দনিকতা / দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫
বিদ্যাসাগর ও রামমোহন / নন্দিনী সেন	৮৫
নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ / সুশীল জানা	৯৬
ব্যক্তিপূজা / নির্মাল্য বাগচী	১১০
ধনতান্ত্রিক বিকাশের দ্বৈতরূপ : আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্ভব / শ্রীকালকেতু সেন	১১৬
আলো-আঁধারিতে স্তালিন / অনুবাদ : রতন বসু মজুমদার	১২৯
সি পি আই-সি পি এম : মৈত্রীর সমস্যা / অসীমেশ গোস্বামী	১৩৮
চীন প্রসঙ্গ ও সি পি এম / ভানুদেব দত্ত	১৪৫
চে গুয়েভারা / তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৪
দেবব্রত বিশ্বাস	১৬৫

সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ

সম্পাদকমণ্ডলী :

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা,
নির্মাল্য বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ কাউতলা রোড, কলি:-১৭ হইতে মুদ্রিত ও ১০, বণ্ডেল রোড, কলি:-১৯ হইতে প্রকাশিত।

॥ মূল্যায়ন নিয়মাবলী ॥

গ্রাহক ঃ

পত্রিকা ত্রৈমাসিক।
বছরের যে যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
বার্ষিক চাঁদা ৮·০০ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ২·০০ টাকা
গ্রাহক হ'লে বর্দ্ধিত কলেবর শারদীয় সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য লাগে না।

এজেন্ট ঃ

কমপক্ষে পাঁচ কপি নিতে হবে।
পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে,
ভি. পি. খরচ বহন করবে মূল্যায়ন।
কমিশন—শতকরা ২৫%।

চাঁদা পাঠাবার ও যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

মূল্যায়ন
১০, বণ্ডেল রোড,
কলকাতা-১৯

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম

পরিমলচন্দ্র ঘোষ

"শান্তি, গণতন্ত্র এবং সামাজিক প্রগতির জন্য সর্বপ্রকার সংগ্রামের বিরুদ্ধে সংগঠিত শ্রেণীশক্তিরূপে আন্তর্জাতিক পুঁজির নীতি ও কর্ম এ-যুগের সকল বিপ্লবী শক্তিকে ক্রমবর্ধমানভাবেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করছে : মুক্তি সংগ্রামও জাতীয় গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে।" এ-কথাটা নিঃসন্দেহে সত্য হলেও, এটা অনস্বীকার্য যে সাম্রাজ্যবাদ নিজ আশু এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থরক্ষায় যত সচেতন, তৎপর ও ঐক্যবদ্ধ, শান্তি ও প্রগতির শক্তি ততটা নয় ; কারণ মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অগণিত নরনারীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান রূপ ও তার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথাযথ সচেতনতার অভাব আছে। প্রতিক্রিয়ার প্রচার-যন্ত্র শুধু নয়, প্রগতিমূলক কর্মে যারা অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন, যারা কোন অর্থনীতিক, রাজনীতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধানে সাম্রাজ্যবাদের শত্রুতার সম্মুখীন হয়ে পড়েন, তারাও সকলে সাম্রাজ্যবাদের নগ্নমূর্তি জন-সাধারণের সামনে তুলে ধরেন না। কারণটা অবশ্যই এই যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সচেতন গণ-সংগ্রাম বিশেষ সমস্যার গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজের মৌল সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়।

এ-যুগের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণ আছে। সাম্রাজ্য-বাদ আজ প্রত্যক্ষগোচর নয় ; পূর্বেকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বুর্জোয়া তত্ত্ব এবং রাজনীতিক প্রচারে আজ সাম্রাজ্যবাদের কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের সংজ্ঞায় রাজনীতিক প্রভুত্ব ও ঔপনিবেশিক পরাধীনতাই হল সাম্রাজ্যবাদ। উপনিবেশগুলি যেহেতু রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, অতএব সাম্রাজ্যবাদের অবলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও জনগণের চেতনায় সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব লোপ পায় নি বলেই এবং আক্রমণটা ভিন্ন পথে পরিচালিত করার জন্যও সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-যন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদের একটা আধুনিক সংজ্ঞাও দেবার চেষ্টা হয়েছে। এ-সংজ্ঞা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ হল

শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য দেশ বা রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার বা প্রাধান্য স্থাপন। এ-সংজ্ঞায় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনকে অপর দেশের উপর প্রভাব স্থাপনের হাতিয়ার হিসাবে দেখানো যায়, সমাজতন্ত্রের অর্জিত জয়গুলি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক জগতের, বিশেষ করে সোভিয়েত দেশের হস্তক্ষেপও সাম্রাজ্যবাদেরই প্রকাশরূপে চিত্রিত হতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় ইন্ধন জুগিয়েছে মাওবাদী চীন। সাম্রাজ্যবাদকে মাও সে তুং এক সময় 'কাগুজে বাঘ' বলে বর্ণনা করেছিলেন; এতে তার জাতীয়তাবাদী দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বা শক্তি কিছুমাত্র উদ্‌ঘাটিত হয় নি; সাম্রাজ্যবাদের বিপদ সম্বন্ধে চেতনাকে আরও ভোঁতা করে দেওয়াও হয়েছে। মাওবাদের আর এক আবিষ্কার 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ'। এ-ক্ষেত্রেও ধারণাটির উৎস চীনের জাতীয়তাবাদী পররাষ্ট্রনীতি, তার সম্প্রসারণ-নীতি। অপর দেশের ভূখণ্ডে চীনা উপনিবেশ স্থাপন চীনের এক মূল নীতি; এর চরম প্রকাশ কাম্পুচিয়াতে, যেখানে চীনের পরিকল্পনা ছিল ৫০ লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করে ওদেশে চীনাদের উপনিবেশ স্থাপন করা। একে সঠিকভাবেই সামাজিক উপনিবেশবাদ বলা হয়েছে। চীনের সম্প্রসারণ-নীতির পথে প্রধান অন্তরায় হল সোভিয়েত দেশ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যেভাবে নিজেদের আগ্রাসন ও জঙ্গী-নীতি আড়াল করার জন্য সোভিয়েত দেশকে ঐভাবে চিহ্নিত করে ঠিক অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই চীনের মাওবাদী নেতারা সোভিয়েত দেশকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' নামে অভিহিত করে জগতের প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছে। চীনের ক্ষেত্রে এটা নতুন ব্যাপারও নয়; চীন ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করল এবং ঐ সময় থেকেই চীনের প্রচারে ভারতবর্ষ সম্প্রসারণবাদী এবং নেহরু সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে চিহ্নিত হল। মাওবাদীদের গোপন বেতার স্টেশন "ভয়েস অব কাশ্মীর" থেকে জনগণকে আহ্বান করা হল, ভারতীয় "সাম্রাজ্যবাদী"দের ও-রাজ্য থেকে দূর করে দিতে। চীনের একসময় আশা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশ যুদ্ধের মধ্যে পরস্পরকে ধ্বংস করে চীনের "দিব্য সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দেবে। সে-আশা পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর ফলে তিরোহিত হলেও হয়তো নিঃশেষ হয় নি; কিন্তু সে-অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর না করে অধিকতর নিশ্চিত পথের সন্ধানে চীন সরাসরি বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক

সমাজতন্ত্রবিরোধী যুক্তফ্রন্টে অংশীদার হয়েছে। কিন্তু এখনও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাওবাদীদের ফাঁকা রণধ্বনি চীন সম্বন্ধে একশ্রেণীর বামপন্থীদের উৎসাহ বজায় রাখায় সহায়ক হয়েছে।

বর্তমানের এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বহু মানুষের ধারণায় অস্পষ্টতা এবং তার বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব অস্বাভাবিক নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রচারযন্ত্র এ-বিভ্রান্তির স্থায়িত্ব রক্ষায় যত্নবান এবং বামপন্থীদের অনেকেই উদাসীন। ভারতের কংগ্রেস এবং অন্যান্য বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থী দলগুলি তো বটেই, এদেশের বামপন্থী দলগুলিরও রাজনীতিক বক্তব্য এবং কর্মসূচীতে সাম্রাজ্যবাদ হয় অনুপস্থিত নয়তো ভারতের প্রগতির পথে একটি সাধারণ অন্তরায় মাত্র; অনেকের ক্ষেত্রে আবার সাম্রাজ্যবাদ বিকৃতভাবে উপস্থাপিত। ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে যেটা প্রধান বাধা, ভারতের তথা প্রত্যেকটি উন্নয়নকামী দেশের যেটা প্রধান শত্রু সেই সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে এমনকি বামপন্থীমহলেও মতৈক্যের অভাব এদেশের বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের পথে একটা প্রধান অন্তরায়।

২

মার্কসবাদ বিজ্ঞান বলেই সামাজিক অভিব্যক্তির মৌল প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করতে পারে এবং তারই সূত্র প্রয়োগ করে পরিবর্তিত অবস্থার বিশ্লেষণ করতে পারে। লেনিন ষাট বৎসর পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাকে ভিত্তি করেই এ-যুগের সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশ-বাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাবে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে-সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা থেকে পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়; ১) প্রথম এবং ভিত্তিমূলক হল একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ও বৃদ্ধি, যা থেকে পুঁজিবাদের এই শেষ পর্যায়কে "একচেটিয়া পুঁজিবাদ" বলে অভিহিত করা হয়েছে; ২) শিল্প এবং ব্যাঙ্ক পুঁজির সংযুক্তিতে ফিনান্স পুঁজির উদ্ভব; ৩) পুঁজি রপ্তানি হল সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য; ৪) আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংঘগুলি কর্তৃক আর্থনীতিক প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-বাজার অধিকারের চেষ্টা; ৫) বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক বিশ্বের সকল অনুন্নত অঞ্চল-গুলিকে নিজ নিজ উপনিবেশে পরিণত করা।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক দেখিয়ে লেনিন বলেছিলেন, যে পুঁজিবাদের অসমান বিকাশের ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের এই চিত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন ১৯১৬ সালে লেখা তাঁর পুস্তক "সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের উচ্চতম পর্যায়"তে। যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হল, ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হল।

পরবর্তীকালে দুটো পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর উপনিবেশগুলি রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। দ্বিতীয়তঃ এক সমাজতান্ত্রিক জগতের আবির্ভাবে সমগ্র পুঁজিবাদী জগৎ তাদের সাধারণ শত্রু সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আজকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী জগতের মধ্যে। কিন্তু এ-যুদ্ধও আজ আর অনিবার্য নয়, কারণ সমাজতান্ত্রিক জগৎ এবং শান্তির শক্তিসমূহ সচেতনভাবেই শান্তিরক্ষায় সক্রিয়।

যাইহোক, লেনিনের সংজ্ঞায় রাজনীতিক কর্তৃত্ব বা উপনিবেশবাদকে সাম্রাজ্যবাদের সারবস্তু ধরা হয় নি। লেনিনের পরবর্তীকালে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে, তাতে এ-সিদ্ধান্তই করতে হয় যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু, এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্র ও প্রকৃতি কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি। একচেটিয়া, পুঁজিবাদ, ফিনান্স পুঁজি, পুঁজি রপ্তানি এবং আন্তর্জাতিক চরিত্রের (বর্তমানে বহুজাতিক) শিল্পসংস্থা কর্তৃক অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং ও-সব দেশের বাজার ও কাঁচামাল আয়ত্ত করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। লেনিনের সংজ্ঞায় রাজনীতিক কর্তৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য নয়।

সাম্রাজ্যবাদের মৌল চরিত্র অপরিবর্তিত থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক জগতের শক্তিবৃদ্ধি, প্রাক্তন উপনিবেশগুলি কর্তৃক রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রসার, উন্নয়নশীল দেশগুলি কর্তৃক অর্থনীতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রয়াস এবং বিশ্বের সকল বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের মুখে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আর্থনীতিক শোষণের নতুন কৌশল এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির সমাজতন্ত্রমুখী প্রবণতার মোকাবেলায় নতুন ধরনের রাজনীতিক, কূটনীতিক ও সামরিক কৌশল উদ্ভাবন করতে বাধ্য হচ্ছে। এ-যুগে সাম্রাজ্যবাদকে যেসকল

কৌশল অবলম্বন করতে হচ্ছে, তারই সমষ্টিগত নাম হল নয়া-উপনিবেশবাদ বা উপনিবেশহীন উপনিবেশবাদ।

"পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে, পুঁজিবাদের প্রসার ও সংহতির উদ্দেশ্যে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার জন্য, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এবং সাম্রাজ্যবাদের আর্থনীতিক, রাজনীতিক, মতাদর্শগত এবং সামরিক-কৌশলগত ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ প্রাক্তন এবং বর্তমান উপনিবেশগুলি সম্পর্কে যে-উপনিবেশবাদী নীতি অনুসরণ করে তাই হল নয়া উপনিবেশবাদ।" (V. Vakhrushov, Neo-Colonialism. Methods & Manoeuvres)

ঘানার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নক্রুমা তাঁর নিজ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছিলেন, "নয়া-উপনিবেশবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যায়, যখন প্রাক্তন উপনিবেশবাদী শক্তিগুলি নানা পরোক্ষ উপায়ে যথা ঋণ দান, শিক্ষা, মার্কিন শান্তি সেনা অথবা ইওরোপীয় সাধারণ বাজারের সাহায্যে আফ্রিকাতে তাদের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে।"

এ-যুগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নকামী দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলেই কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। নতুন পদ্ধতিতে শিল্প এবং ফিনান্স পুঁজি রপ্তানী করার নানা উপায় তৈরী হয়েছে। জাতীয় পুঁজির সঙ্গে একযোগে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা স্থাপন, রজনীতিক চাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যক্তি-পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা, বহুজাতিক কর্পোরেশনের অনুপ্রবেশ, পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূলে নানা শর্ত আদায়, ঋণ ও মুনাফা সংক্রান্ত নানা ছুক্তি কিংবা 'সাহায্য' দান ও উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি মুনাফার ক্ষেত্র তৈরী করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষায় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মুদ্রাব্যবস্থার রক্ষা কবচ হিসাবে এবং তৃতীয় জগতের দেশগুলির শোষণের জন্য কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা দুই জগতের বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়। ১৯৬৫ সালের হিসাবে দেখা যায় যে উন্নয়নকামী দেশগুলির রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ঐ দেশগুলির প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের প্রবণতা টিঁকে থাকছে। এর প্রধান কারণ হল উন্নয়নকামী দেশগুলির রপ্তানী পণ্যের (যা প্রধানতঃ প্রাথমিক দ্রব্য বা কাঁচা মাল) নিম্নমুখী দর এবং পুঁজিবাদী জগৎ থেকে

আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। যে-সকল উন্নয়নকামী দেশ পুঁজিবাদের পথ গ্রহণ করেছে, সে-সকল দেশে রাজনীতিক নেতা এবং আমলাদের মধ্যে মিত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত হয় না। আবার এই সকল দেশই অনিবার্যভাবে নিজেদের আর্থনীতিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যত টাকা তৃতীয় জগতের দেশগুলিতে বিনিয়োগ করেছে তার থেকে বহু গুণ বেশী টাকা মুনাফা হিসাবে পেয়েছে। "বিশ্ব-ব্যাঙ্ক-এর কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এ-সংস্থার ডিরেক্টরগণের লক্ষ্য একচেটিয়া পুঁজির জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা।

লেনিন বলেছিলেন সীমাহীন সম্প্রসারণই হল পুঁজিবাদের নিয়ম। ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ বর্তমানে নেই, অথচ এ-যুগে পুঁজি এবং উৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রিভবন ঘটেছে। প্রত্যেকটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির সংযোগে গড়ে উঠেছে পুঁজির স্বার্থরক্ষার এক শক্তিশালী ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী জগৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষায় সকল প্রকার সামরিক, কূটনীতিক, রাজনীতিক ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে, অথচ দুই জগতের এ-দ্বন্দ্ব স্বার্থের সংঘাত থেকে উৎপন্ন নয়। সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়ার প্রচারে সোভিয়েত দেশের আর্থনীতিক সহযোগিতাকে শোষণ, তার সামরিক সাহায্যকে আগ্রাসন এবং সোভিয়েতের সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ দেশগুলিকে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়। আফগানিস্থানে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিকে পারস্য উপসাগরে যাবার অর্থ এবং তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপ বলে বহু পত্র-পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বহুবার একথা জানিয়েছেন যে অপর দেশের কোন অঞ্চল কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈধ অধিকারে তাদের প্রয়োজন নেই; সস্তা মজুরের শ্রমলব্ধ মুনাফা আত্মসাৎ করাও সমাজতন্ত্রে প্রয়োজন হয় না। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থগত সংঘাত নেই বলেই কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি বিসর্জন দিয়েও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে অগ্রসর হয়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘাত নেই, এবং লেনিনের

সময় থেকেই সোভিয়েত দেশ এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে ; তাসত্ত্বেও পুঁজিবাদী জগৎ এবং সমাজতান্ত্রিক জগতের দ্বন্দ্বই যে এ-যুগে প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে, তার কারণ সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান নীতি, নয়া-উপনিবেশবাদ।

(৩)

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের শোষণের ক্ষেত্র রক্ষা করার জন্যই তাদের সমবেত শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করে। যে-কয়েকটি উপনিবেশ এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে। উন্নয়নকামী দেশগুলিকে পুঁজিবাদের পথে আবদ্ধ রাখার জন্য, এ-সকল দেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা করবে এমন সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে ; প্রগতিশীল সরকারগুলির বিরুদ্ধে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সাহায্য করে। যে-সকল দেশ অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর করার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ সৃষ্টি বিদ্রোহ সংগঠিত করে, সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করে। নানা দেশে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করা, সামরিক জোট, যুদ্ধ-প্রস্তুতি এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও সাম্রাজ্যবাদীদের বর্তমান কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

চীন তার সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা সাম্রাজ্যবাদের সমবেত শক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়াতে এ-শিবির যে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গাণিতিক হিসাব যাই হোক ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে শক্তির ভারসাম্য ক্রমশই সমাজতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতির দিকেই ঝুঁকছে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রধান লক্ষ্য তৃতীয় জগতের উন্নয়নকামী দেশগুলিতে শোষণ কায়েম রাখা, বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি স্তব্ধ করা। কিন্তু এ-উদ্দেশ্যে তার নীতি কার্যকর করতে গিয়েই সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

সোভিয়েত দেশ এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে অটল এবং বিপ্লব রপ্তানীর বিরুদ্ধে তাদের দৃপ্ত ঘোষণা অবশ্যই রয়েছে এবং থাকবে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা-

বাদের সমর্থক বৈপ্লবিক মর্ম অস্বীকৃত নয়। সোভিয়েত দেশ এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ বিপ্লব রপ্তানীর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু সমাজতন্ত্রের সাফল্য রক্ষায় এবং প্রতিবিপ্লব রপ্তানীর চেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেও প্রস্তুত। উপনিবেশগুলির মুক্তিতে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার দায়িত্ব ও সমর্থক কর্মের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়নকামী দেশগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সাহায্য ও সহযোগিতা, আর্থনীতিক সমৃদ্ধতা অর্জনে আর্থনীতিক সাহায্য, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত দেশকে অস্ত্র ও সামরিক সাহায্য, যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির শক্তিকে সংগঠিত ও সক্রিয়করণ, সকল ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রের শক্তি জাতীয় মুক্তির সাহায্য করছে। যেহেতু সামাজিক প্রগতি, শান্তি এবং গণতন্ত্রের আন্দোলন পৃথিবীর সকল অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়েছে, বিশ্বব্যাপী চলছে প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির সংগ্রাম, তাই সর্বত্রই পুঁজির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামও বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। যেহেতু পুঁজিবাদের পক্ষে তার প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সোভিয়েত দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে, তাই এ-যুগের প্রধান দ্বন্দ্বকে প্রতিক্রিয়ার প্রচারযন্ত্র দুই বৃহৎ শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে চিত্রিত করছে।

বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক জগতের সহায়তায় উন্নয়নকামী দেশগুলি শুধু যে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার সক্ষম তাই নয়, এ দেশগুলি অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ ধরে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছবার কর্মসূচীও গ্রহণ করতে পারে।

(৪)

উন্নয়নকামী দেশগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়াস, আর্থনীতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের চেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদের সকল প্রভাব নির্মূল করার উদ্যোগ শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক জগতের উপর নির্ভর করে সাফল্যলাভ করতে পারে না। কোন উন্নয়নকামী দেশকে সাহায্য ও সহযোগিতার প্রকৃতি নির্ভর করে ঐ দেশেরই অভ্যন্তরীণ নীতির উপর। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন উন্নয়নকামী দেশের

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে না, বা তার উপর কোন নীতি চাপিয়ে দেবারও চেষ্টা করে না। কোন্ ধরনের অভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করলে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা যায়, এ প্রশ্ন ওঠে। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সামনে রেখে এ-প্রশ্নের আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতের এক দীর্ঘকালের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। এদেশে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ছিল প্রত্যক্ষ শাসক। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল রাজনীতিক স্বাধীনতা বা সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানের জন্য সংগ্রাম। এ-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে। পণ্ডিত নেহরুর মত কোন কোন সর্বভারতীয় নেতা তত্ত্বগতভাবে সাম্রাজ্যবাদের মৌল প্রকৃতি এবং স্বাধীনতার-অর্থনীতিক মর্মবস্তু উদ্‌ঘাটিত করে জন-মানসকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের মতাদর্শে প্রাধান্য ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের। ইংরাজের কড়া শাসনে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ প্রচার সম্ভব ছিল না।

ভারতের স্বাধীনতার জন্ম-লগ্নেই পরবর্তীকালের ইতিহাসের ইঙ্গিত ছিল। রাজনীতিক স্বাধীনতা বা অমত হস্তান্তরে বাধ্য হলেও সাম্রাজ্যবাদ যে ভারতীয় উপ-মহাদেশকে তার প্রভাবাধীন শোষণক্ষেত্র হিসাবে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর সেটা যেমন বোঝা গেল তেমনি এটাও স্পষ্ট হল যে জন-অভ্যুত্থান বা গণ-সংগ্রাম দেশীয় শোষকশ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করতে দ্বিধা করবে না।

ভারতের ক্ষেত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে এবং বৃটেনের সঙ্গে বহুবিধ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখেও ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র হয়ে উঠল না। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চললেন, তাঁর প্রবর্তিত "জোট-নিরপেক্ষতা" তৃতীয় দুনিয়ার সদ্যমুক্ত দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে অনেকাংশ সাহায্য করল। পণ্ডিত নেহরু ক্রমে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে শুধু নয়, প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও স্বয়ম্ভরতা অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় ভারতের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ভাবে বিশেষ করে সোভিয়েট দেশের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করলেন। পরবর্তীকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও মূলত পণ্ডিত নেহরুর পথই অনুসরণ করেছেন। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের

পূর্বাহ্নে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে "শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার" চুক্তি সম্পাদন করলেন এবং তারই শর্তের সুযোগ গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানী সামরিকবাহিনীকে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করে বাঙলাদেশকে মুক্ত করার কাজে সাহায্য করলেন। ইতিপূর্বে গোয়া এবং কাশ্মীর প্রশ্নেও ভারতবর্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেছে। খুব সম্প্রতি ভারত সরকার আফগান প্রশ্নে কোন কোন কমিউনিস্ট পার্টি অপেক্ষাও অধিকতর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং কাম্পুচিয়ার হেং-সামরিণ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং চীনাসম্প্রসারণবাদীদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৩০ বৎসরে, জনতা সরকারের এক সংক্ষিপ্ত কালপর্বকে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে দেখে বলা যায় যে, ভারতবর্ষ তার দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে নি, ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রের যোগ্য নীতি অনুসরণ করেছে।

কিন্তু স্বাধীনতা এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এবং প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে নি। প্রতিটি অর্থ-ব্যবস্থাই নিজস্ব বিষয়গত নিয়মের অধীন। স্বাধীন ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের পথ অনুসরণ করে চলেছে। পুঁজিবাদের এ সাধারণ সংকটের যুগে কোন অনুন্নত দেশ পুঁজিবাদের পথে অর্থনীতিক পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করতে পারে না, আর্থনীতিক স্বাধীনতাও অর্জন করতে পারে না। পুঁজিবাদী জগতের শ্রমিক যেমন স্বাধীন হয়েও কার্যত মালিকের 'মজুরী-দাস'এ পরিণত হয়, তেমনি অনুন্নত স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশও অর্থনীতির বিষয়গত নিয়মেই সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের শিকারে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী পথে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ভারতবর্ষকেও সংগঠিত আন্তর্জাতিক পুঁজির শোষণ মেনে নিতে হচ্ছে। এদেশে আর্থনীতিক সংকট যত বৃদ্ধি পাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরতাও ততই বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পর্যন্ত এ-রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ এবং বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বহুজাতিক শিল্প-সংস্থা এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। ভারত-সরকার তার ঘোষিত শিল্পনীতি সত্ত্বেও বিদেশী ব্যক্তি-পুঁজি এবং বহুজাতিক শিল্প-সংস্থাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থনীতির সাধারণ নিয়মে অসম-বাণিজ্যের দরুণ ভারতবর্ষ উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক শোষিত হচ্ছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে না, রাষ্ট্রযন্ত্রেও অনুপ্রবেশ করে। আমলাতন্ত্রের নানা ছিদ্রপথেও জাতীয় স্বার্থবিরোধী নানা ধরনের চুক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ শোষণের পথ ও প্রভাবের ক্ষেত্র তৈরী করে। ভারতের ক্ষেত্রেও অন্যথা হচ্ছে না।

যাই হোক, এ-যুগে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ও তার বিপদকে শুধুমাত্র এদেশে তার লগ্নীকৃত পুঁজি বা বিশ্ব-ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কারসাজি দিয়ে বা শোষণের মাত্রা দিয়ে, এমন কি উন্নয়নের পথে তাদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পুঁজিবাদী জগৎ এবং তৃতীয় দুনিয়ায় তাদের শোষণকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য সামরিক, কূটনীতিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং মতাদর্শগত যে-সর্বাত্মক পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা করছে তারই পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী বিপদ বিশ্লেষণ করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাশ্মীর, গোয়া, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে সুরু করে বর্তমানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি। দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন কিংবা ভারত মহাসাগরে মার্কিন রণতরীগুলির টহলদারির অর্থ দুর্বোধ্য নয়। এদেশে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ যে আমাদের দেশের স্বার্থের অনুকূল নয়, সেটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। পাকিস্তানের অস্ত্রসজ্জায় সাম্রাজ্যবাদী সহায়তা যে ভারতের সীমিত সম্পদেরও সমরোপকরণের জন্য অপচয় ঘটাচ্ছে, এটা আমরা লক্ষ্য না করে পারি না। এটাও আজ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রোধ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বযুদ্ধের জুয়াখেলার ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত, এবং এ-ব্যাপারে সম্প্রসারণবাদী চীন সাম্রাজ্যবাদের একজন উৎসাহী অংশীদার, সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব-রণকৌশল এবং চীনের সম্প্রসারণ-নীতিতে ভারতবর্ষকে যে একটা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন একই সঙ্গে ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে এবং অন্যান্যভাবে এদেশের উপর প্রত্যক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করছে, আবার কূটনৈতিকভাবে ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে।

সাম্রাজ্যবাদ আজ প্রত্যক্ষগোচর না হলেও স্বাধীনতার বৎসরগুলিতে তার

ভারত-বিরোধিতা অতিক্রম করতে সমাজতান্ত্রিক জগৎ এবং বিশেষ করে সোভিয়েত দেশের সাহায্য লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। তা সত্ত্বেও যে দিনের পর দিন বহু রাজনীতিক দল, সংবাদ পত্র এবং বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে এবং সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছে, তা থেকেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের শ্রেণীগত তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়; এটা বোঝা যায় যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শুধু বহিঃশত্রু নয় অভ্যন্তরীণ শত্রুরও সম্মুখীন হতে হয়। উপনিবেশগুলির রাজনীতিক স্বাধীনতা যেমন সাম্রাজ্যবাদের অবলুপ্তি ঘটায় নি, তেমনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরও অবসান হয় নি। তবে এ-সংগ্রাম চলছে এক ভিন্ন অবস্থার মধ্যে, কারণ একই প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় শক্তিবিন্যাসে পরিবর্তন হয়েছে।

এই পটভূমিতেই ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে বর্তমান শাসকশ্রেণীকে বিচার করা প্রয়োজন। ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ নয়। এ দেশের একচেটিয়া পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বহুজাতিক শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতায় নিজেদের মুনাফার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত ও সংরক্ষিত করতে প্রস্তুত। এ অংশ যে ভারতের জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বিসর্জন দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সমাজতন্ত্রবিরোধী ফ্রন্টের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে প্রস্তুত, জনতা সরকারের স্বল্পকালীন কার্যকলাপেই তা প্রমাণিত হয়েছে। জনতা দল তার নির্বাচনী প্রচারে ঘোষণা করেছিল, যে নির্বাচিত হলে তারা সোভিয়েত-ভারতের ১৯৭১ সালের "শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা"র চুক্তি বাতিল করে দেবে। ভারতের জাগ্রত জনমতকে অগ্রাহ্য করে এ-কাজ তাদের সরকার সম্পন্ন করতে সাহস পায় নি; কিন্তু ইস্‌রায়েলের মোসে দায়ানের সঙ্গে দেশাইর গোপন সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গোপন উদ্যোগ, বাজপেয়ীর চীন গমন ইত্যাদিতে পণ্ডিত নেহরু প্রবর্তিত স্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

জনতা সরকার এবং বিশেষ করে ভারতীয় জনসঙ্ঘের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির তুলনা করলেই ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্থক্য বোঝা যাবে। কিন্তু পুঁজিবাদের বিষয়গত নিয়ম উন্নয়নকামী দেশের স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়

কোন বুর্জোয়া সরকার তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না ; ভারতবর্ষও পারে নি। কাশ্মীর-সমস্যা থেকে সুরু করে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবিরোধী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু ভারত সরকার আজ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু বলে চিহ্নিত করে নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভিটো প্রয়োগ করে, সামরিক সাহায্য দিয়ে আর্থনীতিক স্বয়ম্ভরতায় সহযোগিতা করে এবং সর্বপ্রকারে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের নিদর্শন রেখেও ভারত সরকার কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই শ্রেণীর অতিবৃহৎ রাষ্ট্র বলে অভিহিত হয়েছে। অপর দিকে পুঁজিবাদের নিয়মেই পণ্ডিত নেহরু এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও একচেটিয়া কারবারের সংখ্যা ও শক্তি-বৃদ্ধিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির সহযোগিতার বিষয়গত ভিত্তি সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতে পুঁজিবাদের সংকট যত বৃদ্ধি পাবে বিদেশী পুঁজির উপর ভারতের নির্ভরশীলতাও তত বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে ভারতের আর্থনীতিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনীতিক ক্ষেত্রেও সংকট দেখা দেবে ; শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে ভারতের বুর্জোয়া সরকার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নানাভাবে আপোষ করতে বাধ্য হবে।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাকে বিচার করতে হবে আগামী দিনের সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে। বুর্জোয়াশ্রেণী ভারতবর্ষকে এক সর্বব্যাপী সংকটের মধ্যে নিয়ে এসেছে, পুঁজিবাদী পথে এ-অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। মূল্যস্ফীতি, বেকারী, দুর্নীতি, বঞ্চনা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে, একদিন তারই মধ্য থেকে গড়ে উঠবে এক জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, এবং ভারতবর্ষকে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে নিয়ে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাধান্য স্থাপন করে এক বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে তখনই সুরু হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত রূপ নগ্নরূপে প্রকাশ পাবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাহায্যে বিদ্রোহ সংগঠন এবং সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ থেকে সুরু করে যে-কোন উপায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। চীনের মাওবাদী সরকারও সাম্রাজ্যবাদের পাশেই দাঁড়াবে। এ-অবস্থায়

ভারতের বিপ্লবী শক্তিগুলিও আরও সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে যুক্তভাবে বিপ্লবকে রক্ষা করবে। বিগত দিনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতের এই চিত্র সামনে রেখেই কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হয়। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালপর্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস থেকে এ শিক্ষাই গ্রহণ করতে হয় যে উন্নয়নকামী দেশগুলির প্রকৃত মুক্তির জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদী বিকাশের পথ বর্জন করে দেশকে সমাজতন্ত্রমুখী করা এবং এই উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে বিরামহীন এবং আপোষহীন সংগ্রাম ; এবং এই সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজন উন্নয়নকামী এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুক্ত কর্মতৎপরতা ; সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া, জাতিবিদ্বেষ এবং উপনিবেশবাদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামই এ-যুগের সামাজিক এবং রাজনীতিক চরিত্র নির্ধারণ করে।" (V. Vakrushev, Neo-colonialism : Methods and Manoeuvres)

কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের আর এক অধ্যায়

রণেন সেন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও আমাদের জেল-জীবন

১৯৪১ সালে নাগাদ হিজলী জেলে বন্দী হ'য়ে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির ১২।১৪ সভ্য ছিলাম ও পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন সতোন মজুমদার প্রভৃতি আরও ১০ জন। বাকী প্রায় আড়াইশ বন্দী ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক (বেশীর ভাগ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স), আর. এস, পি ও কিছু যুগান্তর পার্টিভুক্ত। জেলে আমাদের সম্পর্ক খারাপ ছিল না।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী জার্মানী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক খারাপ হতে থাকল। প্রতিদিন সংবাদপত্রে খবর বেরুতে লাগল হিটলার বাহিনী কি বিদ্যুৎবেগে সোভিয়েত দেশে ঢুকে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ আড়াইশ জনের কি উল্লাস! যেন তাঁরাই হিটলার বাহিনীর অংশ এবং তাই হিটলারের জয়ে তাঁরা নিজেদের জয়ী মনে করতে লাগলেন। সাম্রাজ্যবাদী পত্রপত্রিকায় গবেষণা চলল: কতদিনে মস্কোতে হিটলার প্রবেশ করবে, স্তালিনকে শিকলে বেঁধে বার্লিনের চিড়িয়াখানায় রাখবে ও সমস্ত সোভিয়েট দেশ দখল করতে ক সপ্তাহ লাগবে। জেলখানায়ও এ একটা গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আর আমরা মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট ২০।২২ জনের তো আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার উপক্রম। সোভিয়েত দেশ জিতবেই এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মনোবলকে ভাঙ্গতে দেয় নি। সোভিয়েতের পরাজয় যে বিশ্বে ঘোর ফ্যাসীবাদী শক্তিরই জয় এ আশঙ্কা যেমন আমাদের দৃঢ়মূল ছিল, তেমনি আবার সোভিয়েটের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বিশ্বে গণ-অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হবে—একথাও আমরা নিশ্চিত জানতাম।

যাঁরা হিটলারের অগ্রগতিতে আহ্লাদে আটখানা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেক পরীক্ষিত সংগ্রামী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং তাঁদের পার্টিগুলিও নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল। কিন্তু

সাম্রাজ্যবাদ বলতে তাঁরা বুঝতেন ইংরাজ। সুতরাং ইংরাজের শত্রু জার্মানীকে তাঁদের সমর্থন জানাতে হবে। আর সেই জার্মানী যখন সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করেছে এবং যখন সোভিয়েত দেশের পক্ষে রয়েছে ইংরাজ, তখন জার্মানীর হাতে সোভিয়েতের পরাজয় তাঁদেরই জয়—এই মনোভাবই সক্রিয় ছিল তাঁদের মনে। কিছু দাদারা অবশ্য ছিলেন মূলত অতিমানব হিটলারের ভক্ত ও কমিউনিস্টবিরোধী। আর ঐ আড়াইশ জন মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক মতবাদ না থাকায় হিটলারের বিজয়ে তাঁরা উল্লসিত হচ্ছিলেন। জাপান যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ঐ বন্দীদের মনোবল আরও শক্ত হতে থাকল।

আমরা ১৯৪২ এর মাঝামাঝি জেল থেকে ছাড়া পাই। ১৯৪৪ ও ৪৫ সালে জেলে আমাদের অন্য বন্দী কমরেডদের যে বেশ ভুগতে হয়েছিল সেটা পরবর্তী যুগে সত্যেনবাবুদের কাছে শুনলাম। আমরা মুক্তি পেলেও তখনো ভারত সরকার ওঁদের মুক্তি দেয় নি।

দেউলি দলিল

১৯৪২এর গোড়ায় হিজলী থেকে বন্দীরা বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হন। আমাদের আনা হয় মেদিনীপুর জেলে। সেখানে কানাঘুষা শুনতে পাই পার্টি নাকি লাইন বদলাচ্ছে। আগে এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধ, সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে ইতালী, জার্মানী ও জাপানের অক্ষশক্তি, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও সোভিয়েতের মিত্র শক্তি। একদিকে মূল ফ্যাসীবাদী শক্তিসমূহ একের পর এক দেশকে পদানত করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ উপস্থিত থাকলেও মূল চালিকা শক্তি সেখানে সোভিয়েত দেশ যার বিজয়ে ফ্যাসীবাদ তো ধ্বংস হবেই, সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল ও ক্ষীয়মান হয়ে পড়বে, দেশে বিদেশে মুক্তি ও গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হবে। দেউলী দলিলে তাই ছিল যে সোভিয়েতের জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ইওরোপের জনগণের কাছেই শুধু নয় ভারতের জনগণের কাছেও ঐ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উচিত ঐ যুদ্ধকে সমর্থন করা যদিও ভারতে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী।

দেউলী জেলে এই দলিলের খসড়া প্রণয়ন করেন রণদীভে ও ডাঙ্গে।

দলিলটি নিয়ে দেউলী ও বাইরে প্রচণ্ড বাদবিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত জোশী ও অধিকারীর নেতৃত্বে যে মূল পার্টি কেন্দ্র গোপনে কাজ করছিল সেটিও মোটামুটি ঐ লাইনই গ্রহণ করে।

জোশী ঐ লাইনকে আরও সুদৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য করে একখানা বই লেখেন "ফরোয়ার্ড টু ফ্রীডম" অর্থাৎ স্বাধীনতার দিকে আগুয়ান হও"। আমরা জেল থেকে বেরিয়ে ঐ বইটি পড়ি। পার্টি এ-সবের ফলে জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করল। খুব সংক্ষেপে ঘটনা ও রাজনীতি উপস্থিত করায় অবশ্য অনেক ত্রুটি বা ফাঁক থেকে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক লাইনটির এখানে আলোচনা করছি না। জেল-জীবনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে কথাটা সংক্ষেপে লিখলাম।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি লাহিড়ী, ভবানী সেন, সরোজ মুখার্জি প্রভৃতির নামে তখনও গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে। তাই তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে ২৪৯ নং বউবাজার স্ট্রীটে পার্টি অফিস চালু করা হয়। তার ২।১ মাস পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা সরকার তুলে নেয়। পার্টি আইনসঙ্গতভাবে কাজ করতে লাগল। পার্টি আইনী হবার উপলক্ষে একটা বিরাট শোভাযাত্রা আমরা কলকাতায় অনুষ্ঠিত করি। পার্টির প্রধান ফেস্টুনের দুপাশে বিরাট রক্তপতাকা কাঁধে খাঁ সাহেব ও বঙ্কিমবাবু মিছিল পরিচালনা করেন। মিছিলের ফলে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে যায়। মিছিল টাউন হলে শেষ হয় ও সেখানে একটা বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেল থেকেই কাগজে দেখি যে "ফ্রেণ্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন" নামে একটা সংগঠন গঠিত হয়েছে—হীরেনবাবু ও স্নেহাংশু আচার্য্যকে যুগ্ম সম্পাদক করে। একথাও শুনি যে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় সোভিয়েতের উপর আক্রমণের সংবাদ শুনে সোভিয়েতের পক্ষে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। এই সংগঠনের অন্যান্য কর্মী ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, দিলীপ বসু, অমল বোস, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতকে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য প্রগতিশীল লেখক সংঘ খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের এক সভার অনুষ্ঠান করে। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন মজুমদার 'অরণি' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। বহুদিন ঐ পত্রিকাটি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সত্যেনবাবু যে শুধু

একজন প্রগতিশীল সাংবাদিকই ছিলেন তা নয়, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একজন একান্ত বন্ধু, সোভিয়েত দেশের একজন অকৃত্রিম সুহৃদও ছিলেন। প্রগতিশীল সাংবাদিকতায় তিনি পথিকৃৎ ও বিশিষ্ট স্তম্ভও ছিলেন যার তুলনা ছিল না। তাঁর এইসব গুণাবলীর জন্য আনন্দবাজারের তদানীন্তন কর্তারা বিশেষ সন্তুষ্ট তাঁর উপর ছিলেন না। ১৯৫৩ সালে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থীদলের যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয় তাকে দমন করার জন্য কংগ্রেসী সরকার নির্মম অত্যাচার চালায়। সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে কলকাতা ও শহরতলী মুখর হয়ে ওঠে, সভা, শোভাযাত্রা ও হরতাল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হন। সেই সময়ে আনন্দ-বাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় লেখেন পত্রিকার সম্পাদক সত্যেনবাবু। সম্পাদকীয়টির শিরোনামা ছিল "কেলোর কীর্তি"। কালীপদ মুখার্জি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার। এই শতাব্দীর বিশ দশকের শেষদিকে কলকাতার কোনও একটা থিয়েটারে "কেলোর কীর্তি" নামে নাটক দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ও সমাদর লাভ করেছিল। সেই "কেলোর কীর্তি" আবার কলকাতায় পুনরভিনয় হওয়ায় সত্যেনবাবু সম্পাদকীয় লেখেন। গবর্নমেন্ট ও পঃ বঃ মন্ত্রিসভার তথা কালী মুখার্জির উপর রাজনৈতিক আক্রমণই ঐ সম্পাদকীয়র বিষয়বস্তু ছিল—তার ভাষা, রচনার গাম্ভীর্য্য ও তীব্র কশাঘাত বাংলার সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। শুনেছি সত্যেনবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ছাপযুক্ত লোক ছিলেন না। কিন্তু বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ, পরিভাষা ইত্যাদিতে তিনি একজন অথরিটি হিসাবে ত্রিশ দশক হতেই স্বীকৃত হয়েছিলেন যুক্ত বাংলায়।

প্রথম প্রকাশ্য পার্টি সম্মেলন

১৯৪২-এর শেষদিকে বা ১৯৪৩-এর শুরুতে প্রথম প্রকাশ্যে প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন হয়। তার আগে ২।৩ বার গোপন সম্মেলন হয়েছিল প্রাদেশিক স্তরে। এবার সর্বস্তরেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে আমি কলকাতা জেলা কমিটির কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কলকাতার সম্মেলন আমি পরিচালনা করি, সহযোগী ছিল হালিম। পরে প্রাদেশিক স্তরে সম্মেলন হয়। ১৯৪০এ গোপন আড্ডা থেকেই পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী গ্রেফতার হবার পর ভবানী সেন প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক মনোনীত হন। এই সম্মেলনে

যে প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচিত হয় তার সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন ভবানী-বাবু। সেক্রেটারিয়েটে সরোজ মুখার্জি, আমি, খোকা রায়, লাহিড়ী, বিশ্বনাথ, পাঁচুবাবু, নৃপেন চক্রবর্তী ও কমিটিতে মণিকুণ্ডলা সেন, আব্দুল হালিম, মোমিন, মুজাফ্‌ফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জি, জলি কাউল, আবদুল্লা রসুল, কৃষ্ণবিনোদ রায়, মণি সিংহ, নেপাল নাগ প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন, সবার নাম মনে পড়ে না।

বাংলাদেশের প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদক পরপর এইভাবে হয়েছে—১৯৩১এ হালিম, ১৯৩৩এ মণি চ্যাটার্জি, ১৯৩৬এ গোপেন চক্রবর্তী, ১৯৩৮এ নৃপেন চক্রবর্তী, ১৯৪০এ পাঁচু ভাদুড়ী ও ১৯৪৩এ ভবানী সেন। ইতিহাসের জন্য মোটের উপর এর রেকর্ড থাকা চাই। ১৯৪৮এর প্রাদেশিক সম্মেলনের পর আমি পার্টি সম্পাদক নির্বাচিত হই (তখন যুক্ত বাংলার পার্টি) এবং তারপর আরও কয়েকবার প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হই—শেষবার ১৯৬৯-৭১ পর্বে।

"জনযুদ্ধ" সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয় ১৯৪২এ।। প্রথম সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী ও তারপর তুষার চ্যাটার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত ম্যানেজার নিযুক্ত হন।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ

বাংলা ১৮৫০এ (ইংরাজী ১৯৪৩) সমস্ত বাংলাব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। বাংলাদেশই বৃটিশের যুদ্ধের ঘাঁটি হওয়ায় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বিশেষত চাল ও গম সরকার যুদ্ধের জন্য আয়ত্তে আনে, দেশে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। তার সুযোগে ব্যবসাদাররা বাকী খাদ্যদ্রব্য মজুত করে ফেলে। গ্রাম ও শহরে খাদ্যসংকট দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। সুদূর চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়া জেলা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়ে। দূর দুরান্তর থেকে, সহস্র সহস্র গ্রাম থেকে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এক মুঠো খাবারের আশায় বাংলার শহরগুলি বিশেষত কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। সে এক নিদারুণ মন্বন্তর। গ্রামে কৃষক, কারুশিল্পী ও জনমজুর পরিবারে হাহাকার দেখা দেয়। পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—স্বামী স্ত্রী ছেড়ে পিতা মাতা পুত্র কন্যা ছেড়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একটু ফ্যানের জন্য হাজার হাজার মানুষ শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ঘুরে বেড়াত। প্রতিদিন রাস্তায় কত যে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত তার ইয়ত্তা নেই। আমার লেখনীতে সে দৃশ্য তুলে ধরার ক্ষমতা নেই যদিও এখনও সে-দৃশ্য চোখের উপর ভাসছে।

মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লঙ্গরখানা খুলে কয়েক সহস্র লোককে লপ্‌সী (গম, ঘৃত ও ডাল সেদ্ধ) খাওয়াত। কংগ্রেস প্রায় নীরব। তখন অবশ্য আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস নেতারা প্রায় সবাই গ্রেফ্‌তার।

জনরক্ষা সমিতি

কলকাতা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি নিকটাঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় জনমত গড়ে তোলায় পার্টি অগ্রনী হয়। মানুষকে বাঁচাবার জন্য আন্দোলন করতে হবে। তাই সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষকে সংঘবদ্ধ করে রিলিফের কাজ সংগঠিত করতে "জনরক্ষা সমিতি" গঠন করা হয়। কলকাতা টাউন হলে সম্মেলন করে কেন্দ্রীয়ভাবে জনরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। সমিতির তরফ থেকে গ্রামে ও শহরে সরকারের নিকট রিলিফের আবেদন করা হ'ত।

পার্টির কেন্দ্রীয় পত্রিকা "পিপলস্ ওয়ার" ও "জনযুদ্ধ" পত্রিকা অবিরাম অভিযান চালায় যাতে সরকার বাধ্য হয়ে খাদ্যদ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা করে।

পার্টির একটা কালচারাল স্কোয়াড পাঞ্জাব যায়। সেখানে বাংলার অবস্থা ও সাহায্যের আবেদন জনসমক্ষে হাজির করে। প্রচুর অর্থ ও গম সংগৃহীত হয়, যার দ্বারা আমরাও কিছু রিলিফের কাজ করতে পারি। রাজনৈতিক দিক থেকে মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে ও সমস্ত শহরগুলিতে অবিলম্বে রেশনিং ও গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশনিং চালু করার দাবী আমাদের সর্বপ্রধান ছিল। সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী অনাহারে প্রাণ দেয়। অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের হিসাব মত ৩৫ লক্ষ বাঙ্গালী মারা যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়া হবার মাত্র পাঁচ বছর আগে তার নির্মমতা ও বীভৎসতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য খাদ্যদ্রব্য আয়ত্তে ঐভাবে না আনলে ও মজুতদারদের খোলা লাগামে না ছাড়লে এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না। ৩৫ লক্ষ বাঙ্গালীর প্রাণ যেত না, সহস্র সহস্র পরিবার ছিন্নমূল হ'ত না, হাজার হাজার মেয়ে প্রাণধারণের জন্য বারাঙ্গনায় পরিণত হত না। সাম্রাজ্যবাদ তার বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বিশেষ রিলিফ সংগ্রহ বা বিতরণ না করতে পারলেও জনরক্ষা সমিতি একটা গণসংগঠন হিসাবে বেশ কিছুকালের জন্য বাংলার জীবনে কিছুটা স্থান

করে। কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক হলেন স্নেহাংশু আচার্য্য ও প্রধান কর্মকর্তা ভূপেশ গুপ্ত। এই সমিতির শাখা-প্রশাখা বাংলায় প্রত্যেক শহরে (যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, ময়মনসিং, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি) গঠিত হয়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

আমাদের পার্টির মেয়েদের উদ্যোগে আত্মরক্ষা সমিতির জন্ম হয়। সমিতি বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও মেয়েদের মধ্যে বেশ একটা জাগরণ আনতে সক্ষম হয়। নেতৃত্বে ছিলেন মণিকুন্তলা, কমলা চ্যাটার্জী (পরে মুখার্জী), লতিকা সেন, সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুটুদি), রেণু চক্রবর্তী, যুঁইফুল রায়, বেলা লাহিড়ী, অজ্ঞ হালিম, গীতা মুখার্জি প্রভৃতি। কমলাদি ও পুটুদি ১৯৩২এ জেলে যাবার আগে 'যুগান্তর' দলভুক্ত ছিলেন। লতিকা শ্রীসংঘ থেকে ১৯৩৬এ পার্টিতে যোগ দেন এবং তিনিই কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সভ্যা (বাংলায়)। সুধা রায় '৩৬এ যোগ দেন কিন্তু ৩৯এ নীহারেন্দু ও অন্য কয়েকজনের সঙ্গে পার্টি ত্যাগ করেন। আবার ১৯৬৬তে পার্টিতে ফিরে আসেন। বাংলা দেশের প্রায় সব শহরে ও অনেক গ্রামে যেখানেই পার্টির কাজকর্ম ছিল, পার্টির সংগঠন ছিল, সেখানেই এই সমিতি গড়ে ওঠে। '৫০এর মন্বন্তরে এই সমিতি মহিলা সমাজে প্রভূত কাজ করেছে। মুসলমান বস্তির মেয়েদের মধ্যে নাসীর (কুতবুদ্দীন আহমদের কন্যা) কাজ উল্লেখযোগ্য।

সেই সময় পার্টির কাজে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেয়ে এই সমিতির কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করেছি।

জনযুদ্ধের যুগের দলিলের ভিত্তিতে কাজকর্মের অনেক ইতিহাস হয়ত লেখা হবে। আমি স্মৃতি থেকে যা মনে করতে পারছি তাই লিখছি কারণ পার্টির উচ্চপদে (কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারিয়েটে) থাকায় অনেক দেখেছি, শুনেছি ও অনেক কাজে অংশীদার ছিলাম। অনেক কথা মনেও আছে সেই কারণে।

পার্টি কমিউন

১৯৩৩এ প্রভূত সংখ্যায় পার্টির সারাক্ষণের কর্মীর প্রয়োজন হয়। পার্টির

কাজের পরিধি যেভাবে বাড়তে থাকে তাতে শিক্ষিত ও পরীক্ষিত কর্মীর সংখ্যা না বাড়ালে আর চলছিল না। সারাক্ষণের কর্মীদের মাসে ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা হয়। শত শত কমরেড এই জীবন যাপন করে পার্টিতে কাজ করতে নেমে পড়েন। বহু ক্ষেত্রে তাঁদের বাড়ীঘর ও পরিবার ছেড়ে আসতে হয়। এই বিপুলসংখ্যক কর্মীদের বাসস্থানের সমস্যা দেখা দেয়।

পার্টির তরফ থেকে "কমিউন" গঠন করা হয়। বড় বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা হয়। অনেকে সস্ত্রীক—বিশেষত যেখানে স্ত্রীও পার্টি সভ্যা ছিলেন—কমিউনগুলিতে বসবাস করতে থাকেন। প্রায় প্রত্যেক জেলা পার্টি অল্প বিস্তর কমিউন গড়ে তোলে। এই কমিউন গড়া বস্তুত কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে হয়। ভারতের বিভিন্ন শহরে—কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর থেকে জেলায় জেলায় কমিউন গঠিত হয়। কমিউনগুলি প্রায় এক রকমের মেস বাড়ীর মতই ছিল। কমরেডরা মাসিক ভাতা থেকে টাকা দিতেন গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ-খরচা মেটানোর জন্য। বাড়ীগুলির ভাড়া পার্টি থেকে দেওয়া হত। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার পর এই কমিউনগুলিও অবলুপ্ত হয়। পুলিশী অভিযানও এই কমিউনগুলির উপর প্রচণ্ডভাবে হয়। যেসব কমরেড সাবধানতা অবলম্বন করেন নি তাঁরা সবাই কমিউনগুলি থেকে গ্রেফতার হন।

পার্টি ও বুদ্ধিজীবী মহল

'৪২এ জেল থেকে বেরিয়ে জনযুদ্ধের গানের খুব চল ও জনপ্রিয়তা দেখতে পাই। প্রধান গানটির লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তার গান 'বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ, রুখব দস্যু দলকে আজ'—প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। উর্দুতে মখদুম মহীউদ্দিন ও কায়ফী আজমীর গানও বাংলার বাইরে খ্যাতিলাভ করে, এমন কি বাংলাতেও।

এই সময়ে মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ণ বিহারের পার্টিতে যোগ দেন। তার ফলে বুদ্ধিজীবী মহলে পার্টির নামডাক বাড়ে ও ঐ মহল পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বাংলাদেশে নীরেন রায়, হিরণ সান্যাল, বিষ্ণু দে প্রভৃতি খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা পার্টির খুব কাছে আসেন। প্রফেসর সুশোভন সরকার তো তিরিশ

দশকেই পার্টির এক সমর্থক চক্র গঠন করেছিলেন। মার্কসবাদ প্রচারে তার অবদান প্রভূত। হীরেনবাবুর ও গোপাল হালদারের নাম করা বাহুল্য বলেই তা আর করলাম না। প্রগতি লেখক ও সাহিত্য সংঘে পার্টির কাজ থাকায় আরও অনেকে পার্টির দিকে আসেন। সকলের নাম করা সম্ভব নয়। পরিচয় পত্রিকাটিও পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয় ঐ সময় থেকে।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘ গঠিত হয়, যার মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, হিরণ সান্যাল ও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘের লোকেরা তো ছিলেনই।

অগস্ট আন্দোলন ও বাংলাদেশ

এই আন্দোলনের ধাক্কা ভারতের অন্য প্রদেশের মত বাংলায় তীব্রভাবে পড়ে নি। জনমত খুবই বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে থাকলেও কংগ্রেসী নেতৃত্বের অক্ষমতার জন্য বিক্ষোভ খুব ফেটে পড়ে নি। তেমন কোনও হরতাল বা ধ্বংসাত্মক কাজও অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। বেআইনী ইস্তাহার, বিশেষ করে জয়প্রকাশের নামে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ মহলে গোপনে বিতরিত হলেও ছাত্র মহলে বড় রকমের হরতাল তেমন হয় নি। বাংলাদেশে বরং সুভাষবাবুর জাপান যাবার ঘটনা ও টোকিও রেডিওতে তাঁর বক্তৃতা অনেক বেশী জনমানসে প্রভাব সৃষ্টি করে। সুভাষবাবুর কার্য্যাবলীর সমর্থন অন্য প্রদেশে যা হয় তার অনেকগুণ বেশী বাংলায় হয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব থেকেই সাধারণ মানুষ সুভাষবাবুর জাপানের সহযোগিতা চাওয়াকে স্বাগত জানায়। সুভাষবাবুর এই চেষ্টায় যে দেশ স্বাধীন হবে তা দেশবাসী নিশ্চিত মনে করেছিল।

ফ্যাসীবাদবিরোধী আন্দোলন ও সোভিয়েতের সমর্থন আমাদের কাছে একসূত্রে বাঁধা থাকায় সুভাষবাবুর ঐ প্রচেষ্টাকে আমরা নিন্দা করি। কিন্তু যেভাবে সুভাষবাবুকে আমরা চিত্রিত করি তার ফলে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা-কামী জনগণের অনেকের কাছ থেকে আমরা সরে যাই। এর খেসারত পরবর্তী কালেও আমাদের কিছুটা দিতে হয়।

সোমেন চন্দের হত্যা

ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন কমবেশী বাংলার সব জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে ঢাকা শহর ছিল অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র।

১৯৪৩-এর প্রারম্ভে ঢাকার বুদ্ধিজীবী, লেখক প্রভৃতিরা শহরে এক ফ্যাসী-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। স্থানীয় জেলা পার্টির অনুরোধে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী ও জ্যোতি বোস সেখানে বক্তা হিসাবে যান।

সম্মেলন উপলক্ষে শহরে খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক মহল প্রায় তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম যাঁরা সম্মেলনের পক্ষে, দ্বিতীয় যাঁরা বিপক্ষে সরাসরি,-তৃতীয় যাঁরা মোটামুটি তৃষ্ণীভাব অবলম্বন করে নিরপেক্ষতার আবরণ নিয়েছিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত কংগ্রেস মতবাদের অনুসরণকারীরা ও প্রথমোক্তরা ছিলেন জাতীয় বিপ্লবী বিশেষত শ্রীসংঘ ও বিভির লোকেরা।

যাই হোক, সম্মেলনের দিন সকালে উদ্যোক্তাদের অন্যতম, তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ আততায়ীর হাতে নিহত হন। তিনিই বাংলার ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পরও যথারীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমাদের প্রতি লোক আরও আকৃষ্ট হয়।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা

রণধীর দাশগুপ্ত

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে বারবার বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনও মতান্ধতা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, আবার কখনও কমিউনিস্ট আন্দোলন আপন স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর নিছক অনুসরণকারী হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে ভ্রান্ত মূল্যায়ন কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিচ্ছেদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে বাম ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির এখনও অবসান হয় নি। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রশ্ন পার্টির রণনীতি ও রণ-কৌশলের একটা মৌলিক প্রশ্ন। মূলত এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে একটি পার্টির মধ্যে দুই রণনীতি ও দুই রণকৌশলের আবির্ভাব হতে পারে। বস্তুত, আজও পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের প্রশ্নে সবচেয়ে বিতর্কমূলক স্থান অধিকার করে আছে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকার প্রশ্নটিই।

পার্টির অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে যে প্রশ্ন ও তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন তাতে সমস্যাটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তিনি লিখেছেন—"ইন্দিরা গান্ধী হলেন দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, যারা চরিত্রগতভাবে একচেটিয়া-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং যারা ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পাদনে আগ্রহী।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ: (১) জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্ন, (২) জাতীয় গণতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতিগত পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্ন, (৩) বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বের প্রশ্ন. (৪) বুর্জোশ্রেণীর মধ্যে বিভাজন বা বিভক্তিকরণ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন, (৫) অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে প্রশ্ন এবং (৬) ভারত

সরকারের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন। এইসব প্রশ্ন বিশ্লেষণ না করলে ঐ কমরেডের ছোট উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। এককথায় বলতে গেলে বহু প্রশ্নসম্বলিত উদ্ধৃতিটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী, লেনিনের তত্ত্বের সংশোধন, ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তের পরিপন্থী এবং পার্টির কর্মসূচী হতে বিচ্যুতি।

বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা

ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড লিখেছেন—শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বুর্জোয়ার যে অংশের প্রতিনিধি তাঁরা হলেন চরিত্রগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী। একই তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন রোজা দেশপাণ্ডে ১৯৮০ সালের ২৭শে এপ্রিল মাসের 'New Wave' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। পাঠকবর্গ "চরিত্রগতভাবে" কথাটা লক্ষ্য করবেন। উভয়ের মতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এমন একটি অংশ রয়েছে যারা "চরিত্রগতভাবে" একক চরিত্রসম্পন্ন। এখানে উভয়েই লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিসকে সংশোধন করেছেন না কি? তাঁরা বলছেন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এককচরিত্রসম্পন্ন, আর লেনিন বলেছেন যে জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণী দোদুল্যমান এবং দ্বৈত চরিত্রসম্পন্ন।

লেনিন তাঁর ঔপনিবেশিক থিসিসে নিপীড়নকারী বা সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্থক্য করেছেন। নিপীড়নকারী দেশের বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল। নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়ারা বিদেশী বুর্জোয়াদের দ্বারা নিপীড়িত, তাই তারা বিদেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আগ্রহী। এদের চরিত্রের একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিক আছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা আছে বলেই এরা পরাধীন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে একটি শক্তি হিসাবে অবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এটা তাদের চরিত্রগত একমাত্র দিক নয়। এদের চরিত্রের আরও একটা দিক আছে যা ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড কোন স্থানে আদৌ উল্লেখ করেন নি। সেই দিকটা হল এই জাতীয় বুর্জোয়ারা শোষক-শ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের এরা শোষণ করে। শোষকশ্রেণী বলেই যখন দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হতে থাকে তখন তারা সাম্রাজ্যবাদ

এবং তার মিত্রদের সঙ্গে আপস করে। এই কারণেই লেনিন বলেছেন : পরাধীন দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন। এই জাতীয় বুর্জোয়ারা অস্থিরচিত্ত, দোদুল্যমান, শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণীসংগ্রামে আতংকিত বলেই এরা দ্বৈতচরিত্র-সম্পন্ন। তাই তারা বিপ্লবের মধ্যপথে গিয়ে থেমে যায় এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে ভয় করে। এরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ কোনদিনই সম্পন্ন করতে পারে না। এই হল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড জাতীয় বুর্জোয়ার একটা চরিত্রই দেখেছেন—দুটো চরিত্র দেখেন নি। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কেবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার চরিত্র দেখলে একরকম কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হয়। চিকমাগালুর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর বিজয়কে এবং ইন্দিরা কংগ্রেসে বহুগুণার যোগদানকে অভিনন্দন জানাতে হয় এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য বিকল্প কর্মকৌশলের জন্য পার্টির মধ্যে ওকালতি করতে হয়।

জাতীয় বুর্জোয়ার এই দ্বৈতচরিত্র সম্পর্কে ৮১টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে—"বর্তমান অবস্থায়, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন জাতীয় বুর্জোয়ারা, বস্তুগত-ভাবে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের মুখ্য কর্তব্য সাধনে আগ্রহান্বিত, আর সেইজন্যই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা তার বজায় রয়েছে। সেই অর্থে এরা প্রগতিশীল। কিন্তু এরা অস্থিরচিত্ত, প্রগতিশীল হলেও এদের ঝোঁক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করা।...সামাজিক বিরোধ যতই বৃদ্ধি লাভ করে, জাতীয় বুর্জোয়ারা ততই বেশী করে ঝোঁকে আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার দিকে।"

আমাদের পার্টির কর্মসূচীতেও বলা হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়ারা (একচেটিয়া অংশবাদে) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী প্রধান কাজগুলি সমাধা করতে আগ্রহান্বিত ; তবে জাতীয় বুর্জোয়ার এই অংশ শোষকশ্রেণীর অন্তর্গত এবং এই কারণে তারা দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন। (৮ম অধ্যায়)

এই দ্বৈতচরিত্র গণতান্ত্রিক কাজ সম্পাদনে জাতীয় বুর্জোয়াকে সব সময়েই করে তোলে অস্থিরচিত্ত। জাতীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তারা ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে, ধনতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে, বিশ্ব ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অর্থাৎ ধনতন্ত্রের

সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিরোধও বাড়ছে, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক-সমাজ এবং মেহনতী মানুষের সঙ্গে বিরোধ বাড়ছে। বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার উপর নির্ভরশীলতাও বাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্র নীতি থাকা সত্বেও তার মধ্যে দোদুল্যমানতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাকে দুর্বল করার পরিবর্তে তাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান সত্বেও কোথাও একচেটিয়াদের শক্তি হ্রাস পায় নি বরং তাদের সম্পদ ও মুনাফা স্ফীত হচ্ছে, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে তাদের সহযোগিতা বাড়ছে। এবং একচেটিয়া পুঁজিপতির সংখ্যাও স্ফীত হচ্ছে। ভূমিসংস্কার অর্ধসমাপ্ত বললে বেশী বলা হবে। কৃষিতে কৃষকের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করার পরিণতি। নিজের দেশে ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ এবং বিশ্ব ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্তিকরণই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের উর্বর ক্ষেত্র। বরং ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা নিম্নগামী। তার মধ্যে দোদুল্যমানতা ক্রমেই বাড়ছে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেডের উদ্ধৃতি থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যদি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তাহলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তফাৎ কোথায়? উভয়েই ধনতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করছে এবং ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিকাশলাভ করছে এবং উভয় বিপ্লবের নেতা হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। অতএব ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেডের মতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যা লক্ষ্য ও কাজ, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সেই লক্ষ্য এবং সেই কাজ। এই তত্ত্ব আবিষ্কারকারী প্রবীন নেতা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জাতীয় গনতান্ত্রিক বিপ্লব বলেই মনে করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ধনতান্ত্রিক পথ ও অ-ধনতান্ত্রিক পথের কোন পার্থক্য থাকে না। এ ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বা ভারতের পার্টির কর্মসূচীর কোন মিল নেই।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব—দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বিপ্লব। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হল সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরন, সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার প্রবর্তন। এই বিপ্লবের নেতা হল বুর্জোয়াশ্রেণী। এই বিপ্লবে অন্যান্য শোষিত শ্রেণী বুর্জোয়া-শ্রেণীকে সমর্থন করে থাকে। যেমন ফরাসী বিপ্লব। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়েছিল তাও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল সম্পূর্ণ এক নতুন অবস্থায়। এই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল সাম্রাজ্যা-বাদের যুগে যখন শ্রমিকশ্রেণী জঙ্গী বিপ্লবী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বুর্জোয়ারা তাদের অতীতের বিপ্লবী চরিত্র হারিয়েছে। কারণ বিষয়গত দিক থেকে রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের বিপ্লব ছিল কৃষক-বিপ্লব কিন্তু বিপ্লবের পদ্ধতি শ্রমিকশ্রেণীর পন্থা অনুসরণ করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাধারণ ধর্মঘট এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়েছিল বলে রাশিয়ার বুর্জোয়ারা এই বিপ্লবে ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়েছিল। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী যুগেরপূর্বাবস্থাতেও জার্মানীতে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তারা দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়ে কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং রাজতন্ত্রের সঙ্গে আপস করেছিল। আমাদের দেশেও বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে প্রথমদিকে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করেছিল বলে দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানে যে বুর্জোয়ারা ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এটা তাদের শ্রেণীগত চরিত্র। বিপ্লবে অস্থিরচিত্ততা তাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা বিপ্লবী গণতন্ত্র এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রমুখীন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই এর সুদূর-প্রসারী লক্ষ্য। সমস্ত প্রকার শোষণ—সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজি-বাদী শোষনের অবসান এই বিপ্লবের চরম লক্ষ্য। এটা আজ আর তত্ত্বকথা নয়। কমরেড ব্রেজনেভ লিখেছেন—"প্রধান কথা : অনেকগুলি দেশে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বাস্তব ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয়বিধ শোষণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে।" (সোভিয়েত পার্টির চতুর্বিংশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট)।

যেখানে সমস্ত প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব পরিচালিত সেখানে

বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে কী করে এই বিপ্লব পরিচালিত হতে পারে ? "ধনতান্ত্রিক কাঠামোর" মধ্যে কী করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব ? এই নেতৃস্থানীয় কমরেড এমন অবাস্তব বিপ্লবী তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অজানা। তিনি কেবল লেনিনের উপনিবেশিক থিসিসকে সংশোধন করেন নি, ৮১ পার্টির দলিলকে বিকৃত করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এক করে দেখেছেন। এই কারণেই তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পক্ষে ওকালতি করে পার্টিতে একটা বিকল্প রণনীতি ও রণকৌশল উপস্থিত করেছেন।

অথচ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী। এই মৈত্রী হল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের স্তম্ভ। তাই বলে একথা বলা হচ্ছে না যে এই ফ্রন্টে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংশ থাকবে না। কিন্তু এই মিত্ররা হবে দোদুল্যমান এবং দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন মিত্র। এই স্তরে মৌলিক সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবে "শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপক কৃষক জনগণ।" জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে সেটা হবে শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। আর এই বিপ্লব পরিচালিত হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে। স্বভাবতই এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে পরিচালিত হলে এর উত্তাপ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিধির বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে। কারণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর যত কাছাকাছি আসবে ততই সামাজিক বিরোধ বাড়বে। এর ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর আঘাত পড়তে বাধ্য।

এই প্রশ্নটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটাকে আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার নতুবা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হবে। ৮১ পার্টির দলিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশগুলির প্রগতিশীল শক্তিসমূহ যে সব জাতীয় গণতান্ত্রিক কর্তব্যের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারে এবং হয় সেগুলি হোলো: রাজনৈতিক স্বাধীনতার দৃঢ়ীকরণ, কৃষকের স্বার্থে কৃষি-সংস্কার রূপায়ণ, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের অবলোপসাধন, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রভুত্বের উচ্ছেদ, জাতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী একচেটিয়ার অধিকার খর্ব এবং বিতাড়ন,

জাতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, জীবন-মান উন্নয়ন, সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণ, স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির অনুসরণ, সমাজতান্ত্রিক এবং অন্যান্য বন্ধুমনোভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিকাশ।

এই কর্মসূচী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী হতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এই কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারে না। এই কর্মসূচী "ধনতান্ত্রিক কাঠামোর" মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে না। এই কর্মসূচী হল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই কর্মসূচী। যারা এই দুই বিপরীতধর্মী বিপ্লবকে এক ও অভিন্ন করে দেখছেন তারা বিপ্লবের বর্তমান স্তরে বুর্জোয়াদের সম্পর্কে মোহমুক্ত হতে পারেন নি।

অ-ধনতান্ত্রিক পথ

ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যেমন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তেমনই সেই একই কাঠামোর মধ্যে অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অথচ ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড বলছেন "…ইন্দিরা গান্ধী…ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পাদনে আগ্রহী।" বলাবাহুল্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ হল ধনতন্ত্র। আর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ হল অ-ধনতান্ত্রিক পথ। প্রথমটার কাজ হল ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ। আর দ্বিতীয়টার কাজ হল ধনতন্ত্রের প্রক্রিয়াকে বিনাশ করে ক্রমে ক্রমে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড দুই বিপ্লবকে এক করে দেখে অত্যন্ত কৌশলে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে ওকালতি করছেন। অথচ আমাদের পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে—অ-ধনতান্ত্রিক পথ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ এবং এই পথের লক্ষ্য হবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে উল্টে দেওয়া। (অষ্টম অধ্যায়)

অ-ধনতান্ত্রিক পথ কোন তৃতীয় পন্থা নয়। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য এটা একটা মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তর সমাজতন্ত্রও নয়, ধনতন্ত্রও নয় কিন্তু সমাজতন্ত্রের দিকে একটা প্রচণ্ড পদক্ষেপ। এই স্তরেই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। এই পথ ধনতান্ত্রিক পথকে নাকচ করে দেয়। এটা হল

অন্তর্বর্তীকালীন একটা সামাজিক গঠন-প্রক্রিয়া। ইন্দিরা গান্ধী নাকি এ-কাজ করতে আগ্রহী কারণ তিনি প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এমন বিচিত্র তত্ত্বের আবির্ভাব হতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে এত গভীর মোহ থাকলে অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে কোন আস্থা থাকতে পারে না। অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে লেনিন বলেছেন—"...তখনও সেটা সমাজতন্ত্র হবে না, কিন্তু ধনতন্ত্রও থাকবে না। সমাজতন্ত্রের দিকে সেটা হবে এক বিরাট পদক্ষেপ।" (লেনিন, সঃ বঃ ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬০) ব্রেঝনেভও ২৪তম পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে বলেছেন: অ-ধনতান্ত্রিক পথ হচ্ছে "দীর্ঘমেয়াদে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ"। এই পথ বিপ্লবী গণতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে সব দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় নি সেখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথের প্রয়োগ ভিন্ন রকমের। ভারতে কেবল ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে নি, এখানে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী বেশ শক্তিশালী। আর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শুধু সম্পদ এবং মুনাফা বাড়েনি, সংখ্যাও স্ফীত হয়েছে। কাজেই ভারতের ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রতিহত না করে অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

পরিশেষে লেনিনের আর একটা উদ্ধৃতি দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করছি। লেনিনের এই উপদেশ কমিউনিস্ট মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"যদি আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে ভয় পাই তা হলে বিংশ শতাব্দীতে এবং ধনতান্ত্রিক দেশে আমরা বিপ্লবী গণতন্ত্রী হতে পারব না" (Lenin: Impending catastrophe and how to combat it). অতএব ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বুর্জোদের দ্বারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার মোহ যত তাড়াতাড়ি বর্জন করা যায় ততই কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে মঙ্গল। মনে রাখা দরকার ইন্দিরা গান্ধী ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। একচেটিয়া পুঁজিকে বিলোপ করতে পারবেন না এবং ভারতের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ঘাঁটির উচ্ছেদ করতে পারবেন না, কারণ ভারতের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিশ্ব ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত। এটা হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করার উর্বর ক্ষেত্র। ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে অ-ধনতান্ত্রিক পথের কথা বলা স্বপ্নবিলাস মাত্র।

শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়ার যৌথ নেতৃত্বে

ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়া যদি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন (!) করতে পারে তাহলে শ্রমিকশ্রেণী কী করবে, তার ভূমিকা কী হবে? ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেডের তত্ত্ব থেকে স্বাভাবিক-ভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে শ্রমিকশ্রেণীও আগ্রহী এবং এই ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব আছে। অতএব শ্রমিকশ্রেণীকে হয় বুর্জোয়াদের সমর্থন করতে হবে অথবা বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌথ নেতৃত্বে আবদ্ধ হতে হবে। এই যৌথ নেতৃত্বের প্রশ্নটি নাকি সৃজনশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। অথচ এমন একটা সৃজনশীল তত্ত্ব আন্তর্জাতিক কোন কমিউনিস্ট দলিলে পাওয়া যায় না। আসলে এই তত্ত্ব হচ্ছে মাও সে-তুঙের তত্ত্ব। মাও সে-তুঙ লিখেছেন—চীনে যা গড়ে উঠবে তা হবে "শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়ার যৌথ একনায়কত্ব"। (Wang Ming—Lenin, Leninism and the Chinese revolution p. 14) ওয়াং মিং এই তত্ত্বকে খণ্ডন করেছেন।

এই তত্ত্ব শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের বিরোধী। এটা হচ্ছে শ্রেণী-সমন্বয়ের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূলে রয়েছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকার ভ্রান্ত বিশ্লেষণ। বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে: একদিকে প্রগতিশীল অংশ যারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবে। এরাই হল "খাঁটি" দেশপ্রেমিক, "খাটি" সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী। আর অপর অংশ সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মেলাবে। এই ভ্রান্ত ধারণা যৌথ নেতৃত্বের জন্মদাতা। মনে রাখা দরকার যে বুর্জোয়াশ্রেণী যদি বিভক্তও হয়ে থাকে, তাহলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বুর্জোয়াদের কোন প্রকার নেতৃত্বের ভূমিকা থাকবে না, এমন কি তারা বিপ্লবের মুখ্যশক্তিও হবে না। জাতীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দোদুল্যমান ও অস্থির-চিত্ত মিত্র হিসাবেই থাকবে। যৌথ নেতৃত্বের ধ্যানধারণা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চেতনাকে রুদ্ধ করে দেয়। এই ধারণা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা ও সংগ্রামের পরিপন্থী। যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্ব মানে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত করার তত্ত্ব এবং

স্বাধীন সত্তা বিলোপ করার তত্ত্ব। এটা হল শ্রমিকশ্রেণীকে একটা বুর্জোয়া রিপাব্লিকের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার কৌশল। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে যৌথ নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী কোনদিন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে পারবে না এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। অতএব বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংকুচিত না করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তন না করে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না। রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তন করতে হলে মূলত শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রীকে তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্ব সেই শ্রেণীসংগ্রামকে বাধা দেবে। অতএব যৌথ নেতৃত্ব হল বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে মোহগ্রস্ত হবার একটা অভিব্যক্তি। এটা নিছক শোধনবাদী চিন্তা ও তত্ত্ব।

ভারত সরকারের শ্রেণীচরিত্র

ভারতে যে-কোন ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক তার শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ না করে বিপ্লবের রণকৌশল নির্ণয় করা যায় না। বিপ্লবের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এটা একটা সার্বজনীন প্রশ্ন। কোন শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে এবং কোন কোন শ্রেণীকে তারা প্রতিনিধিত্ব করছে এই মৌলিক প্রশ্নে ভুল করলে কর্মকৌশলেও ভুল হবে। ফলে পার্টি জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, এমন কি নিজের শ্রেণী থেকেও বিচ্ছিন্ন হবে। এই ভুল সমগ্র দেশের পক্ষেও মারাত্মক হবে। এই কারণে আমাদের পক্ষে ভারত সরকারের শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে এই বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে —"ভারত রাষ্ট্রটি সমগ্রভাবে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের হাতিয়ার, এতে বৃহৎ বুর্জোয়াদের শক্তিশালী প্রভাব বিদ্যমান। এই শ্রেণী-শাসনের সঙ্গে জমিদারদের প্রবল যোগাযোগ আছে। এই বিষয়গুলি রাষ্ট্রশক্তির উপর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করে থাকে।" অর্থাৎ এই রাষ্ট্র ছোট, মাঝারী এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী বা সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।

কিন্তু ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড রাষ্ট্র সম্পর্কে পার্টি কর্মসূচীতে যে মূল্যায়ন করা

হয়েছে তার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার হল সেই সব জাতীয় বুর্জোয়াদের সরকার যারা চরিত্রগতভাবে খাঁটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী। অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার হচ্ছে প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সরকার, আর বুর্জোয়ার অপর অংশ অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদের কোন প্রভাব এই সরকারের উপর নেই। কিন্তু তাই যদি হবে তবে প্রতি বছরই একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সম্পদ ও মুনাফা বাড়ছে কেন? কেনই বা সরকার দেখছেন না যে একচেটিয়া পুঁজিপতির সংখ্যা স্ফীত হচ্ছে? কেনই বা সরকার বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সহযোগিতার অনুমতি দিচ্ছেন? সরকার যদি খাঁটি একচেটিয়া বিরোধী হন তবে কেন একচেটিয়াদের সম্পদ রাষ্ট্রীয় করণ করে রাষ্ট্রীয় সেক্টরকে সম্প্রসারণ করছেন না? এমন কোন বাজেট কী এই পর্যন্ত পেশ করা হয়েছে যেখানে কোন না কোনভাবে একচেটিয়া পুঁজিপতি-দের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নি? একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বাজারের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করেছে তার ফলে পণ্য সামগ্রীর দর দিন দিন বেড়ে চলেছে। ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড এইসব প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন?

ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেড বলছেন রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে ভারত সরকার খাঁটি এবং নির্ভেজাল প্রগতিশীল শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন, তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিতে পরিণত হয়েছেন। এখন দরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী পার্টির পক্ষে ভারত সরকারকে সমর্থন করে একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা। ঐ নেতৃস্থানীয় কমরেডের মতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থীরা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করছেন না বলেই সারা দেশব্যাপী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে উঠছে না। এই কারণে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে সর্বতোভাবে সমর্থন করছেন এবং পার্টির মধ্যে একটা বিকল্প কর্মকৌশল উপস্থিত করেছেন। জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তাঁকে আজ কার্যক্ষেত্রে ভাতিণ্ডা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খাড়া করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, যে ভারত সরকার ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করছেন সেই সরকারকে উচ্ছেদ করাই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য। আসলে তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জাতীয়

গণতন্ত্রে নয়। তাঁর থিসিসকে গলাধঃকরণ করাবার জন্য তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এক ও অভিন্ন আকারে উপস্থিত করেছেন এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।

এ কথা আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার হওয়া দরকার যে ভারত সরকার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের হাতিয়ার নয় বরং তার পরিপন্থী।

ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ ঃ একটি সমীক্ষা

শঙ্কর রায়

উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষত পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসারী দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভূমিকা নিয়ে মার্কসবাদী শিবিরে অনেক বিতর্ক রয়েছে। অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কমূলক বিষয়গুলির মতোই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভূমিকা নিয়ে দুই ধরনের আত্যন্তিকতা রয়ে গেছে: এক, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটের উপাদান হিসেবে দেখা ও দুই, এর ভূমিকাকে তাচ্ছিল্যভরে দেখা। এই দুই ধরনের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করতে হবে।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ প্রধানত তিনভাবে সম্ভব। এক, স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, যা হয়েছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে—একালে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগে ও যে কালে গতিমুখ পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব নয়। দুই, বিদেশী পুঁজির সহায়তায় পুঁজিতন্ত্র নির্মাণ, যা হয়েছে লাতিন আমেরিকার ব্রেজিল, আরজেনটিনা, চিলি প্রভৃতি দেশে ও এশিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনস, ইরাণ প্রভৃতি দেশে। বলা বাহুল্য, বিদেশী পুঁজির মুখাপেক্ষিতার অর্থ নয়া উপনিবেশবাদের অধীনতাপাশে বদ্ধ থাকা। তিন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সহযোগিতায় পুঁজিতন্ত্র গড়ে তোলা, যেমন হয়েছে ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে। একথা অনস্বীকার্য যে, তৃতীয় দুনিয়ায় সম্ভাব্য দুই ধরণের পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সহযোগিতায় পুঁজিতন্ত্র তুলনামূলকভাবে শ্রেয়—যদিও যে কোন ধরনের পুঁজিতন্ত্রই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজিতন্ত্র বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত এবং সেহেতু নয়া উপনিবেশবাদের প্রভাব বিস্তারে সহায়ক। তৃতীয় দুনিয়ায় এমন কোনো দেশ নেই যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ পথ অনুসৃত হচ্ছে, অথচ নয়া-উপনিবেশবাদী প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন সোভিয়েত অর্থশাস্ত্র গবেষকের অভিমত বিশেষ প্রণিধান যোগ্য: "তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজিতন্ত্র বিকাশলাভ করতে পারে কেবলমাত্র বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার পরাধীন ও অধস্তন অঙ্গ হিসেবে, যা বহুদিক থেকে এখনই আছে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক

ব্যবস্থার কাঠামো, গতিমুখ, এবং তার বিবর্তনগত প্রকার ও সম্ভাবনা অধিকতর নির্ধারিত হচ্ছে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পর্ক দ্বারা জাতীয় পরিস্থিতি দ্বারা নয়," (Rachik Avakov, Kiva Maidanik & Tatyana Pokatayeva : **Possibilities and Limits of Capitalism in the Third World,** Social Sciences, No 4, 1974, পৃঃ ১৬১)। এরা আরও বলেছেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসারী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেসরকারী সংস্থাগুলির নির্ভরতা সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী নীতিসমূহের নানা দিকের উপর, যেগুলি পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ককে মদত দেয়। তাছাড়া, সেইসব দেশে সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আবার একই সঙ্গে জাতীয় সংস্থা (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র) গড়ে তোলার অনুকূল। কিন্তু পাশাপাশি বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংস্থাও গড়ে ওঠে (দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃঃ ১৫৭-৫৯)।

ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ নিঃসন্দেহে গবেষণাযোগ্য বিষয়বস্তু। পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসারী উন্নয়নশীল দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের বিকাশগত পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট, তেমনই ভারতের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশও সম্ভবত তৃতীয় দুনিয়ার অন্য কোনো পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশপ্রয়াসী দেশে ঘটেনি। এর পিছনে রয়েছে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশগত বৈশিষ্ট্য, যা লেনিন-বিশ্লেষিত পরাধীন বুর্জোয়াদের চরিত্রায়নের আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা কেবলমাত্র দোলাচলপ্রবণ ছিল না, রাজনৈতিক উপর-কাঠামোতে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলনও ছিল। এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিদেশী পোষাক বর্জন করো স্লোগান থেকে পঞ্চাশ দশকে জোটনিরপেক্ষতা নীতি প্রস্তাবনার সুদীর্ঘ কালপর্ব স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ আকাঙ্খারই পরিচায়ক। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার (অবশ্যই দ্বৈত চরিত্রসম্পন্ন) এ প্রেক্ষাপট মনে রাখতে হবে। ভারতে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র নির্মাণের নীতির পটভূমিও তাই : পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসরণের শ্রেণী-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের নাগপাশমুক্ত হবার সর্বাত্মক প্রয়াস। কিন্তু স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ তৃতীয় দুনিয়ার কোন দেশেই বাস্তবানুগ সংকল্প নয়।

বিগত তিন দশকে ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ কৌতূহলোদ্দীপক। বিশেষত ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ এর মধ্যে এই বিকাশ লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থার সংখ্যা ছিল ৩৬, ১৯৬১তে ১৪২, ১৯৭০এ ২৮২ এবং ১৯৭৭এ ৪৫০ ; এই চিহ্নিত বছরগুলিতে শেয়ার পুঁজি ছিল যথাক্রমে ২৬ কোটি

টাকা, ৫৪৭ কোটি টাকা, ও ১৭১০৭ কোটি টাকা ৪৬৪৫ কোটি টাকা। ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিস্তৃতি কিরকম হচ্ছে এ থেকে তা অনুধাবনযোগ্য। এ বিকাশের একটি দিক ভেবে দেখার মতো। এর ফলে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্ত (material prerequisites) গড়ে উঠছে, যা উন্নয়নশীল দেশে অন্য ভাবে সম্ভব নয়। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে এ শর্তগুলি নিশ্চয়ই আরো ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে—যে জন্য পুঁজিতন্ত্র তার নিজেরই কবরখনক (grave-digger) কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা এখানেই যে, এই উন্নত শিল্পভিত্তি গড়ে উঠছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। অনবধান পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে ভারতে সমাজতন্ত্র ত্বরান্বিত হচ্ছে না কেন।' এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে লেনিনের কথায় ফিরে যেতে হবে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) ৭ম কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন : একটা দেশ যত পশ্চাৎপদ হবে, ইতিহাসের শঙ্খিল গতিপথের দরুণ সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করা সহজতর, কিন্তু পুরানো পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কে উত্তরণ ততই কঠিনতর' (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৯০)। হাতের কাছেই রয়েছে আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দৃষ্টান্ত। ঠিক তেমনি জর্মন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বা চেকোস্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সহজতর। ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। উল্লেখ-বাহুল্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী প্রধানত উৎপাদনী উপকরণ অর্থাৎ মার্কস-কথিত প্রথম বিভাগের (department I) পণ্য প্রস্তুতকারক। অর্থাৎ ইস্পাত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ভারী ও মূলধনী পণ্য উৎপাদনকারী। এই ধরনের প্রকল্প নির্মাণে যে বিপুল পরিমাণ লগ্নী দরকার ভারতের মতো দেশে একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও এ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। ভারতের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা এ কারণেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থা গড়ে তুলেছে। সুতরাং একথাও ঠিক যে, বুর্জোয়া শ্রেণী তার শ্রেণীস্বার্থরক্ষার্থেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও মার্কসবাদী অর্থবিজ্ঞানী ডক্টর নীহার সরকারের অভিমত বাস্তবানুগ। তিনি দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি বেসরকারী শিল্পপতিরা তাদের শ্রেণীস্বার্থেই সমর্থন করে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি তাদের কাছে উচ্চ মুনাফায় পণ্য বিক্রয়ে সহায়ক। এরা ইস্পাত কয়লা ও পরিবহনের সুযোগসুবিধা পায় ঝুঁকি-মূল্যে। ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রের সমৃদ্ধি রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল, যখনই রাষ্ট্রীয় লগ্নী

কমেছে, তখনই বেসরকারী বিনিয়োগ মন্দা ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে (দ্রষ্টব্য : Dr. N. K. Sarkar : Social Structure and Development Strategy in Asia. P. P. H, New Delhi 1978 পৃ: ১৮০-৮১। ডঃ সরকার একথাও বলেছেন যে ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রের সঙ্গতি ও সম্পদ এমন ছিল না যাতে করে ঐ সব শিল্পে লগ্নী করতে পারে। (ঐ, পৃঃ ৬০-৬১)।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার বেসরকারী ক্ষেত্রের বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে, এমন কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। মূলত এবং তত্ত্বগতভাবে একথা সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পুঁজিতান্ত্রিক নিয়মকে পরিবর্তনমুখী করতে পারে কি? পারে না। যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র প্রসারিত হবে আর পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে, এরকম ধারণার যেমন কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, তেমনই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের সঙ্গে এ মতপোষণের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এ ধারণা স্বতঃস্ফূর্ততা হতে উৎসারিত, যা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীসমূহের বিকাশ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের চেয়ে দ্রুততর হয়েছে এবং সম্পদ কুক্ষিকরণের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ এর অন্তর্বর্তীকালে টাটা ও বিড়লার সম্পত্তি যথাক্রমে ৭১১ কোটি টাকা থেকে ১০৬১·২ কোটি টাকায় ও ৬৮৭ কোটি টাকা থেকে ১০৭০·২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে (Economic & Political Weekly 17. 11. 73. Economic Times 21. 7. 80)। এই সময়ের মধ্যে ভারতের প্রথম ১১টি একচেটিয়াপতি গোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে ২৬৯২ কোটি টাকা থেকে ৪৭২৫·৮ কোটি টাকায়। ইতিমধ্যে আরো কিছু গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে একচেটিয়া পুঁজির সম্পদ কুক্ষিকরণে ও তার সামগ্রিক আকারে। ১৯৭২ সালে প্রথম ১৫টি একচেটিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে একটিই ছিল আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন তথা বিদেশী অতিকায় একচেটিয়াপতি সংস্থা—আই সি আই। ১৯৭৭ সালে দেখা গেল এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লারসেন এণ্ড টুব্রো এবং ইউনিলিভারের ভারতীয় শাখা হিন্দুস্তান লিভার। ভারতের মাটিতে নয়া উপনিবেশবাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এ সময়ে একথা অস্বীকার করা যায় কি? এ ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হয় যদি ভারতে এই সব আন্তর্জাতিক শাখাগুলির বিকাশের দিকে তাকানো যায়। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৭ এর মধ্যে হিন্দুস্থান লিভার ও ডানলপ কোম্পানীর সম্পদ ও বিক্রয় বেড়েছে যথাক্রমে ২৮৩·৫ শতাংশ ও ১৪০·৪ শতাংশ এবং ১৪৯·২ শতাংশ ও ১০৪·৪ শতাংশ (দ্রষ্টব্য : SK.Goyal : Foreign Private Invest-

ment in India—Myth and Reality : Mainstream 23. 2. 80)। ভারতীয় কোন একচেটিয়াপতিগোষ্ঠির সম্পদ ও বিক্রয় এর এই বৃদ্ধিহারের ধারে-কাছে পৌঁছাতে পারে নি। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স বিভাগ একটি সমীক্ষায় দেখেছিল যে, ১৯৭৭-৭৮ সালে বিদেশী কোম্পানীগুলির গত প্রাক-কর মুনাফা (বিক্রয়ের শতাংশ হিসেবে) ৯'৮, আর ভারতীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই গড় ৪'৯ শতাংশ। ভারতের বিনিয়োগ পরিস্থিতি যে নয়া উপনিবেশবাদের অনুকূল, এর মধ্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৭৬-৭৭ কালপর্যায়কে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছে বলে ধরা হয়। এই সময়ে বিদেশী সংস্থাগুলির গড় মুনাফা (সম্পদের শতাংশ) ৪'০ থেকে ৫'০ তে বৃদ্ধি পেয়েছে —যদিও এগুলির সংখ্যা এ সময়ে ১৮৮ থেকে ১২৫এ নেমে এসেছে, (Financial Express 22.7.80)। উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে এটা নিশ্চয়ই মনে করা যায় যে, ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ দেশী-বিদেশী একচেটিয়া-পতিদের বিকাশপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি।

ভারতের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে কখনোই স্বয়ম্ভর হতে দেয়নি। তারা চেয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র তাদের পদাবনত থাক। এমনকি নয়া-উপনিবেশবাদের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের নির্ভরতা থাকুক, এটাও তারা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়নি। দুটি উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হবে। ১৯৭৭ সালে গোমিয়ায় আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন ইম্পিরেয়েল কেমিক্যালস গোষ্ঠির একটি ভারতীয় শাখা ইণ্ডিয়ান একস্‌প্লোসিভস্‌-এ শ্রমিকেরা লাগাতর ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক ও অনমনীয় শ্রমিকবিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদে। ফলে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়লাখনিগুলি এই বিস্ফোরকগুলি ছাড়া কয়লা উৎপাদন করতে পারে না। ফলে অধিকাংশ কয়লাখনিগুলি অচল হয়ে পড়েছিল, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক লে-অফের সম্মুখীন হয়েছিল। অর্থাৎ একটি কারখানার ধর্মঘটে ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় সংস্থা কোল ইণ্ডিয়া স্তব্ধপ্রায় হয়ে পড়েছিল। আর কিছুদিন হলে রেলপথ ও বহু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে পড়ত। বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী হত যে দুটি সংস্থায়, সে দুটিই আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনের শাখা : ইণ্ডিয়ান একস্‌-প্লোসিভস ও আই, ডি, এল কেমিক্যালস ; প্রথম সংস্থা তৈরী করে নাইট্রো-গ্লিসারিন জাতীয় দ্রব্য ও দ্বিতীয় সংস্থা করে স্লারি বিস্ফোরক।

কয়লাখনিগুলিতে প্রথমোক্ত বিস্ফোরক ব্যবহৃত হত—অথচ দ্বিতীয়টি দামে সস্তা, ব্যবহারের পক্ষে সহজতর এবং আধুনিকতর। কয়লাখনি আধুনিকীকরণের এত ঢক্কানিনাদ, অথচ আধুনিক বিস্ফোরক ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং গোমিয়ার ঐ কারখানায় ধর্মঘট হলে কয়লাখনি অচল হবেই, কারণ বিকল্প বিস্ফোরক ব্যবহারের উপায় নেই। তার চেয়েও আক্ষেপের কথা এই যে ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের পরে বিস্ফোরক দ্রব্য নির্মাণে স্বয়ম্ভরতার কোনরকম চেষ্টা হয় নি। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তো নয়ই, দেশীয় বেসরকারী সংস্থাকেও এ পণ্য প্রস্তুত করার লাইসেন্স দেওয়া হয় নি। সম্প্রতি অবশ্য একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা স্লারি বিস্ফোরক তৈরী করছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৭২ রাজ্য সরকারী কর্মী থাকাকালীন আমি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি প্রশিক্ষণের জন্য দিল্লীতে ছিলাম। সেই সময় হৃষিকেশ এ রাষ্ট্রায়ত্ত আই-ডি-পি-এল কারখানায় গিয়ে দেখলাম যে, ১৯৬৫ সালের পর থেকে টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল উৎপাদন বিপুল পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ভারত-পাক যুদ্ধের পরে মার্কিন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় ক্যাপসুল-আধার জিলেটিন আমদানী বন্ধ হওয়ার জন্যই এ অবস্থা। জিলেটিন নির্মাণের প্রাথমিক কাঁচামাল হল জীবজন্তুর অস্থি (Crushed bones) এবং ছালজাতীয় দ্রব্য (hides and skins)। ভারত এ দুটিতেই বিশ্বে উৎপাদনে প্রথম। কিন্তু ভারতে জিলেটিন উৎপাদনের আয়োজন যৎসামান্য। অস্থি আগে ভারত থেকে রপ্তানী হত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জর্মনী, জাপান প্রভৃতি দেশে, যেখান থেকে ভারত জিলেটিন আমদানী করে। কয়েক বছর আগে ভারতে জিলেটিনের প্রাকস্তর দ্রব্য ওসিন তৈরী করতে অনুমতি দেওয়া হয় শওয়ালেশ, র‍্যালিজ, হিন্দুস্তান লিভার প্রভৃতি বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংস্থাকে। জিলেটিন উৎপাদনে এরা তত উৎসাহী নয়, ওসিন উৎপাদনে এরা বরং বেশী আগ্রহী। এর কারণ দুটি: অস্থি থেকে জিলেটিন উৎপাদনের খরচ অনেক বেড়ে গেছে ও তুলনায় ওসিন থেকে জিলেটিন উৎপাদনে পরিব্যয় (cost) অনেক কম, এবং ওসিন ও জিলেটিনের মধ্যে দামে অনেক তফাৎ। কাজেই মুনাফার স্বার্থেই এ পদক্ষেপ। এ উদ্দেশ্যসাধনে ভারতের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী নয়া উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার পরাধীনতার নিরবচ্ছিন্নতায় এদের কিছু যায় আসে

না। পুঁজিবাদী পথানুসারি দেশে নয়া উপনিবেশবাদ যে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা ব্যবহার করে থাকে, একথা ১৯৭৫ সালে 'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ' পত্রিকা আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি জে, গারো (Problems or Peace and Socialiam, মার্চ ১৯৭৬, পৃঃ ৬৭)। একথা যে সত্য, তার প্রমাণ উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতি বিশ্বব্যাংকের সমর্থন। নয়া উপনিবেশবাদের বাহন বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টে বলা হচ্ছে : "Such enterprises (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি —লেখক) have been created in many developing for diverse reasons, including the desire to launch and control large capital-intensive plants producing fertilisers, petro chemicals or steel, which might not have been undertaken by the private sector .. Large scale industries beyond the capacity of the local private sector have been set up in many countries. In India public enterprises have made pivotal contributions to the establishment of a domestic capital goods manufacturing sector and the evolution of a professional cadre of industrial managers. "(World Development Report, 1979 : World Bank পৃঃ ৬৩-৬৪)। চিহ্নিত অংশটি বলতে যে বিশ্বব্যাংকের কর্তারা আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের বোঝাচ্ছেন, এটা অনুধাবন করা কঠিন ব্যাপার নয়।

ভারতে ষাট দশকের শেষদিক থেকে সত্তর দশকের মধ্যভাগ কালপর্বে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সংখ্যা বেড়েছে—তবে এর বড় অংশ হল রুগ্ন কারখানা অধিগ্রহণ—যেমন এন-টি-সি নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রকলগুলি। এ কারখানাগুলি প্রধানত লোকসানে চলে, যার দায়ভাগ বহন করতে হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করদাতা জনসাধারণকে। কেন্দ্রীয় সরকার কখনোই কোন লাভজনক কারখানা অধিগ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ বেসরকারী ক্ষেত্র অপারগ হলে তবেই অধিগ্রহণ বা জাতীয়করণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৩।৬।৮০ তারিখে রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট সদস্য কল্যাণ রায়ের বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জানুয়ারী ১৯৭৫ থেকে অক্টোবর ১৯৭৭ এর মধ্যে ১৮টি বেসরকারী রুগ্ন সংস্থাকে ২৪ কোটি টাকারও বেশী ঋণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৭এর সেপ্টেম্বরে দেখা যায় যে এক কোটি টাকা ও তদূর্ধ ঋণ-

গ্রহীতা ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ২৭০—সেপ্টেম্বর ১৯৭৮এ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩৪এ (New Age, 22.6.80)। ঋণের পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে ও শ্রম অসন্তোষ হলে (অর্থাৎ সরকারী তহবিল তছনছ করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেবার পরে) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি জীবনবীমা কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থা যে এখনো বেসরকারী ক্ষেত্রকেই বেশী আনুকূল্য প্রদর্শন করে থাকে, একথা তো কারো অজানা নয়। সোভিয়েত ভারততাত্ত্বিকেরাও বলেন যে, রাষ্ট্রীয় আর্থসংস্থাগুলি বেসরকারী পুঁজির স্বার্থে নিয়োজিত।

"Financial stimulation of the capitalist enterprise by the state sector is a major law of capitalist mode of production. Whatever democratic trappings embellish the intensive financial support given by the state to the capitalist sector, this support inevitably strengthens big capital which ultimately turns into a gigantic force to subjugate everything to its interests, first of all state power." (R. Ulyanovsky and V. Pavlov : Asian Dilemma, Moscow, 1973, পৃঃ ১০৩)

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার কাম্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করছে একথা ভাবা মানে বাস্তবকে অস্বীকার করা। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্ত নির্মাণ করছে এজন্যও উল্লসিত হবারও হেতু নেই, কারণ বৈষয়িক পূর্বশর্ত নির্মাণ হলেই সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয় না। বিশ্বব্যাংক যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রতি সীমিত সমর্থন জানাচ্ছে, তখন এ বিষয়ে সচেতন হবার আবশ্যিকতা অধিকতর অনুভূত হওয়া উচিত। ভারতে আমাদের অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান। গত ২৭ জুন লোকসভায় সি পি আই নেতা ইন্দ্রজিত গুপ্ত যথার্থহীন ভাষায় বলেছেন : "বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতের পুতুল। এর প্রধান উদ্দেশ্য বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থসেবা। এক অন্তর্ভিত্তি তৈরীর জন্য ৫০০০ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে যার থেকে লাভ মাত্র ৪ শতাংশ এবং শুল্কনীতি ও মূল্যনির্ধারণ নীতি এমনই যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে লোকসান হবেই।" (New Age 6.7.80.)।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের উদ্দেশ্যেই করেছে। পুঁজিতন্ত্রের নিয়মেই একইসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল শ্রমিক শ্রেণী।

একচেটিয়া পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ পছন্দ করবে। কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করবে—সংশোধনবাদীদের এই পরামর্শে শ্রমিক শ্রেণী কখনও কান দেবে না।

জাতীয় আন্দোলনের অপব্যাখ্যা

দীপিকা বসু

বেশ কিছুদিন ধরে একদল গবেষক ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব ও বিষয় নিয়ে গবেষণায় বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল তাঁরা প্রকাশ করছেন অসংখ্য বই ও প্রবন্ধের আকারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এইসব বইয়ের প্রধান প্রকাশনা-কেন্দ্র হল—হয় আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া, পেনসিলভ্যানিয়া বা প্রিন্সটন আর নয় তো কেমব্রীজ বা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। এই অতি উৎসাহী গবেষকদের দাবী হল যে তাঁরা ভারত ইতিহাসের এই পর্বের এমন সব 'নতুন' তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন যা এতদিন জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। তাই এইসব মহামূল্যবান নতুন তথ্যের আলোতে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের এক নতুন ও সঠিক বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন।

চিন্তাশীল পাঠক যদি একটু অনুধাবন করেন তাহলে এই গবেষকদের নতুন তথ্যের ভিত্তিতে লব্ধ নতুন বিশ্লেষণের মর্মকথাটি তাঁদের কাছে ধরা পড়বে। যদিও ঐ গবেষকেরা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্বের ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তবু তাঁদের সকলের বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ সূত্র, তাঁদের নবলব্ধ রাশি রাশি তথ্যের আবরণ ভেদ করে, সহজেই বেরিয়ে আসে। এই গবেষকগোষ্ঠী রচিত বইগুলির মধ্যে দুটি প্রামাণ্য বই হল অনিল শীলের 'দ্য এমারজেন্স অফ্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম' আর জে. এইচ. ক্রমফিল্ডের 'এলিট কনফ্লিক্ট্ ইন এ প্লুরাল সোসাইটি'—এই বই দুখানি থেকেই সাধারণ সূত্রগুলি ধরা যায় কারণ অন্যান্য গবেষকরা নানাভাবে একই কথা বলতে চেয়েছেন।

এখন দেখা যাক তাঁদের এই বক্তব্যটি কি?

প্রথমতঃ তাঁদের বক্তব্য হল যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল যে ধারণা এখন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে তার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে যে

তাদের শাসন বজায় রেখেছিল তার ভিত্তি শক্তি বা নিপীড়ন নয়, তার ভিত্তি হল, এদেশের মানুষের সহযোগিতা। তাঁদের প্রধান প্রতিপাদ্য হল সাম্রাজ্যবাদের সংগে ভারতীয় জনগণের বিরোধ প্রধান বিরোধ নয়—প্রধান বিরোধ হল ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যেকার অন্তর্বিরোধ।

সাম্রাজ্যবাদকে এই নতুন সাজে সাজিয়ে তাঁরা ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন ও এই আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে এক জঘন্য, বিকৃত চিত্র উপস্থিত করেছেন, এমন কি, ন্যূনতম শোভনতার সীমাকেও তাঁরা অতিক্রম করেছেন। তাঁদের ভাষ্য হল যে বহুখণ্ডিত সমাজবিশিষ্ট (Plural Society) এই দেশে প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবোধের কোন বিকাশ ঘটে নি। তাঁদের মতে ভারতের সমাজ খণ্ডিত-বহুধা বিভক্ত—ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, অঞ্চলের ভিত্তিতে। আর এই বিভক্ত সমাজের কোন সমস্বার্থবোধ ছিল না আর তাই তাদের আন্দোলন কখনই জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র গ্রহণ করে নি। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি ছিল পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী। তেমনি বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের মধ্যে গভীর ব্যবধানকে তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের অতি পছন্দসই "ভদ্রলোক" তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। তাঁদের মতে প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়—যাঁরা ছিলেন উচ্চ বর্ণজাত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ—বাংলাদেশে তারা 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত। ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ কেবল তাঁরাই লাভ করেছিলেন এবং তাদের প্রধান কর্ম কেন্দ্র ছিল তিনটি প্রেসিডেন্সী শহর—কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সংগে দেশের অগণিত কৃষক জনসাধারণ, নিম্নবর্ণের মানুষের,—তাঁদের ভাষায় 'মূক' জনসাধারণের—কোন যোগাযোগ ছিল না। এই ভদ্রলোক সম্প্রদায় ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণকারী ও রাজনৈতিক দিক থেকে আক্রমণমুখী। তাঁরা ছিলেন জমির মালিক, কৃষকদের শ্রমই ছিল তাদের সম্পদের উৎস। তাই কৃষকের স্বার্থের সংগে তাঁদের স্বার্থের ছিল দুস্তর ব্যবধান। এই ভদ্রলোক সম্প্রদায় তাই কোনমতেই দেশের ব্যাপক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী ছিল না এবং তাঁদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তা ছিল একেবারেই স্বার্থসর্বস্ব; সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই বিশেষ শ্রেণীটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবী করেছিলেন তার অর্থ

হল কৃষকদের আরও বেশী করে শোষণ করার অধিকার অর্জন করা। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়ার জন্য ছিল সচেষ্ট তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনও প্রকৃত আন্দোলন ছিল না—তা ছিল manoeuvre মাত্র—কিছু চাপ সৃষ্টি করে আরও কিছু সুযোগ আদায়ের চেষ্টা। এই বিশেষ ধরনের আন্দোলন, এইসব গবেষকদের ভাষায় 'proto-politics' (অনিল শীল, পৃঃ ১৫)। এই ধরনের আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য তারা জাতীয় কংগ্রেসের মত আইনসম্মত সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁরা সব সময়ে তাদের আন্দোলনকে এক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে ছিলেন বিশেষভাবে সচেষ্ট কারণ তারা সব সময় ভীত ছিলেন যে পাছে এই আন্দোলন ব্যাপক জনগণকে স্পর্শ করে এবং তারা সচেতন হয়ে তাদের এই সাধের স্বর্গকে আঘাত করে।

কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থা ও চরম পন্থার যে সংঘাত, তাঁরা মনে করেন, সেখানেও আদর্শের কোন স্থান নেই; তাও শুধুমাত্র কৌশল। (অনিল শীল, পৃঃ ৩৪৭) ক্রমফিল্ডের ভাষায় 'a false appearance of social radicalism' যা, তিনি মনে করেন, তাদের 'hypocrisy'র অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারত। কারণ এই চরমপন্থী রাজনীতিবিদরা নরমপন্থীদের মতই এই "Babudom" এরই অংগ।

যেহেতু এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল তিনটি প্রেসিডেন্সী শহর—তাই তাঁরা মনে করেন এই তিনটি 'অগ্রসর' অঞ্চলের সংগে দেশের অন্তর্বর্তী 'পশ্চাৎপদ' অঞ্চলগুলির ছিল বিরাট ব্যবধান। এই অগ্রসর অঞ্চলগুলির সাফল্য পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল আর তাই তাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। (অনিল শীল, পৃঃ ১১)

কাজেই, এই গবেষকদের মতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে সর্বভারতীয় কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। বিভিন্ন অঞ্চলের অসম বিকাশ, সুযোগ-সুবিধার অসম বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব আন্দোলন ছিল একেবারেই আঞ্চলিক; বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছিল এইসব বিক্ষিপ্ত আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে। এই গবেষক সম্প্রদায় বর্তমানে এই আঞ্চলিক ভিন্নতার ওপর গুরুত্ব অর্পণে বিশেষ সচেষ্ট। তাঁরা মনে করেন যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে

অনুসন্ধান করতে হবে এইসব বিভিন্ন অঞ্চলের দল-উপদল-গোষ্ঠী, তাদের নেতাদের বিশেষ অবস্থান সম্পর্কে এবং তাদের নিজস্ব আশা আকাঙ্খা যার প্রকাশ ঘটেছিল তাদের আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে।

অর্থাৎ এককথায়, এই গবেষকরা প্রতিপন্ন করতে চান যে ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন কোন অংশেই "জাতীয়" ছিল না; ঔপনিবেশিক জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আদর্শের কোন প্রেরণা ছিল না এই আন্দোলনের পেছনে; এই আন্দোলন ছিল সর্বতোভাবে স্বার্থসর্বস্ব—নানা দল, উপদল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের ক্ষমতা আর প্রাধান্য অর্জনের লড়াই। সর্বোপরি তারা যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে চান তা হল এই যে ঔপনিবেশিক জনগণের সংগে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধই মূল বিরোধ নয় বরং এই পর্বের মূল বিরোধ হল ভারতীয় জনগণের অন্তর্বিরোধ।

এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক খণ্ডিত, বিকৃত, স্বার্থদুষ্ট চিত্র তুলে ধরে তাঁরা 'আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে' সাম্রাজ্যবাদকে এক নতুন সাজে সাজাতে চান। তাঁরা তাদের নবলব্ধ তথ্যের দ্বারা দেখাতে চান যে এই ভদ্রলোক সম্প্রদায় যারা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণকারী এবং নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট তাদের হাত থেকে কৃষক সমেত ব্যাপক জনসাধারণকে রক্ষা করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের পবিত্র উদ্দেশ্য। ইংরাজ সরকারী কর্মচারীরা ছিল কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদক প্রমুখ সাধারণ মানুষের রক্ষাকর্তা, তাদের মা-বাপ। (ক্রমফিল্ড, পৃঃ ২৪-২৫)। যেহেতু এই ভদ্রলোক সম্প্রদায় ছিল জমির মালিক, তাই কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে ইংরাজ সরকার রচিত অত্যন্ত উদার ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের বাধাদানের ফলেই বানচাল হয়ে গিয়েছিল (ক্রমফিল্ড, পৃঃ ৭১)। যখন ইংরাজ "প্রগতিশীলরা" এদেশে জনপ্রিয় সরকার গঠনের কথা চিন্তা করছিলেন তখন শিক্ষিত, অর্থবান, জমির মালিক এই সম্প্রদায় চেয়েছিল জনগণের উপর নিজেদের শাসন চাপিয়ে দিতে—তারা যা চেয়েছিল তা ডেমোক্রেসী নয়, এটি oligarchy, hierarchy, plutocracy. (ক্রমফিল্ড, পৃঃ ১০৭-১০৮)। ক্রমফিল্ড দেখাতে চেয়েছেন যে জনসাধারণের ওপর শাসন ও শোষণ চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা এই ভদ্রলোক সম্প্রদায় করেছিলেন তার বিপরীতে ইংরাজ আই-সি-এস কর্মচারীরা, তাঁর ভাষায়—'that dedicated, disinterested incorruptible band of men'—চেয়েছিলেন ব্যাপক জনসাধারণের কল্যাণ (ক্রমফিল্ড,

পৃঃ ১০৭-১০৮)। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্য নিয়েই নাকি লর্ড মিন্টো ও কার্জনের আমলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার রচনা করা হয়েছিল। এমনকি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার পেছনেও নাকি ছিল এই মহৎ উদ্দেশ্য! এই গবেষকরা তাদের এইসব অমূল্য নতুন তথ্যের আলোতে সাম্রাজ্যবাদের যে মহান উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছেন হয়তো লর্ড মিন্টো বা কার্জনও নিজেদের এই মহানুভবতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। মণ্টেগুর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পর যখন ভারতীয়দের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হল এবং স্বভাবতঃই ভদ্রলোক সম্প্রদায় তার ফলে লাভবান হলেন তখন এই ইংরাজ আই সি এস কর্মচারীরা কৃষক জনসাধারণকে নিয়ে এক ব্যাপক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে উদ্যত হলেন যাতে ভবিষ্যতে প্রকৃত জননেতার আবির্ভাব ঘটে। ক্রমফিল্ড লিখেছেন—'Forced to participate in a constitutional reconstruction which they disapproved, the Bengal officials tried to salvage something from the wreckage of their paternalist ideals and came up with the idea of forming a mass peasant electorate which the bhadralok would be unable to control and which 'might in time, throw up genuine popular leaders.' (ক্রমফিল্ড পৃঃ ৩৩০)। এই হিন্দু ভদ্রলোকদের ক্ষমতা দখলের অপপ্রয়াসকে রোধ করার জন্যই নাকি তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এই দৃষ্টিভংগী থেকেই অনিল শীল উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহগুলির চরিত্র বিচার করে দেখিয়েছেন যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ প্রভৃতি বিদ্রোহগুলি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে নয়, দেশীয় মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়েছিল। এমনকি, তাঁর মতে নীল-চাষীদের বিদ্রোহের কারণ নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ নয়, এই বিদ্রোহও সংঘটিত হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে নিস্যাৎ করে এবং ইংরাজ শাসনের সঙ্গে ভারতীয়দের সহযোগিতার দিকটির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে অনিল শীল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ রাজের মধ্যে সংগ্রাম ছিল পুতুল খেলার মতো। কি অসহযোগ আন্দোলন, কি আইন

অসহযোগ আন্দোলন আর কি ১৯৪২-এর ঘটনাবলী—এই সবই ছিল দুই কাগুজে বাঘের মধ্যে সংগ্রাম। আর এই পুতুল খেলা সাঙ্গ হল যখন মুসলীম লীগ ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শুরু হয়ে গেল আসল সংগ্রাম ভারতীয় ও ভারতীয়-দের মধ্যে। কেন তাদের সংগ্রাম প্রকৃত সংগ্রাম হয়ে ওঠে নি তার কারণ দেখাতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন যে কংগ্রেস ও ব্রিটিশরাজ দুয়ের মধ্যে ছিল সমস্বার্থবোধ। দুজনেই একই লক্ষ্যের জন্য কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, কেননা মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষিত সবিধা ভোগীরা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল তারা ব্রিটিশরাজের কল্যাণেই জন্মগ্রহণ করেছিল এবং বড় হয়ে উঠেছিল (অনিল শীল, পৃঃ ৩৫১)

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। আজকের দিনের এই সব নয়া উপনিবেশবাদী ইতিহাসবিদরা প্রগতিশীলতার মুখোস পরে সাম্রাজ্যবাদের সাফাই গাইতে আসরে নেমেছেন। পুরনো সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় আজ আর জনমনে প্রভাব ফেলা সম্ভব নয় তাই তারা আজ নতুন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা আজ ভারতের অগণিত মূক জনসাধারণ,—শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায় যাদের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল—তাদের স্বার্থের প্রবক্তা হয়েই এই জাতীয় ইতিহাসের নয়া বিশ্লেষণে নিজেদের নিয়োগ করেছেন এবং এক "শ্রেণী বিশ্লেষণের" দ্বারা এই জাতীয় আন্দোলনকে শোষক শ্রেণীর আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এই কৌশলে তাঁরা অতি-বামপন্থী ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মনোহরণে অনেকখানি সমর্থ হয়েছেন।

এই পর্যায়েরই আর একখানি বই হল Judith Brown-এর লেখা **Gandhi's Rise to Power (Cambridge South Asian Studies)**। যদিও লেখার দিক থেকে বইখানি বিশেষ কোন কৃতিত্বের দাবী রাখে না, তবু যেহেতু লেখিকা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং এই পর্বের প্রধান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রয়াস পেয়েছেন, তাই জাতীয় আন্দোলনের এই নয়া বিশ্লেষণের আলোচনায় এই বইটির বিচারেরও প্রয়োজন আছে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই বইটিও ঐ একই 'মডেলে' লেখা এবং একই সুর ধ্বনিত হয়েছে বইটির ছত্রে ছত্রে। লেখিকার দাবী হল যে

এতদিন পর্যন্ত গান্ধীজি সম্পর্কে আলোচনায় তথ্যের অভাবে যে সীমাবদ্ধতা ছিল তাঁর নতুন পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তা তিনি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর দাবি—সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যা চালিকাশক্তি সেই স্থানীয় রাজনীতি—দল, উপদল গোষ্ঠীর ও তার নেতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার গভীরে প্রবেশ করে তিনি গান্ধী সম্পর্কে এক সঠিক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তাঁর বইটিতে।

প্রথমেই লেখিকা রাজনীতির এক নতুন সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে রাজনীতির সারবস্তু হল নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা (পৃঃ ১৮)। তাঁর এই সংজ্ঞা থেকেই ভারতের জাতীয় রাজনীতির কি চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তার আভাস পাওয়া যায়।

লেখিকার মতে বিদেশী শাসন হিসাবে ব্রিটিশ শাসন এদেশে নতুন কিছু নয়, ভারতে এর আগে যত বিদেশীরা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইংরাজরা হল তাদের মধ্যে সর্বশেষ (পৃঃ ১৬)। তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে আমরা ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবিদদের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

এরপর লেখিকা তাঁর অতি প্রিয় তত্ত্বগুলি পরিবেশন করেছেন একের পর এক। তিনি মনে করেন যে ইংরাজরা এদেশে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তা হল পশ্চিমী শিক্ষার সূচনা। এই বিদেশী শিক্ষা এদেশে এক নতুন সামাজিক গোষ্ঠী—নতুন 'এলিট' এর সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিমী শিক্ষার অসম বিকাশের ফলে এই শিক্ষার প্রধান সুযোগ পেয়েছিল বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ—এই তিন প্রেসিডেন্সী শহরের উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা—তারাই হল এই নতুন 'এলিট, এবং তারাই এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেছিল। প্রেসিডেন্সী শহরগুলির এই শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠীই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের মেরুদণ্ড। সংখ্যার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন একেবারেই নগণ্য—'microscopic minority' (পৃঃ ২০)। এমন কি তিনি মনে করেন অর্থ নিকাশের (Drain of wealth) বিরুদ্ধে তাঁরা যে আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন তা নিজেদের গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থে, যাতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিদেশীদের বদলে তারা আরও বেশি করে চাকুরী পেতে পারেন (পৃঃ ২১)। তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে যদি কংগ্রেসের এই দাবীগুলি পূরণ করা হত তাহলে শুধু বাঙালী 'ভদ্রলোক' আর মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের

ব্রাহ্মণেরা আরও বেশী চাকরী পেত। আর যেসব অঞ্চলে ও যেসব সম্প্রদায়ে শিক্ষিতের সংখ্যা কম, তাদের এর ফলে কোনই লাভ হত না।

এই নেতৃত্ব তাঁদের দাবীদাওয়া ও আন্দোলনকে সর্বদাই এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল, কারণ তাদের ভয় ছিল পাছে দেশের কম শিক্ষিত জনগণের আশা-আকাঙ্খা জাগ্রত হয়ে তাদের স্বার্থকে আঘাত করে। তিনি মনে করেন যে একমাত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়, তাও ব্রিটিশরাজের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য, ব্যাপকতর রাজনীতির কৌশল নিয়ে খেলা (flirt) করেছিলেন, যা অবশ্য শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় (পৃঃ ২৩)।

কংগ্রেসের রাজনীতি যে সম্পূর্ণই স্বার্থের দ্বন্দ্ব, আদর্শবাদের সেখানে কোন স্থানই ছিল না—এই কথা বোঝাতে লেখিকা বলছেন যে কংগ্রেসে নরমপন্থা ও চরমপন্থার যে সংঘাত তা কোন গভীর আদর্শগত বিরোধ নয়, শুধুই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, উপদলীয় কোন্দল। তিলক ও তাঁর পুনা-কেন্দ্রিক রাজনীতির নাকি একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাঙালী ভদ্রলোকেদের সঙ্গে জোট বেঁধে বোম্বাই-কেন্দ্রিক গোখেলকে হটিয়ে দেওয়া (পৃঃ ২৪)।

লেখিকা মনে করেন যে গান্ধীজিই প্রথম প্রেসিডেন্সী শহরের রাজনীতি-বিদদের কাজের ধারা ও গণ্ডী ত্যাগ করে নিম্নবর্ণ হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়, বণিক সম্প্রদায় প্রভৃতিকে রাজনীতির মঞ্চে সমাবেশ করলেন। তিনি প্রচলিত রাজনীতির ধারা থেকে সরে দাঁড়ালেন। ফলে, একদিকে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত শিক্ষিত গোষ্ঠীর বিরোধিতা অর্জন করলেন আর অন্যদিকে এই গণ্ডীর বাইরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করায় তাঁর পক্ষে ক্ষমতায় আসা অনেক সহজ হল। গান্ধীজির ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল তিনটি—এতদিন যেসব অঞ্চল ও গোষ্ঠী রাজনীতি থেকে দূরে ছিল, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ আর প্রেসিডেন্সী শহরগুলির তদানীন্তন রাজনৈতিক এলিটদের একটি গোষ্ঠীর সমর্থন যারা হিসাব করেছিল যে গান্ধীজি যেসব নতুন শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাদের সমর্থন নিয়ে তাদের ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়লাভ করা সহজ হবে।

গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে দেশের ব্যাপক জনসমাজের সমর্থন লাভ করেছিলেন এক অন্তবর্তী স্তরের মাধ্যমে—তাঁর ভাষায় এঁরা "sub-contractors"—যেমন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ। এঁরা

ছিলেন গান্ধীজির "loyal henchmen", (পৃ: ৩০৮) তাছাড়া এদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার, গ্রাম প্রধান, ক্ষমতালাভে আগ্রহী বিভিন্ন সম্প্রদায়—এমন কি মৌলভী, সাধু—সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে চালিত হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। নানা অঞ্চল ও নানা সম্প্রদায় তাদের বিভিন্ন স্বার্থে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় এই আন্দোলন কোন একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে নি—বিভিন্ন অঞ্চলে সেখানকার বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও ক্ষমতার কাঠামো অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছিল,—তাঁর ভাষায়, এটি হয়ে উঠেছিল এক "chamelion campaign" (পৃ: ৩:২)।

বিভিন্ন অঞ্চলের এই বিভিন্ন আন্দোলনের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জুডিথ ব্রাউন দেখাতে চেয়েছেন যে এইসব আন্দোলন সচেতনভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ছিল না, পরিস্থিতির চাপে সেগুলি নাকি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। যেমন, তিনি দেখিয়েছেন যে উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগে, জমিদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় দাবীদাওয়াকে কেন্দ্র করে। মতিলাল ও জওহরলালের মত রাজনীতিবিদরা সর্বভারতীয় আন্দোলনের কাজে এই সুযোগকে ব্যবহার করেছিলেন।

তেমনি, পাঞ্জাবে শিখদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল সনাতনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন হিসাবে কিন্তু যেহেতু সনাতনপন্থীদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার দায়িত্ব ছিল সরকারের তাই শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন কার্যগতিকে সরকারবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনকে কার্যকরী করার জন্য যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সক্রিয় হয়েছিল, লেখিকার মতে তাদের বেশীরভাগই ছিল উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডা-বাহিনী যারা গায়ের জোরে অসহযোগ কার্যকরী করতে উদ্যত হয়েছিল এবং যাদের উপর রাজনৈতিক নেতাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সরকারী রিপোর্ট উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন—তারা হল 'distinctly of lower class, backed by the riff raff of the town'.

এই 'গুণ্ডাবাহিনীর' সংগঠিত কার্যকলাপের পটভূমিতে লেখিকা সরকারের দমন পীড়ন নীতিকে স্থাপন করে তার যৌক্তিকতা দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

কাজেই, এই নানা গোষ্ঠী অসহযোগ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল শুধু নিজস্ব স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে। যেমন, প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে যেসব গোষ্ঠী

এতদিন 'এলিট' রাজনীতির বাইরে ছিল তারা এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল শুধু তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে। তিনি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন স্থানীয় অভিযোগের সুযোগ নিয়েছিলেন এবং তাঁর সমর্থকরা গ্রামবাসীদের মনে করবৃদ্ধির আশংকা জাগিয়ে তাদের কাজ হাসিল করার চেষ্টা করেছিলেন (পৃঃ ৩২৬-২৭)। আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "The lodestar which guided Das and his followers in their relations with Gandhi was political power . ." (পৃঃ ৩৩১)

Sub-contractorরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের অবস্থানকে আরও উন্নত করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই, যখন এই Sub-contractorরা গান্ধীজির আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছিল এবং নিজস্ব এলাকা ও গোষ্ঠীর মধ্যে তারা 'contractors' হয়ে উঠেছিল তখন তাদের উপর আর কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয় নি এবং এর ফল হল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসাত্মক ঘটনার আত্মপ্রকাশ। তিনি দেখিয়েছেন যে দেশব্যাপী এই হত্যা, লুণ্ঠন ও দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতেই সরকার এই অসহযোগ আন্দোলন দমনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল; সমস্ত নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং গান্ধীজিও তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গান্ধীজি একে একে তাঁর ক্ষমতার প্রধান ভিত্তিগুলিকে হারিয়ে ফেলে-ছিলেন। প্রেসিডেন্সী শহরের রাজনীতিবিদরা যাঁরা গান্ধীজিকে ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন স্বভাবতঃই অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তারাও গান্ধীজির নেতৃত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

লেখিকা মন্তব্য করেছেন যে সরকারের কৃপাই এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজিকে চরম অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করেছিল (পৃঃ ৩৩৭)।

তাঁর মতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল যদিও গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা অবিচল রেখেছিলেন।

কাজেই, জুডিথ ব্রাউন তাঁর নতুন তথ্যের ভিত্তিতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এতদিন পর্যন্ত অসহ-যোগ আন্দোলন সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা যে পৌরাণিক

কাহিনী ও সাধু জীবনীর (mythology and hagiography) অবতারণা করেছেন—যে এই আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সমগ্র জাতির আন্দোলন—আজ নতুন তথ্যের ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা পরিবর্তনের প্রয়োজন (পৃঃ ৩৭৩)। তাঁর মতে গান্ধীজির এই আন্দোলন সমাজের তিনটি স্তরের মধ্যে সবচেয়ে নীচের যে স্তর—প্রকৃত জনগণ সেখানে পৌঁছয় নি। তাঁর ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল এই অন্তর্বর্তী স্তর—'sub-contractors'—যাদের হাতে ছিল আঞ্চলিক ক্ষমতা ও প্রভাব। তাঁর মতে সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজির যে আবেদন তা কোন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক চেতনা থেকে নয়—তা হল কিছুটা ধর্মমিশ্রিত আর কিছুটা বা স্বর্ণযুগের সম্ভাবনার আশায়—তাদের কাছে গান্ধীজি ছিলেন আধা দেবতা। কিন্তু এমন আবেদন সাময়িক। অচিরেই তাদের প্রত্যাশা হতাশায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে গান্ধীজির আবির্ভাব ও ১৯২০-২২ এর উত্তেজনা ভারতের রাজনীতিতে কোন ব্যাপক বা র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন সাধন করে নি—কেবলমাত্র যে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে এতদিন রাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল তাকে আর একটু প্রসারিত করেছিল—ঐসব মধ্যবর্তী স্তর sub-contractors-দেরও এর সংগে যুক্ত করেছিল। আধুনিক রাজনীতির দ্বার জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয় নি—তিনি মন্তব্য করেছেন—যদিও প্রচলিত ধারণা যে গান্ধীজির আবির্ভাব ভারতের রাজনীতিতে গণচেতনার সূচনা করেছিল তা থেকে তাঁর এই সিদ্ধান্ত কম "নাটকীয়" তথাপি তিনি মনে করেন যে এটি নাকি আরও বাস্তবানুগ! (পৃঃ ৩৫৬)। গান্ধীজির আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, ব্যাপক জনগণকে আন্দোলনে সমাবেশ করেও তিনি তাদের এক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে, অহিংস আন্দোলনের চৌহদ্দিতেই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন; কোন শ্রেণী সচেতন আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেন নি এবং কৃষক সমেত ব্যাপক জনগণকে তিনি বুর্জোয়া শিবিরের পতাকাবাহী হিসাবেই আন্দোলনে সামিল করেছিলেন—এতো যে কোন বুর্জোয়া আন্দোলনেরই সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তাই বলে গান্ধীজি জাতীয় আন্দোলনে যে নবচেতনার সৃষ্টি করেছিলেন, যে গণ উদ্যোগ অবারিত করেছিলেন, তাকে "নাটকীয়" বলে উড়িয়ে দিয়ে, তাঁর আন্দোলন শুধু sub-contractorদের স্তর পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল এই সিদ্ধান্ত করে লেখিকা এক বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণের কৃতিত্ব দাবী করেছেন!

মোট কথা তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন আদৌ

'জাতীয়' ছিল না ; আদর্শ বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার ন্যূনতম প্রকাশও ঘটেনি কোথাও। যাকে আমরা আন্দোলন বলি তা ছিল contractors আর sub-contractorsদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। ব্যাপক সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক চেতনা পৌঁছয় নি, অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ স্রোতে তাদের যেসব আন্দোলন হয়েছিল সেগুলিও ছিল সংকীর্ণ স্থানীয় কিছু দাবীদাওয়াকে কেন্দ্র করে। কেবল পরিস্থিতির চাপে সেগুলিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে মনে হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদ তো ঐতিহাসিক ঘটনা—সাম্রাজ্যবাদ ছিল এবং এখনও আছে—যদিও একটু অন্যরূপে, অন্য কৌশলে। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততদিন তার প্রবক্তারাও থাকবেন সাম্রাজ্যবাদকে ঘষে-মেজে আর একটু গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। বিশ্বজুড়ে আদর্শগত সংঘাত যত তীব্র হবে, দেশে দেশে বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা যত গভীরতা লাভ করবে, সাম্রাজ্যবাদের এই প্রবক্তাদের এই প্রচেষ্টা আরও গতিবেগ লাভ করবে, অবলম্বন করবে নিত্যনতুন কৌশল। কাজেই এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কোথায় ?

আসলে সমস্যাটা অন্য। নয়া উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকদের এই কৌশল আজ কিছুটা ফলপ্রসূ হতে চলেছে। তাই দেখি আমাদের বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীতে আজ এইসব বই পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও দেখা যাচ্ছে এই চিন্তার ছাপ। স্বভাবতঃই অপরিণত মনের ছাত্রছাত্রীরা এইসব গবেষকদের নতুন তথ্য, নতুন বিশ্লেষণ আর অভিনব ভাষার ঝলকানিতে আজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। বিস্ময়ের কথা, জাতীয় আন্দোলনের যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত ও লজ্জাজনক বিশ্লেষণ তারা পরিবেশন করছেন সেজন্য যে বইগুলি নিন্দিত হওয়া প্রয়োজন, সেগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা লাভ করছে। এই বইগুলির স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে তাদের সমৃদ্ধ গবেষণা ও নতুন তথ্যের প্রাচুর্য। কিন্তু কি ধরনের তথ্য তাঁরা হাজির করছেন তাদের এই নতুন বিশ্লেষণে ? তাদের এই তথ্য হল বেশীর ভাগই সরকারী রিপোর্ট, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভাইসরয়, চীফ সেক্রেটারী প্রভৃতির চিঠিপত্র, ডায়েরী প্রভৃতি। একথা বোধহয় অজানা নেই যে এদেশে জাতীয় চেতনার

বিকাশে ইংরাজ সরকার বড়ই শঙ্কিত বোধ করেছিল এবং তাদের আশংকা ছিল পাছে এই চেতনা ভারতের ব্যাপক জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই প্রথম থেকেই তারা আন্দোলনকে নানাভাবে বিকৃত করার, এই আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাদের "ভদ্রলোক" ও শোষক শ্রেণী বলে চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের ব্যবধান গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদেরই ভাষায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করেছিল microscopic minorityর। এর বিকল্পে তারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে ইংরাজরাই হল সাধারণ ভারতীয় জনগণের রক্ষক, তাদের মা-বাপ। আজকের দিনের এই গবেষকরা পুরনো নথি ঘেঁটে সাম্রাজ্যবাদীদের এই বক্তব্যকেই হাজির করছেন তাদের নতুন তথ্যের নামে। ইতিহাস বিশ্লেষণে তথ্যের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। কিন্তু এই তথ্য যদি নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়, ঐতিহাসিক যদি তথ্যের ব্যবহারে তাঁর বিচারের মাপকাঠি হারিয়ে ফেলেন তাহলে তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। আর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই তথ্যের ব্যবহার করলে তো আর কথাই নেই।

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ—তার নানা অঞ্চল, নানা ভাষা, নানা ধর্ম কাজেই কিছু বিশিষ্টতা, কিছু বৈচিত্র্য থাকা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে যদি সেই ভিন্নতাকেই একমাত্র ও প্রধান বলে চিত্রিত করে তার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক জনগণের যে মৌল বিরোধ তাকে গোপন করার চেষ্টা করা হয় তবে তা ইতিহাসের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাজেই নয়া উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকদের এই অপকৌশল সম্পর্কে আজ সচেতন হবার সময় হয়েছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে আমাদের তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করে তারা যেন নিঃশব্দে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করতে না পারে সে বিষয়ে যেমন সজাগ হতে হবে; তাদের এইসব অভিনব তত্ত্বকে যেমন কঠোর সমালোচনা করে আঘাত করতে হবে সেই সঙ্গে কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি বিজ্ঞান সম্মত তথ্য নির্ভর সঠিক মূল্যায়নের জন্য ঐতিহাসিকদের এগিয়ে আসতে হবে। একথা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এমন এক যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞান সম্মত মূল্যায়ন করার তেমন প্রচেষ্টা হয় নি। এই নয়া উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকরা সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে

আসছেন। কাজেই উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ ত্যাগ করে আমাদের দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে সীমাবদ্ধতা, তার দ্বৈততা, তার আপস-মুখীনতা তাকেও যেমন স্বীকার করতে হবে আবার সেই সংগে সেই আন্দোলনের যে ইতিবাচক দিক তার যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মর্মবস্তু তাকেও তার যথার্থ মূল্য দিতে হবে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিপ্লববাদী আন্দোলন আর শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের দীর্ঘসংগ্রাম—এই সমস্ত সংগ্রামকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে দেখাতে হবে যে এই মিলিত আন্দোলনের তরঙ্গস্রোতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। এই গবেষকরা যা প্রমাণ করতে চান যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বজায় ছিল ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে আর ভারতের স্বাধীনতাও সেই সহযোগিতারই দান—এই নির্লজ্জ মিথ্যার জবাব দিতে হবে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ঃ মার্কসীয় দৃষ্টিতে কয়েকটি সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের বর্তমান স্তরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যখন দুর্বার গতিতে প্রসার ঘটছে স্বাভাবিকভাবেই তখন নতুন প্রশ্ন ও নতুন সমস্যা এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেখা দেবে; বরং প্রশ্নগুলো না দেখা দেওয়াটাই হবে অস্বাভাবিক। গত এক দশকের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে একদিকে যেমন অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে বিপ্লবের রক্তপতাকা উড্ডীন হয়েছে কিংবা নিকারাগুয়া, গ্রেনাডা প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবের গতি ক্রমশই ত্বরান্বিত হচ্ছে, তেমনি মিশর, সুদান, ইরাক প্রভৃতি দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গ প্রচণ্ড রকমের আঘাত পেয়ে গতিরুদ্ধ হয়েছে। বার্মাতে বিপ্লবের স্তর একযুগ আগে যা ছিল, প্রায় তাই আছে; বরং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সে দেশের বৈদেশিক নীতি বামপন্থী অবস্থান থেকে ক্রমশ: দূরে সরে আসছে; এই প্রসঙ্গে গত হাভানা সম্মেলনে আফগানিস্তান প্রশ্নে বার্মার বিদেশমন্ত্রীর মনোভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পেরুতে একসময়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লবী সামরিক সরকার উত্তরোত্তর জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে দেশের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সত্তরের দশকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই জটিলতাকে তাই মার্কসবাদী গবেষকেরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখছেন যার গুরুত্ব অপরিসীম। এই আলোচনাগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে মূলতঃ দুটি প্রশ্ন আজ মুক্তি আন্দোলনের সামনে বারে বারেই দেখা দিচ্ছে। প্রথমতঃ, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা কি হবে? দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রমুখীন করে তোলার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি হবে? সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হবে।

॥ ১ ॥

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বৈতচরিত্র সম্পর্কে লেনিন ১৯২০ সালে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁর সুপরিচিত ঔপনিবেশিক থিসিসে যে মূল্যায়ন করেছিলেন, পরবর্তীকালের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে মূলতঃ তারই প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেনিন তাঁর ব্যাখ্যায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়ার আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকার কথা স্বীকার করেছিলেন ; কিন্তু একই সাথে তিনি জাতীয় বুর্জোয়াদের বুর্জোয়া শ্রেণী চরিত্র এবং কমিউনিস্ট-দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। লেনিনের এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে সচেতন থাকলে জাতীয় বুর্জোয়ার শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে উদাসীন থাকার কোন অবকাশ থাকে না। যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় উপনিবেশ বাদের জোয়ালমুক্ত তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে ধনতন্ত্রমুখীন দেশগুলিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে ও তারই সাথে সাথে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্মরণে রেখেই ১৯৬০ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের দলিলে বলা হয়েছিল যে সামাজিক সংকট ও সংঘাত যত বেশী বৃদ্ধি পাবে তত বেশী করে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সাথে আপস করার প্রবণতা দেখা দেবে। এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই ১৯৬৯ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মস্কো দলিলে বলা হল যে জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপসের দিকে ঝুঁকছে এবং শ্রমিকশ্রেণী কৃষক ও দেশপ্রেমিক পেটিবুর্জোয়াদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় প্রতিক্রিয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিককালের মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় ও গবেষণায় এই বিশ্লেষণ বিভিন্ন-ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। ষাটের দশকের প্রখ্যাত সোভিয়েত গবেষক ভি তিয়াগুনেংকো তাঁর Bypassing Capitalism গ্রন্থে দেখান যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে জাতীয় বুর্জোয়াকে কেন্দ্র করে জাতীয় ঐক্য গঠনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না ; যুক্তফ্রন্টে বড়-জোর জাতীয় বুর্জোয়ার সম্ভাব্য অংশগ্রহণের কথা ভাবা যেতে পারে (পৃঃ ৬৩)। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত

বিশেষভাবে যেটি লক্ষণীয় তা হল এই যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরগুলি থেকেই বর্তমানে নতুন পুঁজিপতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাঁদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছে দেশের আমলাতন্ত্র (Problems of Peace and Socialism, November. 1974 পৃঃ ৮৬-৮৭)।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে এই মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত সোভিয়েত গবেষক কে এন ব্রুতেনৎসের National Liberation Revolutions Today (দুই খণ্ড, ১৯৭৭) গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অধ্যাপক ব্রুতেনৎস কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমতঃ, ১৯৫৬ সালের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পরবর্তী যুগে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে যে এক ধরনের শোধনবাদী ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা দেখা দেয়, তিনি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিংশতি কংগ্রেসের পরে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগের সম্পূর্ণ নেতিবাচক পরিপ্রেক্ষিতের স্বভাবতঃই একটা পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে একটি বিপ্লবী শক্তি হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাকেই তার বৈপ্লবিক সত্তার মাপকাঠি বলে ধরা হয় ও এর ফলে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সত্তা ও জাতীয় বুর্জোয়ার বিপ্লবী ভূমিকা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকাটি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩-৬৪)। অধ্যাপক ব্রুতেনৎসের দ্বিতীয় বক্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্তরে, জাতীয় বুর্জোয়ার অবশ্যই একটি প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে ; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর পর্বে, সাম্রাজ্যবাদের সাথে জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বন্দ্বকে অনেক বেশী পরিমাণে ছাপিয়ে ওঠে জাতীয় বুর্জোয়ার শ্রেণীস্বার্থের সাথে শ্রমজীবী-মানুষের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত এবং সেই পর্যায়ে ক্রমশই জাতীয় বুর্জোয়ারা তাঁদের বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রকে প্রকট করে তোলে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩-৫৪)।

॥ ২ ॥

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব কোন অবস্থাতেই জাতীয় বুর্জোয়ারা দিতে পারে না, কারণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে শ্রেণীশক্তি হিসেবে বুর্জোয়াদের বিপ্লবী ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে যায় (ক্রতেনৎস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১)। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ায় উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নটি এসে পড়ে ; অর্থাৎ, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত করাকে নিশ্চিত করতে হলে ক্রমশঃই কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নটি কি অপরিহার্য হয়ে ওঠে না ? প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল, কারণ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে অক্ষুণ্ণ রেখেই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক আলোচনায় এই প্রশ্নটি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট গভীরভাবে আলোচিত হয় নি। তবুও সাম্প্রতিক-কালের দু'ধরনের ঘটনাবলীর দিকে তাকালে এই বক্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রথমতঃ, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কমিউনিস্ট পার্টি তার নেতৃস্থানীয় স্বাধীন ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন না থাকার প্রধান কারণ হল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বৈপ্লবিক ভূমিকাকে অত্যন্ত বড় করে দেখা। মিশর, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত অবশ্যই করে ; কিন্তু তাকে তারা সম্পূর্ণ করতে পারে না। এই অসমাপ্ত বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার প্রসঙ্গেই কমিউনিস্টদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণের প্রশ্নটি এসে পড়ে। একেবারে সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে একদা বিপ্লবী গণতন্ত্রী বলে খ্যাত ইরাকের শাসকগোষ্ঠী আজ ক্রমশই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে উঠছে। এককথায়, প্রগতিশীল, পেটি-বুর্জোয়া আদর্শে উদ্বুদ্ধ ইরাকের বাথ পার্টি বা নাসেরের যুগে মিশরের আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন কখনও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারায় পুষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার বিকল্প হতে পারে না।

এরই পাশাপাশি দ্বিতীয় যে কৌকটি দেখা যাচ্ছে তা হল তৃতীয় দুনিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব তীব্র, কঠোর শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য

দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং এগুলি হল এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, আফগানিস্তানের মত দেশ, যেখানে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় পুষ্ট মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। তাই আজ আফগানিস্তান ও ইরাকের, দক্ষিণ ইয়েমেন ও বার্মার, এ্যাঙ্গোলা ও সিরিয়ার, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ বেশী করে প্রকট হয়ে উঠছে।

॥ ৩ ॥

সমগ্র আলোচনাটি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: প্রথমত, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে বুর্জোয়াশ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, জাতীয় বুর্জোয়ার সীমিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীতাকে কোন অবস্থাতেই শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী চেতনার সাথে এক করে দেখা যায় না। তৃতীয়ত, অধনতান্ত্রিক পথ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী স্তর হলেও এর মূল ভিত্তি হল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পুঁজিবাদকে পরিহার করে সমাজতান্ত্রিক স্তরে বিপ্লবকে উন্নীত করার পূর্বশর্তগুলি প্রতিষ্ঠা করা এবং তার ফলেই জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা এই স্তরে বিশেষভাবে সীমিত হতে বাধ্য। চতুর্থত, জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সুসম্পন্ন করার নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি এবং কোন অবস্থাতেই তাই কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিতে পারে না। পঞ্চমত, বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের নেতৃত্ব ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বের মধ্যে মৌলিক ও গুরুতর পার্থক্য আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন, বর্তমান ইরাক) বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সাথে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সংঘাতও অনিবার্য্য হয়ে ওঠে এবং সেই পর্যায়ে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা উত্তরোত্তর তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতা এবং প্রগতিশীল ভূমিকা হারাতে থাকে।

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নগুলি আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তরের অগ্রগতি ঘটান আজ প্রায় অসম্ভব। সি পি আই ও সি পি আই (এম) উভয় পার্টিরই আজ তাই প্রয়োজন এই প্রশ্নগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা।

নেহরুর সমাজতন্ত্র ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ

নরহরি কবিরাজ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে সম্প্রতি গজিয়ে উঠেছে একটি নতুন কমিউনিস্ট পার্টি। এই শিশুর প্রথম নামকরণ করা হয় "জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি", পরে এই নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেওয়া হয়েছে "সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টি"। এই পার্টির পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি প্রামান্য দলিল প্রচার করা হয়েছে। দলিলটির শিরোনাম হল "বর্তমান অবস্থায় চাই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট"। (Draft Political Thesis of The All India Communist Party by Roza Deshpande and others)

এই দলিলে দাবি করা হয়েছে—ভারতে লেনিনবাদের পতাকাটি এই নব গঠিত পার্টিটিই উর্ধে তুলে ধরতে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে হবে, তবে একভাবে নয়; প্রত্যেকটি দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাবার নিজস্ব পথ আবিষ্কার করতে হবে—লেনিনের এই উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁরা ঘোষণা করেছেন ভারতকেও গড়ে তুলতে হবে তার নিজস্ব পথ। সেই পথের ইঙ্গিত তাঁরা পেয়েছেন নেহরুর "সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণের" মধ্যে। পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক "সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণ" আবিষ্কারের কাজটিকে 'হারকিউলিয়ান' (herculean) বলে অভিহিত করে এই দলিলে ঘোষণা করা হয়েছে—একথাও মনে রাখতে হবে যে "সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণ বা সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার ধারণাটি বিকাশমান দেশগুলির রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটি অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-অবদান।" লক্ষ্য করুন, দলিল রচয়িতাদের মতে "সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা" ও "সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণ" কথাগুলি সম-অর্থবাচক। অথচ, কমিউনিস্ট মাত্রই জানেন যে "সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা" কথাটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, এটি লেনিন-কথিত অ-ধনতান্ত্রিক পথের অপর নাম।

শুনতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি যে দলিল রচয়িতাদের মতে—কি

অ-ধনতান্ত্রিক পথ, কি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কি নেহরুর সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণ—সবই একসূত্রে বাঁধা। তাঁদের মুখেই শোনা ভাল। তাঁরা লিখেছেন—মনে রাখতে হবে, এই **"সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণেই ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত হয়ে উঠবে।"** "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণের কর্মসূচী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়"—বলে যে সমস্ত বামপন্থী মনে করেন তাঁদের দলিল রচয়িতারা তিরস্কার করতেও ছাড়েন নি।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, অ-ধনতান্ত্রিক পথ তথা সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা এবং নেহরুর সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এক অভিনব আবিষ্কারই বটে!

৭ — ১

নেহরুর সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণকে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা (তথা অ-ধনতান্ত্রিক পথ) বলে চালানো সংশোধনবাদীদের কৌশলের একটি দিক। এর অপর দিক হল অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কেই লেনিনবাদী ব্যাখ্যাটি বাতিল করে তার একটি শোধনবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করা—যার দ্বারা প্রমাণ করা যায়—লেনিন যাকে অ-ধনতান্ত্রিক পথ বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন যাকে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা আখ্যা দিয়ে থাকেন, তা আসলে নেহরুর সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণেরই রকমফের।

পুরানো ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখা যাবে যে কোনো কোনো নেতা ও তাত্ত্বিক বহু দিন আগে থেকেই এই মতের পোষকতা করে আসছেন। তাঁরা বলছেন—"অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ সমাজতান্ত্রিক বিকাশ নয়, অথবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থে **এটি ধনতন্ত্র-বিরোধীও নয়**। তবে এটি এই অর্থে ধনতন্ত্রবিরোধী যে এটি একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ বন্ধ করবে এবং তাকে অবলুপ্ত করবে।" (বড় হরফ আমার)। **(Draft Programme of the Communist Party of India (1961)—by S. A. Dange & others).**

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে রোজা দেশপাণ্ডের দলিলে ১৯৬১ সালের এই কর্মসূচীর প্রতি সোচ্চার সমর্থন ঘোষণা করা হয়েছে।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেটি হল—অ-ধনতান্ত্রিক পথ সমাজতন্ত্রমুখীন পথ নয়। আবার এটি একচেটিয়া

ধনতন্ত্রের পথও নয়। এটি একটি তৃতীয় পথ—অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ। অর্থাৎ অ-ধনতান্ত্রিক পথ ধনতন্ত্রের পথেরই একটি উন্নত সংস্করণ!

২

অ-ধনতান্ত্রিক পথের তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন স্বয়ং লেনিন। তিনি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন—যে সমস্ত পরাধীন দেশ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক বিকাশের ধনতান্ত্রিক স্তরটি অতিক্রম করা কি অপরিহার্য? এর উত্তরে তিনি বলেন—না। তিনি মন্তব্য করেন—"উন্নত দেশগুলির সর্বহারার সাহায্য নিয়ে, এই দেশগুলির পক্ষে বিকাশের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে, ধনতান্ত্রিক স্তরের মধ্য দিয়ে না গিয়েও কমিউনিজমে পৌঁছানো সম্ভব।" (Lenin—Report of the Commission on the National and Colonial Questions)।

লক্ষ্য করার বিষয়, লেনিন এখানে **ধনতান্ত্রিক স্তর** অতিক্রম করে, কয়েকটি অন্তবর্তীকালীন স্তর অতিক্রম করে, কমিউনিজমে যাবার কথা বলছেন।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে (১৯৬১) এই লেনিনীয় সূত্রটি সামনে রেখে বলা হয়েছে—সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সামনে দুটি পথ খোলা আছে—একটি ধনতন্ত্রের পথ, অপরটি সমাজতন্ত্রের পথ। সেখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথকে কোনো তৃতীয় পথ হিসাবে নয়, সমাজতন্ত্রের পথের অঙ্গ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

একাশী পার্টির দলিলেও এই অর্থেই অ-ধনতান্ত্রিক পথের উল্লেখ রয়েছে।

পরবর্তীকালে ৭৫টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মহাসম্মেলন (১৯৬৯) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, অ ধনতান্ত্রিক পথের অপর নাম "সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা"। বলা হয়েছে যে, এই পথ "সমাজতান্ত্রিক বিকাশে উত্তরণের সর্তগুলি প্রস্তুত করে।"

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্বিংশ কংগ্রেসে (১৯৭১) প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে পরিস্কার করে ঘোষণা করা হয়েছে—"অ-ধনতান্ত্রিক পথ দীর্ঘ মেয়াদে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পথ।"

কাজেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতে—অ-ধনতান্ত্রিক পথের

লক্ষ্য ধনতান্ত্রিক স্তরটি বাতিল করা, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উপযোগী সর্তগুলি সৃষ্টি করা।

লেনিনের ভাষায় বলা চলে—"এটি এখনও সমাজতন্ত্র নয়, কিন্তু এটি ধনতন্ত্রও নয়, এটি সমাজতন্ত্রের দিকে এক শক্তিশালী পদক্ষেপ।" (Lenin—The Impending Catastrophe and how to combat it).

৩

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন যেখানে বলেন—অ-ধনতান্ত্রিক পথের লক্ষ্য হল : ধনতান্ত্রিক স্তরটি বাতিল করা, সেখানে সংশোধনবাদীরা ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে এক ধরনের ধনতন্ত্রের (একচেটিয়া ধনতন্ত্রের) বদলে আর এক ধরনের ধনতন্ত্রের (অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের) পক্ষে ওকালতি করছেন।

অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বিকৃত করে এই সংশোধনবাদী নেতা ও তাত্ত্বিকেরা এক 'মার্কসীয়' তত্ত্বও খাড়া করেছেন।

তাঁরা মনে করেন শ্রমিকশ্রেণী যদি যথাযোগ্য অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, যদি তারা একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যেকার বিরোধের সদ্ব্যবহার করতে পারে, তাহ'লে অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক আচরণে পরিবর্তন দেখা দেবে, তার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটতে পারে।

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে একজন তাত্ত্বিক লিখেছেন—"অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন।" "এদের সঙ্গে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি অর্থনীতিক্ষেত্রে, এখনও বিচ্ছেদ ঘটে নি।" তবে শ্রমিক ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিগুলির সংগ্রামে যতই গতিবেগ সঞ্চারিত হবে, ততই একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের বিভাজন প্রক্রিয়াটি, যার বস্তুগত ভিত্তি বিদ্যমান, তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করবে, "দুই অংশের মধ্যে ভাগাভাগি (split) সম্পূর্ণ হবে এবং অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা চূড়ান্তভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে এসে যোগ দেবে।" (Aspects of C.P.I Programme, 1966)

তাহ'লে ঐ তাত্ত্বিকের মতে—অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কোনো বিশেষ অংশ নয়, সমগ্রভাবে অ একচেটিয়া বুর্জোয়ারা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দিতে পারে।

এই ধরনের তত্ত্বে যে কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে না ভাতিওা কংগ্রেস স্পষ্ট করেই তা ঘোষণা করেছে।

শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীর তাত্ত্বিকেরা অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যে বিপ্লবী রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি যে বিশেষভাবে দানা বাঁধছে তার প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন তদানীন্তন ভারত সরকারের কার্যকলাপের মধ্যেই। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে চিত্রিত করা হল "অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের এক অ-সামান্য রাজনৈতিক প্রতিভূ" হিসাবে (ঐ পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর কোন্ ধারায় ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের প্রতিভূ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা অবশ্য আমাদের জানা নেই।

নব প্রতিষ্ঠিত "সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টির" নেতারা নিজেদের মনে করেন তাঁরা উপরোক্ত চিন্তাধারার উত্তরসাধক।

এঁদের মতে পণ্ডিত নেহরু ভারতে একটি তৃতীয় পথের প্রতিষ্ঠাতা, যেটি পুরো সমাজতন্ত্রও নয়, আবার একচেটিয়া ধনতন্ত্রও নয়, এই দুইয়ের মাঝামাঝি, যাকে বলা যেতে পারে "সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা"।

বলাই বাহুল্য, এই দলিল রচয়িতাদের মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

৪

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে নেহরুর সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিপ্লবী ভাবনা খোঁজার প্রবণতা নতুন ঘটনা নয়। বস্তুত কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধ'রে একটি চিন্তাধারা অব্যাহত রয়েছে যার মূল কথা নেহরু সমাজতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা। আরও, এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা, আমাদের দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে, এক সহযোগী শক্তি।

রোজা দেশপাণ্ডের দলিলটির মধ্যে দিয়ে ঐ চিন্তাধারাটি নতুন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। ঐ দলিল রচয়িতারা পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীমতী গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার অনুকূলে ভারতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি

হয়েছে তাতে এত গদগদ যে তাঁরা মন্তব্য করেছেন—"সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা আমাদের দেশে আজ যেরূপ তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী ঘটনা এমনটি এর আগে কখনও ঘটে নি।"

তাঁরা মনে করেন—এর পূর্ণ সুযোগ শ্রমিকশ্রেণী গ্রহণ করতে পারবে কিনা—এটি নির্ভর করবে শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক নেতৃত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের সঠিক ধ্যানধারণার উপর।

সংশোধনবাদী নেতা ও তাত্ত্বিকেরা পণ্ডিত নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীকে অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের প্রতিভূ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রকে অ-ধনতান্ত্রিক পথের রকমফের বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন—অ-একচেটিয়া বুর্জোয়া ও একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যে বৈর-সম্পর্ক (antagonistic) বিদ্যমান। তাঁদের ধারণা—অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করতে সক্ষম।

এঁরা ভুলে যান—অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারাও বুর্জোয়া। বুর্জোয়াদের দ্বৈতচরিত্র এদের ক্ষেত্রেই বিশেষ ক'রে খাটে। অ-একচেটিয়া বুর্জোয়া একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। সেই কারণে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য ও সংগ্রামের কথা ওঠে না। কিন্তু অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের সঙ্গে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়াদের বিরোধ আছে, তাই তাদের সঙ্গে ঐক্য ও সংগ্রামের সম্পর্ক বিদ্যমান। ঐক্য তখন, যখন অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সংগ্রাম তখন, যখন এরা ঐ সকল শক্তির সঙ্গে আপোষ করে। এই দ্বৈততা আছে বলেই এরা কখনও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নির্ভরযোগ্য মিত্র হতে পারে না। কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ার বিপ্লবী চরিত্র এবং অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ার বিপ্লবী চরিত্র কখনও এক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না।

দীর্ঘদিন ধ'রে এক শ্রেণীর নেতা ও তাত্ত্বিক একচেটিয়া বুর্জোয়া ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাগাভাগির (split) শুভ মুহূর্তের জন্যে অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই ভাগাভাগি ঘটে নি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না।

তার মূল কারণ ধনতন্ত্রের পথের চৌহদ্দীর মধ্যেই বুর্জোয়াশ্রেণীর উভয়

অংশই কাজ করতে বদ্ধপরিকর। অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও একচেটিয়া ধনতন্ত্র একসূত্রে বাঁধা। সেই সূত্রটি হল ধনতন্ত্রের পথ। ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণ করলে ধনতন্ত্রের বিকাশের নিয়মগুলি মানতে হবে বৈকি! ধনতন্ত্রের নিয়ম হল: "বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খাবে"। এটিই ঘটেছে কংগ্রেস 'সমাজতন্ত্রের' নিরাপদ আশ্রয়ে। কংগ্রেস 'সমাজতন্ত্রের' আওতায় নিশ্চয়ই অ-একচেটিয়া পুঁজি বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী স্ফীতকায় হয়েছে একচেটিয়া পুঁজি।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ধনতন্ত্রের আর একটি অমোঘ নিয়ম অবিরত কাজ ক'রে চলেছে। সেটি হল ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ। দেশের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম যখনই তীব্র আকার ধারণ করে, তখনই একচেটিয়া বুর্জোয়া ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা নিজেদের মধ্যে বিরোধ সংকুচিত ক'রে আনে এবং একযোগে শ্রেণীসংগ্রামের শক্তিগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করে। এর প্রমাণ ভারত সরকারের (যার মধ্যে একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়া—উভয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা রয়েছে) সাধারণভাবে শ্রমিক-বিরোধী নীতির মধ্যে রয়েছে। এর উদগ্র প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি শ্রেণীসংগ্রামের চরম মুহূর্তগুলিতে—সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট, রেল ধর্মঘট প্রভৃতি দমনে কংগ্রেস সরকার যে চণ্ডনীতি গ্রহণ ক'রে থাকে তার মধ্যে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কোনো অংশই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগ দিতে পারে না—একথা অবশ্যই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগ দিতে পারে, তবে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দিলেও তারা হয়ে রইবে দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন। কিন্তু, সমগ্রভাবে অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের বিপ্লবী রূপান্তর ঘটবে এবং তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নির্ভরযোগ্য মিত্র হয়ে উঠবে—এ আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র!

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শ্রমিকশ্রেণী এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু তাই ব'লে শ্রমিকশ্রেণী সর্বশক্তিমান নয়। শ্রমিকশ্রেণীর যাদুস্পর্শে অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক প্রবণতায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে এ কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণী যেমন পুরুষকে স্ত্রীতে, স্ত্রীকে পুরুষে পরিণত করতে পারে না, ঠিক তেমনিই তার পক্ষে শোষকশ্রেণীকে শোষিতশ্রেণীতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব নয়। প্রকৃতির নিয়মের মতই সমাজ বিকাশের নিয়মকে বদলে দেবার ক্ষমতা কারুর নেই।

শ্রমের নান্দনিকতা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো শিল্পকর্মে বস্তুর অতিরেক যে সৌন্দর্য থাকে তাকেই আমরা নান্দনিক সত্তা বলে থাকি আর তা দেখে ও উপলব্ধি করে আমরা পুলকিত হই। কিন্তু বস্তুর দ্বারাই সেই শিল্প নির্মিত হয়। বস্তুকে রূপান্তরিত করলেই তবে তা শিল্পে পরিণত হয় আর তার রূপদানে পরিপূর্ণতা আনে শিল্পের সৌন্দর্য যা আমাদের আনন্দ দেয়। কিন্তু তার নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যে শ্রম থাকে তার আনন্দ থাকে স্রষ্টার নিজের যাকে আমরা বলতে পারি শ্রমের নান্দনিকতা। কথাটা হয়তো একটু নতুনের মতোই শোনায় ; কারণ শ্রমকে আমরা সাধারণত কায়িক বা মানসিক ক্লেশ বলেই মনে করে থাকি। শ্রমজাত দ্রব্যে স্রষ্টার নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হই ; কিন্তু তিলে তিলে সেই নৈপুণ্য প্রয়োগের সময় স্রষ্টার মনে নান্দনিকবোধ তৃপ্ত হয়, অর্থাৎ তাঁর শ্রমে যখন ধীরে ধীরে বস্তুর সাহায্যে শিল্পরূপটি গড়ে উঠতে থাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও এক আনন্দোপলব্ধি হয়। অথচ সেদিকটাকে আমরা তেমন মূল্য দিই নে। শ্রমের আনন্দকে বাদ দিয়ে শ্রমকে আমরা সাধারণত ক্লেশ রূপেই ধরি।

তাজমহলের কথাই যদি ধরা যায়। শত শত বর্ষ ধরে এই অতুলনীয় মর্মর-সৌধের সৌন্দর্যে অজস্র লোক মুগ্ধ। কিন্তু যে রূপদর্শী স্থপতির মাথায় এই শ্বেত মর্মরসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা এসেছিল ও এটি রূপ পেয়েছিল তার কথা ইতিহাসে বিস্মৃতির অতল গর্ভে। আমরা শুধু এই কৃতিত্বের জন্যে সম্রাট শাহ্‌জানকেই স্মরণ করে থাকি। ইতিহাসেও তাঁরই কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেখতে পাই। কিন্তু এর রূপকারের কথা আমরা ভাবি নে বা তার সম্বন্ধে কিছু জানিও নে। শাহ্‌জানের চিন্তায় এমন একটি সৌন্দর্যের আকর মর্মরসৌধ নির্মাণের ধারণা এসেছিল এবং তাকে রূপ দেবার উপযুক্ত স্থপতি তিনি খুঁজে বের করেছিলেন, এ কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য ; কিন্তু তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন মাত্র, নিজে নির্মাণ করেন নি। কিন্তু যে রূপকার এটিকে রূপ দিয়েছিলেন তিনি যদি রূপদর্শী না হতেন ও তাঁর যদি রূপতৃষ্ণা না থাকত তবে শাহ্‌জানের অভিলাষ

পূর্ণ হতো না বা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর রূপ অজস্র মানুষকে মুগ্ধও করত না। এটি ইতিহাসে আর দশটি স্মৃতিসৌধের মতোই চিহ্নিত হত। ইতিহাসের স্মারক হয়েই তা থাকত; সৌন্দর্যের আকর হয়ে উঠত না। মর্মরের পর মর্মর সাজিয়ে এটি যখন গড়া হচ্ছিল তখন প্রতিটি মর্মর-প্রস্তর স্থাপনে ছিল স্রষ্টার আনন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছিল তাঁর সৌন্দর্যবোধ। এটাকেই বলতে পারি আমরা সৃষ্টির বা শ্রমের আনন্দ—অর্থাৎ শ্রমের নান্দনিকতা।

মানুষের যে-কোনো সৃষ্টিতেই এই শ্রমের নান্দনিকতা থাকতে পারে। অবশ্য দ্রব্য উৎপাদনের মূলে প্রয়োজনবোধ থাকলেও তার সঙ্গে নান্দনিকবোধও সক্রিয় ছিল মানুষের সৃষ্টিকর্মের প্রায় গোড়া থেকেই। তার হয়ত গুণগত বিকাশ ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা আসে শ্রমের উন্নতির ফলে, যা বস্তুগতভাবে অনেকখানি নির্ভর করে সামাজিক ব্যবস্থা ও শ্রমের অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার উপর। অবশ্য শ্রমের মধ্যেই নান্দনিক অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ রাখার একপেশে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। তা হলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই কেন? আলোচ্য বিষয় তা নয়। প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন যে কারণেই হোক শ্রমের যে নান্দনিক দিক আছে সেটাই এখানে আলোচনার বিষয়। অপ্রয়োজনীয় শ্রমেও নান্দনিকবোধ থাকে—যেমন খেলাধূলা বা দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধির পেছনে কোনো আশু প্রয়োজনের দাবি থাকে না—কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আবেগ তাতে কাজ করে। যেমন ফুটবল খেলায় প্রতিপক্ষকে গোল দেবার জন্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে বলেই প্রচণ্ড কায়িক শ্রমেও খেলোয়াড়রা ক্লান্তি বোধ করেন না শ্রমে আনন্দানুভূতি থাকে বলে; আবার প্রতিপক্ষকে গোল দিতে পারলে নান্দনিকবোধ পরম তৃপ্ত হয়। বুদ্ধির খেলায়, যেমন দাবা বা তাস খেলায় মস্তিষ্কের শ্রম হয়। সেই শ্রমের লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে কিস্তিতে মাৎ করা বলেই মস্তিষ্কের শ্রমে অবসাদ আসে না; বরং প্রতিটি চালে সে আনন্দ অনুভব করে আর কিস্তি দিয়ে মাৎ করতে পারলে তার অপরিসীম নান্দনিক পরিতৃপ্তি হয়।

আবার প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করার কঠোর শ্রমেও মানুষের আনন্দ থাকে। যেমন ঝড়ে প'ড়ে নৌকা বা জাহাজ রক্ষা করতে প্রচুর শ্রম করতে ও ও বেগ পেতে হয়; কিন্তু সেই সংগ্রামে কেউ ক্লান্তি বোধ করে না প্রতিকূলতা

অতিক্রমণের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় পণ থাকে বলে—আর অতিক্রম করার পরে আসে পরম আনন্দ।

মল্লযুদ্ধে বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রভূত কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রাণও যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কাতর না হয়েই সানন্দে তাতে প্রবৃত্ত হয়। সেখানেও জীবনধারণের প্রয়োজনের কোনো দাবি থাকে না। যুদ্ধে সৈনিকদের কায়ক্লেশ কম হয় না। কিন্তু মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে যে সংগ্রাম করে, প্রতিটি রণে তার আনন্দ হয় স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা ও আবেগ থাকে বলে। আর যে পরদেশ আক্রমণের জন্যে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে আসে তার রণক্লেশ আনে অবসাদ ও বিষাদ—কারণ সেখানে তাকে কাজ করতে হয় যন্ত্রের মতো নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে অথবা ভ্রান্ত উন্মাদনায়, কিম্বা নিতান্ত জীবিকার প্রয়োজনে। সেখানে তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা আবেগের স্থান নেই; কারণ যুদ্ধটাই তার জীবনবোধের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ।

শ্রমের আনন্দ নির্ভর করে যে অবস্থায়, যে উদ্দেশ্যে ও যে বস্তু নিয়ে একজন কাজ করে তার উপর। শ্রমের ঐতিহাসিক ক্রম সম্পর্কে মার্কস যা লিখেছেন তা থেকে বিষয়টা বোধগম্য হতে পারে। তিনি বলেছেন, ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা ও ক্রীত শ্রমের যুগে শ্রম হচ্ছে নিরোধক অর্থাৎ শ্রমের বিকাশের পথ অবরুদ্ধ আর তা হচ্ছে বাধ্যতামূলক; তার বিপরীত দিকে অনশ্রম হচ্ছে "স্বাধীনতা ও সুখ।" এ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, প্রথমটা হচ্ছে প্রতিকূল শ্রম, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত শ্রম যা অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ যা চাপিয়ে দেওয়া হয় না, শ্রমের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি হয়। তার অর্থ এই নয় যে, এরূপ শ্রম নিছক একটা খেলা বা অবিমিশ্র আনন্দ। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, বিশেষ বিষয় (objective) ও বিষয়ী (subjective) অবস্থায় শ্রমেরও নান্দনিক আনন্দ থাকা সম্ভব।

বিষয়গত অবস্থা বলতে বোঝায়, কি ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি। তার উপর নির্ভর করে শ্রমের নান্দনিকতা। মধ্যযুগে কোনো কর্মশালার শ্রমিক সবকিছুই করতে পারতো। ইচ্ছে করলেই একজন কারিগর হতে পারতো। এই মধ্যযুগীয় কারিগররা বিশেষ ধরনের কাজে উৎসাহ বোধ করতো এবং তাতে দক্ষ হয়ে উঠতো আর তার ফলে খানিকটা শিল্পবোধও বাড়তো।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের পদ্ধতি এমন যে, তাতে শ্রমের কোনো নান্দনিক আনন্দ নেই, শ্রমিক সেখানে কলের একটা যান্ত্রিক উপাঙ্গ মাত্র, পুঁজিপতির কাছে শ্রমও সেখানে যেমন বিকোয় পণ্য হিসেবে, তেমনি তার উৎপাদিত দ্রব্যও পণ্য, যা থেকে শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। একটি বস্ত্রকলের শ্রমিকদের আত্মিক দিক দিয়ে উন্নত হওয়া এবং তাদের নান্দনিক অনুভূতির ও কর্মের উৎকর্ষ বিধানের সুযোগ পাওয়ার পরিবর্তে দুঃসহ অবস্থায় তাদের পঞ্চেন্দ্রিয়কে নিয়োজিত করতে হয়।*

শ্রমের সক্রিয়তা স্বাধীনভাবে ও অবাধে বাড়াবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র কমিউনিজম বা সাম্যবাদই। তার কারণ, প্রত্যেকে সেখানে নিজের অভিলাষ অনুযায়ী কর্মকুশলতা বাড়াবার ও প্রতিভা কাজে লাগাবার সুযোগ পায়। সুতরাং শ্রম যখন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তখন আত্মোপলব্ধিও হয়।

দ্রব্য উৎপাদনেই হোক আর শিল্পকর্মেই হোক, শ্রমের চরিত্র একই, বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মিশ্র ক্রিয়া অর্থাৎ দুটির যুগপৎ সক্রিয়তা। শ্রম যে আনন্দ দেয় ও আবেগের উল্লাস আনে তা সাধারণত মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য যার নান্দনিক অনুভূতির কোনো নির্দিষ্ট স্বরূপ নেই। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং ডোঁতা কাজেও প্রফুল্লতা আসতে পারে যখন কাজটা সমাপ্ত হয় বা তা থেকে বেশ কিছু অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।

পরশ্রমজীবীদের কিন্তু সৃষ্টির এই আনন্দ থাকে না। ভোগ করে তাদের হয়তো সুখ ও আনন্দ হয়; কিন্তু শ্রমের আনন্দ সেখানে অনুপস্থিত।

খেলাধুলায়ই হোক, কি শিল্পকর্মেই হোক, বা দ্রব্যনির্মাণেই হোক, যেকোনো প্রয়াসেই ইচ্ছাশক্তির ঐকান্তিক প্রয়োগ দরকার যা কাজের মধ্য দিয়ে নান্দনিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। মানুষের বিশেষ বিশেষ গুণের মধ্যেই থাকে যার-যেরকম ইচ্ছাশক্তি হতে পারে তার উৎস। চৈতন্য কর্মে পরিণত হয় যার রূপ ও গতিমুখ একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের অধীন।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ—অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আসক্তি, প্রবণতা—সত্তা-নৈমিত্তিক বাস্তবতা এবং শিল্পকর্ম উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যানুভূতির শক্তিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু কর্মধারায় নান্দনিক অনুভূতি সৃজনে বেশি কাজ করে

---

* মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর The German Ideology, মস্কো সংস্করণের ৬৭ পৃষ্ঠা এবং মার্কস-এর Capital বইয়ের প্রথম খণ্ডের (মস্কো সংস্করণ, ১৯৬৫) ৪৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য—তা খেলাধূলাই হোক আর যে-কোনো ধরনের শ্রমই হোক। তার অর্থ কাজের লক্ষ্যের (object) প্রতি যে কাজ করে তার বিষয়ী (subjective) মনোভাব। একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি আবেগগত সক্রিয় গতি থাকলেই নান্দনিক আনন্দ আসা সম্ভব। তার উদ্ভব কোনো ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকে নয়, উদ্ভব চিত্তের আকাঙ্ক্ষা থেকে। এই আকাঙ্ক্ষা কিন্তু ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সংহত প্রয়াস (যেটাকে বলা যায় কাজের ছন্দ) ও শ্রমের দ্বারা সেই ব্যক্তির চিত্তাকাঙ্ক্ষা যখন কোনো কিছুতে রূপ পায় তখন সেই বিষয়ী (subjective) দিকটা বিষয়গত (objectified) হয়ে যথার্থ শক্তিতে পরিণত হয় যার থাকে সামাজিক তাৎপর্য।

যে শ্রমে চিত্ত প্রসন্ন থাকে সেটা কেবল একজনের আশু প্রয়োজনই মেটায় না, তা জীবনে বেঁচে থাকাকেও সার্থক করে তোলে। কমিউনিস্ট সোসাইটিতে একজন তেমন কাজই পায় যে কাজে তার সামর্থ্য আছে আর যেদিকে তার প্রবণতা তার উপযোগী কাজই তাকে দেওয়া হয়। অতীতে স্থায়ী দারিদ্র্য শ্রমজীবী মানুষকে জীবিকা ও জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে পেশা নিতে বাধ্য করতো। প্রায় ক্ষেত্রেই তরুণদের পছন্দমত বৃত্তি যোগাড় হয়ে উঠতো না; যে-কোনো কাজ পেলেই তারা খুশি হতো। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজে নান্দনিক দিক থেকে পছন্দসই বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে যা অতি সহজ কথায় প্রকাশ পায়—'এটাই আমার উপযোগী কাজ' অথবা 'এমন কাজই তো আমি পছন্দ করি।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, পছন্দসই বৃত্তি গ্রহণের সঙ্গে কি কখনো সামাজিক স্বার্থের বিরোধ দেখা দিতে পারে না? সমাজের সমকালীন প্রয়োজনগুলির সঙ্গে কি ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ ও নান্দনিক আবেগের বিরোধের কোনো সম্ভাবনা নেই? প্লেখানভ বলেছেন—না, তা নেই। তাঁর বক্তব্য, ঐতিহাসিক বিচারে নান্দনিক অভিগামিতার আগে যখন এসেছে প্রয়োজনের দাবি, তখন এই দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। সৌন্দর্যের ধারণা স্পষ্টতই সামাজিক প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত।

প্রাত্যহিক জীবন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে হয়ত এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কর্ম ও বৃত্তি যখন কেবল তাদের কালের সেবা করতো তখন তাতে কোনো নান্দনিক আবেদন থাকতো না; কিন্তু নতুন ধরনের কাজে যাদুমন্ত্রের মতো

একটা মোহিনীশক্তি কাজ করে যা নিছক ধারণা নয়, নিতান্তই সত্য ; তার কারণ সৌন্দর্য হচ্ছে জীবন যা তাকে সর্বদাই নিখুঁতকরণের দিকে এগিয়ে দেয়। যখন নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বাধীনতা থাকে তখন যে-কোনো দিকে পড়াশুনা বা কাজ করার সর্বদ্বার প্রত্যেকের সামনে খুলে যায়, বিশেষ করে যুব-শ্রেণীর সামনে যে তা হয় তা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতিতে তখন নতুন নতুন কর্মপ্রণালী উদ্ভূত হতে থাকে। এককথায় বলতে গেলে এগুলিই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিষয়গত ব্যবস্থা যা শ্রমকে নান্দনিকভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলে।

সামাজিক অবস্থাসমূহ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষে ও বিকাশে এবং তার উদ্দেশ্য নির্ধারণে কিভাবে প্রভাব ফেলে (যেটাকে বলা যায় প্রত্যাবর্তিত ক্রিয়া—অর্থাৎ reflex action) সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী পাভলভ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভূমিদাস প্রথায় একজন ভূস্বামী কোনো দায়দায়িত্ব পালন না করে অন্যদের শ্রমের ফসল ভোগ করে। তার পরিজন ও প্রিয়জনদের ভরণপোষণের জন্যে সাধারণত যে কাজটুকু করা তার দরকার তাও সে করে না। সুতরাং তার জীবন পরগাছার মতো। মানবজীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন বলে তার প্রত্যাবর্তিত লক্ষ্য (reflex of purpose) নিষ্ক্রিয় থাকে। আর ভূমিদাস প্রথা ভূমিদাসদের সম্পূর্ণরূপে নির্জীব করে রাখে ; কারণ তারা তাদের ভবিষ্যতের কোনো আশাই দেখতে পায় না।*

তাই অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে পাভলভ লিখেছিলেন : আলস্য, উদ্যম-হীনতা, যে-কোনো কাজের প্রতি ঔদাসীন্য ও হেলাফেলা ভাব রুশ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যবহির্ভূত, এগুলো হচ্ছে বিষাক্ত গাঁজলা। রুশ জাতির সৃজনশীল শক্তির অভ্যুত্থানে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তিনি আরো বলেছেন : লক্ষ্যের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য বিষয়, লক্ষ্যটা তখন অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে পড়ে। আপাতবিচারে কথাটা বেখাপ্পা মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। মুখ্য বিষয় বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কর্ম ও আবেগের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। এমন অনেকে আছেন যাঁরা কল্পনায় একটা ভাবী সুখী জীবনের কথা ভাবেন ও তার স্বপ্ন দেখেন ; কিন্তু সেই জীবনলাভের জন্যে কার্যত তিনি কিছুই করেন না।

* Problems of Modern Aesthetics, Moscow, P. 109

সেই ভাববিলাসীদের সম্বন্ধে সতর্ক করার জন্যে তিনি বলেছেন : শুধু লক্ষ্য থাকলেই হয় না, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে প্রবল আবেগ ও কর্ম থাকা চাই।

শ্রমরত অবস্থায়ই যে নান্দনিক আনন্দ হয় তার দ্বারা একজন নিজের সত্তা উপলব্ধি করে। মার্কস এ সম্বন্ধে বলেছেন : "এর দ্বারা বোঝায় না যে, এ-ধরনের শ্রম নিছক খেলা বা অবিমিশ্র আনন্দ।"

এমনও কি সম্ভব, কঠোর শ্রমের কাজ যে কাজ, করতে ঘর্মাক্ত কলেবর হতে হয়, বা যে কাজ কায়িক ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই কষ্টকর, তাতে একজন পরম সুখানুভব করতে পারে? এর উত্তর পেতে হলে প্রথমেই নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণত যে ধারণা আছে সেটাকে বিচার করে দেখতে হয়। সে ধারণা হচ্ছে নান্দনিক উপলব্ধি একান্তই আত্মিক; নিছক কায়িক ইন্দ্রিয়ানুভব নান্দনিক নয়।

শ্রমের নান্দনিকতাকে সাধারণত সৌন্দর্যবোধের সমতুল বলে ধরে নেওয়া হয়। শ্রমরত অবস্থায় যে আবেগগত বৈশিষ্ট্যসম্ভূত সৌন্দর্যবোধ হয়, এটা কেবল তারই বেলা খাটে। কিন্তু কেবল সুন্দরের আওতায় শ্রমের নান্দনিকতা সীমাবদ্ধ রাখলে বিস্ময়ের ঐশ্বর্য থেকে মানুষের শ্রমের নান্দনিক অনুভূতিগুলিকে বাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর আনন্দতত্ত্বে বলেছেন : বিস্ময়ে পুলকশিহরণ হয় আর তাতেই আনন্দ। সুতরাং সুন্দর ও বিস্ময় মিলিয়েই শ্রমের নান্দনিক পূর্ণতা।

দৈনন্দিন জীবনে নান্দনিকতা বলতে বোঝায় যা প্রীতিপ্রদ ও সুখকর তাই। কিন্তু আমাদের নান্দনিক তৃপ্তি কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। পুশকিন লিখেছেন : "বিকট মুখব্যাদন, অতল গহ্বর, উত্তাল সমুদ্র, ভয়ঙ্কর যুদ্ধও আনন্দ দেয়।" যেমন, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে দেখা যায়, বঙ্গোপসাগর বক্ষে ঝড়ের প্রচণ্ডতা ও উন্মত্ত জলরাশির উদ্দামতা দেখে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে অত ক্লেশের মধ্যেও সে আনন্দ অনুভব করেছিল। নন্দনতত্ত্বে বহুকাল এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, বিষাদময় বা মহৎ কিছু অনুধাবনে আবেগগত কষ্টবোধ ও মানসিক চাপ পড়ে; আর লক্ষ্য ও তার অনুধাবন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তা শুধু মানসিকই নয়, কায়িকও। ট্রাজেডি ভয়ঙ্কর ও বিষাদময় হওয়া সত্ত্বেও তা দেখে কিন্তু মানুষ আনন্দ পায় যাকে বলে 'ক্যাথারসিস্'। সুতরাং শ্রমের নান্দনিক সত্তা কেবল সুন্দরের মধ্যেই আবদ্ধ নয়; মহৎ, বীরত্বপূর্ণ বা বিষাদময় কিছুর মধ্যেও অনেক সময় নান্দনিক অস্তিত্ব থাকে।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে মার্কস মনে করতেন, লক্ষ্যে পৌঁছাবার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বোধ, সুন্দরের মধ্যে তার যে অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা আছে তাই হচ্ছে সৌন্দর্য অনুধাবনের সোপান। কিন্তু রূপ ছাড়া সৌন্দর্য নেই। এটা বোঝাবার জন্যে তিনি অতি সহজ ও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন: "বুভুক্ষু মানুষের কাছে অন্নের কোনো মানবীয় খাদ্যরূপ নেই, শুধু আছে খাদ্যের জন্যে একটা স্থূল স্পৃহার রূপ যা দেখা যায় মনুষ্যেতর প্রাণীজগতের মধ্যেও। সুতরাং এ ধরনের খাদ্য গলাধঃকরণের সঙ্গে জন্তুজানোয়ারদের খাওয়ার ধরনের কোনো পার্থক্য আছে কি না বলা কঠিন। অভাবের যন্ত্রণায় যে অস্থির, অতি সুন্দর খেলা সম্পর্কে তার বোধ থাকে না; ধাতু ব্যবসায়ীরা কেবল পণ্যমূল্যই বোঝে, ধাতুর সৌন্দর্যবোধ বা তার মূল বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাদের বোধ থাকে না।"*

মার্কস-এর এই সূত্র ধরে বলা যায়, কোনো স্বর্ণব্যবসায়ী যদি বোঝে সোনার ব্যবসার চাইতে পুরানো লোহালক্করের ব্যবসা বেশি লাভজনক তবে সোনার ব্যবসা ছেড়ে সে লোহার ব্যবসার দিকেই ঝুঁকবে। আর মার্কস মানুষের খাদ্যবোধ সম্পর্কে যা বলেছেন তারও বহু দৃষ্টান্ত দেখা গেছে এদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়। অন্নক্লিষ্ট মা উদরের জ্বালায় নিজের সন্তানকে বাঁ হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে যা পেয়েছে তা-ই নিজে গো-গ্রাসে গিলেছে—যেমন, খাদ্য নিয়ে বিড়াল তার বাচ্চার সঙ্গে কাড়াকাড়ি-কামড়াকামড়ি করে।

সুতরাং নান্দনিক অনুভূতি বস্তুর কোনো অরূপতায় জাগে না। তা আসে রূপের অন্তর্নিহিত ও সুসমঞ্জস গুণ থেকে যাকে বলা যায় ছন্দ। তা নিছক বাস্তব প্রয়োজনসাপেক্ষ নয়। তাজমহলের মর্মরগুলি ছন্দোবদ্ধ না হয়ে যদি এলোমেলো করে সাজানো হতো তবে এই সমাধিসৌধ অপরূপ ধারণ করতো না।

আনন্দানুভূতি ও নান্দনিক আনন্দের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস সঙ্গীত-সচেতন কান ও রূপকর্মের সৌন্দর্য দেখার মতো চোখের কথা বলেছেন। সঙ্গীত-সচেতন কান বলতে বোঝায় কেবল ধ্বনিসমষ্টির স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নয়, সেই ধ্বনিসমূহের সামঞ্জস্যকে—অর্থাৎ সুসমঞ্জস ছন্দে বা তালে বাঁধা যে সুররূপ তা উপলব্ধি করা। তাই সঙ্গীত মানুষের সঙ্গীতবোধকে জাগায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে মানুষের সৃজনশীল কর্মের লক্ষ্য থাকে নতুন কিছু

---

* কার্ল মার্কস-এর Economic and Philosophic Manuscipts of 1844, মস্কো সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃঃ ১০১।

সৃষ্টি করা। প্রকৃতিতে যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলো সুসঙ্গতরূপে ব্যবহার করে নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করারই নাম সৃজনশীল কর্ম। স্রষ্টা হয়ে মানুষ প্রকৃতি থেকেই আর এক প্রকৃতি সৃষ্টি করে আর সেটাই হয় তার কাছে বাস্তব জগৎ। সৃষ্টির এই মূলতত্ত্ব কেবল উচ্চমার্গের বা কোনো বিশেষ ধরনের কর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বস্তুগত বা বুদ্ধিগত যে-কোনো ধরনের সৃজনকর্মেই যে শ্রমের দরকার তার বেলাও এই মূলতত্ত্ব সমভাবে প্রযোজ্য।

সামঞ্জস্য বিধানেই সৌন্দর্য্য, এই ধারণা মানুষের আসে বহুকাল আগে। সৃজনশীল কর্মের লক্ষ্য যত উন্নত ও তাতে পৌঁছানো যত কষ্টসাধ্য হয়, জয়ের প্রফুল্লতা ও সৃষ্টিতে নান্দনিক আনন্দ ততই বেশি হয়ে থাকে। সৃজনে উৎকর্ষ ও নানা বৈচিত্র্য এসেছে এক দীর্ঘ কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যার মধ্যে মনুষ্য-সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস নিহিত।

শ্রম ও শ্রমপ্রক্রিয়ার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের কৃৎকৌশল, সৌন্দর্যবোধ ও নান্দনিক অনুভূতি কিভাবে বেড়েছে, এঙ্গেলস অতি সহজ ও সুন্দরভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের লাঙ্গুলহীন বানর থেকে মানুষে উত্তীর্ণ হতে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। সেই বিবর্তনের কালে মানুষের হাতের কাজ ছিল অতি সহজ-সরল ধরনের। এই বিবর্তনের অবস্থায় মানুষের আচরণ অতি নিম্নস্তরের অসভ্যরা যেমন বন্যজন্তুর মতো আচরণ করে তার চেয়ে উন্নততর ছিল না। তারা প্রায় একই স্তরে ছিল। ছুরির ব্যবহার শেখার আগে পর্যন্ত ইতিহাসে যা দেখা যায় তাতে সন্দেহ থাকে না যে, তাদের কর্মপ্রণালী বহুকাল পর্যন্ত একই অবস্থায় ছিল; অর্থাৎ বৈচিত্র্যহীন অনুল্লেখযোগ্য তা। কিন্তু যেদিন মানুষের হাত দুটো মুক্ত হলো সেদিন মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গেল। হাত মুক্ত হওয়ায় কাজের ক্ষমতা ও দক্ষতা সেই থেকে বেড়ে গেল। এই হাতের যদৃচ্ছ ব্যবহার পুরুষানুক্রমে বেড়ে চললো, যেটাকে বলা যায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সৃজনশীলতা।

সুতরাং কেবল শ্রম করার যন্ত্রই নয়, শ্রম থেকে তার উদ্ভবও—অর্থাৎ শ্রম করতে করতেই সামনের পা দুটো ক্রমশ হাত হয়ে যায়। দুটি বাহুই মানুষের সৃজনশীল কর্মের মূলে। নয়া নয়া ধরনের কাজ করতে করতে পেশী, অস্থিসংযোজক ঝিল্লী এবং দীর্ঘকালের পরম্পরাগত অভ্যাসের ফলে তা এমন এক বিশেষ উন্নত পর্যায়ে আসে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই চাতুর্য আরো জটিল থেকে জটিলতর কর্মে প্রয়োগের দ্বারা শ্রম মানুষের হাতকে

এমন নৈপুণ্যে পৌঁছে দেয় যার দরকার হয় র‍্যাফেলের ছবি, তোরভাল্ডসেনের মূর্তি, প্যাগানিনির সঙ্গীত রচনার জন্যে।*

লেনিন বলেছেন, সত্যের জন্যে মানুষের অন্বেষা মানবীয় আবেগ ছাড়া কদাপি হয় নি এবং হতে পারে না।

সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, নান্দনিক অনুভবও বিশেষ ধরনের মানবীয় আবেগই। নান্দনিক অনুভূতি কেবল ইচ্ছাশক্তিকেই প্রবল করে না, তা কল্পনাকেও জাগিয়ে দেয় এবং কোনো বস্তুর রূপায়ব দেখার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে। তা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকেও জাগ্রত করে যা সজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সৃজনশীল প্রয়াসে এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান (intuition) সজ্ঞানের পাশাপাশি থেকে একই সঙ্গে কাজ করে। অতএব নান্দনিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে উচ্চতম ও বিশিষ্টতম মানবিক আনন্দ যা সৃজনশীল কাজে প্রেরণাদায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রম-প্রক্রিয়ায় নান্দনিক অস্তিত্ব অবশ্যই থাকা চাই। তা না থাকলে শ্রমকে আমরা নান্দনিক অনুভূতির উৎস বলতে পারিনে। এই দুটির মধ্যে আধার ও আধেয়র সম্পর্ক বলা যেতে পারে। নিছক সজ্ঞানজাত কর্ম যা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, অথবা তাতে গর্ববোধ বা কর্তব্য সম্পাদনে সচেতনতা, কিম্বা শ্রম-প্রক্রিয়ায় দৈহিক আনন্দ ও নৈতিক সন্তুষ্টি—এগুলোর কোনোটাতেই নান্দনিক অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য নেই। এ ক্ষেত্রে হেগেলের ধারণাগুলি বিশেষ কাজে লাগতে পারে। তিনি বলেছেন, শিল্পীর কাজে বিষয়ী (subjective) দিকটাই শিল্পের রূপকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে মনে হলেও শিল্প-নির্মাণের যে উপকরণগুলিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শিল্পীর সৃজনশীল প্রক্রিয়া চিন্তার আঙ্গিক রূপকে অনুসরণ করে না, তা আসে সৃজনকর্মে যে বস্তুগুলির সংহতি হয় সেগুলোর প্রতি স্রষ্টার সূক্ষ্ম দৃষ্টিও ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে। আসলে তা নির্ভর করে বিষয় (object)-কে অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার উপর।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একজন দারুশিল্পী যখন কাঠ খোদাই করে কোনো মূর্তি নির্মাণ বা কারুকার্য করার কথা ভাবে তখন তাঁর উপযোগী কাঠ ও যন্ত্রপাতির কথা চিন্তা করতেই হয় তাঁকে। কাজের সময় সেগুলোর ব্যবহারের দিকেই তার নজর থাকে বেশি। যন্ত্রপাতিতে সূক্ষ্মতা না থাকলে শিল্পকর্মে

* Frederick Engels, Dialectics of Nature, Moscow, 1974, pp. 171-72.

সূক্ষ্মতা আসে না আর সেগুলোর ব্যবহারে হাতের নৈপুণ্য না থাকলে শিল্পটিও পরিপূর্ণ রূপ পায় না। একজন চিত্রকর বা ভাস্কর সম্পর্কেও একথাই খাটে। কেবল কারু বা দারু শিল্পের বেলাই নয়, যে-কোনো সৃজনশীল কর্মেই বস্তুর গুণাগুণ জানতে হয় আর তা ব্যবহারে হাতের নৈপুণ্য থাকা চাই। শুধু ভাব বা ভাবনা থাকলেই শিল্পকর্ম হয় না।

শ্রমপ্রক্রিয়ায় নান্দনিক অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা নির্ভর করে যেটি তৈরি করা হয় তার ও যা দিয়ে তৈরি করা হয় তার সক্রিয় পারস্পরিক সম্পর্কের উপর—তার অর্থ সেটাকে যখন রূপ দেওয়া হয় তখন। একজন চিত্রকর ছবি আঁকার সময় তাঁর তুলির যতগুলি টান দেন, ছবি আঁকার আগে তিনি প্রতিটি টানই মনে ছকে নেন এমন নয়, আঁকতে আঁকতে তাঁর মন হাতের তুলিটিকে দিয়ে অনেক নতুন টানও করিয়ে নেন—অর্থাৎ বিষয়ীভাব (subjective) দিয়ে বিষয়কে (object) গড়ে তোলা হয়। সুতরাং তাঁর পূর্বপরিকল্পিত ছবিতে যা ভেবে তিনি ছবি আঁকায় হাত দিয়েছিলেন, আঁকার সময় তাঁর তুলি তাতে নতুন কিছু সংযোজন না করে এমন নয়। সৃজনশীল কর্মে স্রষ্টা তাঁর মস্তিষ্কে বা কল্পনায় যে রূপকল্প এসেছিল কেবল তদনুসারেই কাজ করেন না, রূপ দেবার সময় বস্তু থেকে স্বভাবতই যে বাধা আসে আর তার যে প্রতিক্রিয়া হয় ব্যবহৃত যন্ত্রের উপর সেটাকে মেনে নিয়ে ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁকে তার অভিষ্টলাভের দিকে এগুতে হয়। এটাকেই বলা যায় শ্রম বা সৃজনকর্মের দ্বান্দ্বিকতা।

নিবন্ধ আর দীর্ঘ করে লাভ নেই। বিষয়টা এতই জটিল ও ব্যাপক যে সাময়িক পত্রের একটি প্রবন্ধে সব কথা বলাও যায় না বা বিষয়টা পরিষ্কার করাও সম্ভব নয়। তবু এই সামান্য ভূমিকা করা হলো এই ভেবে যে, আজ যখন শ্রমকে দাসত্বমুক্ত করে সৃজনশীল করার দিকেই দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের গতি, যার সূত্রপাত হয় লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে, তখন আমাদের দেশেও এ নিয়ে অনুসন্ধিৎসা ও আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বিদ্যাসাগর ও রায়ত

নন্দিনী সেন

উনিশ শতকের বাংলার উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সংগঠিত এবং "বাঙলার জাগরণ" নামে পরিচিত সেই নতুন ধরনের আন্দোলনটি ছিল এদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনা উন্মোধনের এক প্রয়াস। এই চেতনার উৎস ছিল বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবিকতার আদর্শ। তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর অংশ ইওরোপে তখন চলছিল এই চেতনার বিকাশ। উনিশ শতকের বাংলায় সেই নব্য চিন্তাধারার একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। "জাগরণ" আন্দোলনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত একজন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয়— স্বীকৃত সমাজ সংস্কারক। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সম্পর্কের সমস্যাটি তাঁর মনোযোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টাকে প্রভূত পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল। সমাজ সংস্কারক রূপে তাঁর সেই কাজকে সফল করে তুলতেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতা-সুলভ চেতনার অনুপ্রেরণায় বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন দেশে বস্তুবাদী যুক্তিনিষ্ঠ মানবিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম। স্বদেশে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতিকে সজাগ করে তুলতে চেয়েছিলেন উপযুক্ত শিক্ষার আলোকে। তাঁর এই প্রচেষ্টার অনুপূরক অঙ্গ হিসাবেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রয়োজনীয় সাহিত্য রচনায় ও সাংবাদিকতায়। কিন্তু, সাধারণত, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য-সাধকরূপে সুপরিচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন কখনই সম্ভব নয়, যদি না সেটি করা হয় তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের পটভূমিতে। সীমিত পরিসরের এই আলোচনাটিতে একটি বিশেষ দিকের প্রতি কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮৫৭ সালের পর থেকে ভারতকে ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজার ও তার কাঁচামালের উৎস হিসাবে গড়ে তোলার যে আয়োজন শুরু হল, তার প্রভাবে

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল। কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ্ আরও বৃদ্ধি পেল, লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে দৈনিক শ্রম-জীবী ও কুলিতে পরিণত হল। উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টিও তীব্র বেকার সমস্যার সম্মুখীন হল। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত চড়া হারে ও সুসংবদ্ধভাবে ভারতীয়দের উপর ট্যাক্স আরোপের নীতি গ্রহণ করল। এই অবস্থায় একদিকে দেশীয় জমিদার, মহাজন, ইওরোপীয় দালাল পুঁজিপতির হরেক রকম জুলুম আর অত্যাচার, আর একদিকে তীব্র বেকার সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি আর ট্যাক্সের বোঝার চাপে কৃষক-শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে জীবন একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠল। লবণ শুল্ক, তামাকের উপর শুল্ক, লাইসেন্স ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স—একটার পর আর একটা ট্যাক্স ধার্য হতে লাগল। ট্যাক্সের বোঝা আর তার জন্যে অত্যাচারের দিক থেকে ভারত আর সমস্ত দেশকে ছাড়িয়ে গেল। বলা বাহুল্য, এই ট্যাক্সের বোঝা সবচেয়ে বেশী করে বহন করতে হল দেশের কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণকেই।

এই পটভূমিতে গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে আরোপিত ইনকাম ট্যাক্স স্বভাবতই, ভারতীয় জনমনের সর্বস্তরে গভীর ক্ষোভ ও তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে। জনসাধারণের কাছে এটি তাদের "রক্ত শোষক" রূপে গণ্য হয়।

সেকালের সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই চোখে পড়বে মফঃস্বল থেকে সম্পাদকের কাছে "প্রেরিত পত্রে" ইনকাম ট্যাক্স এসেসরদের এই ধরনের নানা অত্যাচারের বিবরণ। ১৮৭০ সালের ১৭ই মার্চের "অমৃতবাজার" পত্রিকায় প্রকাশিত এই রকম একখানি পত্রে লেখক জানিয়েছেন "পল্লীগ্রামের কোন কোন সামান্য দোকানদার যাহার মাসে ৫০ টাকার অধিক আয় হওয়া কঠিন তাহাদিগের কাহাকে প্রথম কাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতেছেন।" পত্রপ্রেরক আরও লিখেছেন, "পল্লীগ্রামের দোকানদারদের বার্ষিক ১৬০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ১৫০ টাকা আয় হইতে পারে ইহা অসম্ভব কার্য। কিন্তু কোন কোন এসেসর হুগলী ডিভিসন মধ্যে তাহা করিতেছেন।" যাহার ৫০০ শত টাকা আয় তাহাকেও সমর্থ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সুতরাং তিনি প্রশ্ন তুলেছেন "ইহা কতদূর সঙ্গত?" অতঃপর জানাচ্ছেন "এসেসরগণ যাহাকে একটুকু ভদ্র দেখিতেছেন তাহার আয় ৫০০ শত টাকা হইবে এরূপ স্বতঃসিদ্ধ করিয়া ট্যাক্স ধার্য করিতেছেন, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের সামান্য কৃষিজীবী

লোকদিগের মধ্যে ৫০০ শত টাকা বার্ষিক আয় অতি অল্পেরই আছে। সুতরাং তাহাদের উপর এরূপ ট্যাক্স ধার্য করাতে ঘোরতর অত্যাচার হয় সন্দেহ নাই।" এই ধরনের অত্যাচারের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পত্রপ্রেরক জানাচ্ছেন "আমরা শুনিলাম হুগলী ডিভিসনে কোন এসেসর স্থানের অবস্থা দেখিয়া এরূপ রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে তথায় দুই-চারিজন লোক ভিন্ন কেহই ট্যাক্সের অধীন হইতে পারে না, তাহাতে কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহাকে অযোগ্য কর্মচারী বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন।" অতঃপর তিনি মন্তব্য করেছেন "...এসেসরেরা গভর্ণমেণ্টের ভাবভঙ্গী দেখিয়া একটুকু সম্ভ্রান্ত বা ভদ্রলোক দেখিলেই ট্যাক্স করিতেছেন।" সেকালে ইনকাম ট্যাক্স এসেসরদের উৎপীড়নের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ১৮৭০ সালের ২২শে ডিসেম্বরের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" "বেঙ্গলী" হতে উধৃত একটি খবরে প্রকাশ মানভূমে জনৈক ইনকাম ট্যাক্স এসেসরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ইনকাম ট্যাক্স এসেসরদের এই জাতীয় অত্যাচারের বহু ঘটনা সমসাময়িককালের সরকারী নথীপত্রেও লক্ষ্য করা যায়। রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের মিস্‌লেনিয়াস প্রসিডিংস (মার্চ, ১৮৬৯)-এ দেখা যায় ঘাটাল সাবডিভিসনে ইনকাম ট্যাক্স ধার্য করার সূত্রে একসময়ে ট্যাক্স এসেসরের অত্যাচারের মাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে উৎপীড়িতেরা নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিকারের আশায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণ নেয়। উক্ত নথীপত্র থেকে আরও জানা যায়, ঐ অসহায়দের হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিকার প্রার্থনা করে বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট উইলিয়ম গ্রের কাছে যে অভিযোগ পেশ করেন, তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে কোন কার্য-উপলক্ষে তিনি ঘাটালে উপস্থিত হলে ঐ সাবডিভিসনের বিভিন্ন এলাকা থেকে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ এসে তাঁকে ইনকাম ট্যাক্স এসেসরের সেই একই অত্যাচারের কাহিনী শোনাতে থাকে। সরকারী নথীপত্র থেকে এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক আনীত অভিযোগের তদন্তকারী অফিসার ছোটলাটকে প্রদত্ত তাঁর সেই তদন্তকার্যের রিপোর্টে অভিযোগের সম্পূর্ণ সত্যতা স্বীকার করে সকৃতজ্ঞচিত্তে সংশ্লিষ্ট তদন্তকার্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় "বিদ্যাসাগর জীবন চরিতে" (পৃঃ ১০-১১) এই ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন "অগ্রজ মহাশয়, বিপদগ্রস্থ দেশস্থ সাধারণের উপকারের জন্য, প্রায় দুইমাস কাল অনন্যকর্মা ও

অনন্যমনা হইয়া কেবল এই কার্যেই লিপ্ত ছিলেন।...উক্তকার্যে.....অগ্রজ মহাশয়ের দুই সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হয়। প্রসঙ্গত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় মন্তব্য করেছেন: "উহারা পূর্বে মনে করিত, যে, বিদ্যাসাগর কেবল বিদ্যোৎসাহী ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তক। এখন দেশস্থ লোক ভালরূপ অবগত হইলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি সমদৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।"

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকারী মহলে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তোলে। আর্থিক দিক থেকে, ইংরেজ সরকারের কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর মোটেই সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছিল না। জমির বাজার মূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকায় জমি হতে উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশ জমিদারেরা আত্মসাৎ করুক এটা এখন, আর কোনমতেই ইংরেজ সরকারের মনঃপূত হচ্ছিল না। অথচ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সরাসরি অবসান ঘটানও, নানা কারণে, তাদের কাছে আদৌ কাম্য ছিল না। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অব্যাহত রেখে তাদের আর্থিক লোকসানটি পুষিয়ে নিতে বাংলার কর্তৃপক্ষ এখন থেকে একটির পর আর একটি ট্যাক্স আরোপ করে ভূমিজাত লভ্যাংশ অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় শুষে নিতে লাগল। সরকার কর্তৃক আরোপিত সেই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্সের বোঝা দেশের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হল। কারণ সেই ট্যাক্স দৃশ্যত যারই উপর ধার্য করা হোক না কেন, ভূমিব্যবস্থার ত্রুটির সুযোগে, বর্ধিত খাজনার আকারে তা শেষ পর্যন্ত কৃষকের কাঁধেই গিয়ে চাপত।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর সাতের দশকে ভূমিজাত লভ্যাংশের উপর টাকা প্রতি চার পয়সা হারে কর (যার ¼ অংশ বহন করতে হবে রায়তকে এবং বাকীটুকু জমিদারকে) ধার্য করা হলে, অমৃতবাজার পত্রিকা সঙ্গত কারণেই, আশঙ্কা প্রকাশ করল যে এর ফলে জমিদারেরা রায়তদের কাছ থেকে কেবল তাদের দেয় অংশটুকু আদায় করে ক্ষান্ত হবেন না, এই সুযোগে তাঁরা নিজেদের দেয় অংশটুকু আদায় ত করবেনই, উপরন্তু আরও কয়েকগুণ বেশী অর্থ তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেবেন। কাজেই সেস করের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে কয়েকজন ইওরোপীয় সভ্য নিয়ে একটি "সেস কমিটি" গঠিত হয়েছে এই সংবাদ পরিবেশন করে ১৮৭০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকা এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে ঐ কমিটিতে দিগম্বর মিত্রের (যিনি ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও জমিদার সম্প্রদায়ের একজন মুখপাত্র-

রূপে সুপরিচিত) চেয়ে গভর্ণমেণ্ট বরং ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সভ্য মনোনীত করলে ভাল করতেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করার স্বপক্ষে তার বক্তব্য হল : "জনপ্রিয় এবং হিতসাধক" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সভ্য মনোনীত করা হলে এই কমিটিতে রায়তের স্বার্থের খুব ভালভাবে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সমকালীনদের কাছে একজন প্রকৃত জনদরদী, বিশেষত সেকালের নিপীড়িত অবহেলিত রায়তের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কে আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। একথা সুবিদিত যে তাঁর পরদুঃখ-কাতরতা এবং তাঁর পরদুঃখ-মোচনের অপরিসীম আগ্রহবশত আজীবন তাঁকে বিপুল পরিমাণ অর্থসংস্থানে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। অথচ যেকালে ভূসম্পত্তিই ছিল এদেশীয়দের কাছে, শুধু সহজসাধ্যই নয়, বস্তুতপক্ষে বলতে গেলে তাদের কাছে উন্মুক্ত অর্থোপার্জনের একমাত্র পথ, সেইকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু কখনই সেই পথ অবলম্বন করেন নি, যদিও অনেক সময়েই তাঁকে নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় ভুগতে হয়েছে। মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূসম্পত্তির দ্বারা অর্থোপার্জনের পথ সচেতনভাবেই পরিহার করেছিলেন। ইন্দ্র মিত্রের "করুণাসাগর বিদ্যাসাগর" (পৃঃ ২২) পাঠে জানা যায় কোন এক সময়ে বর্ধমানের মহারাজা বীরসিংহ গ্রামটিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তালুক করে দেবার প্রস্তাব করলে, তিনি এই অজুহাতে সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন যে যখন তাঁর এমন অবস্থা হবে যে তিনি সমস্ত প্রজার খাজনা দিতে পারবেন, তখন তিনি তালুক নেবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বক্তব্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপজাত ভূমিস্বত্বের ব্যাপক উপবিভাজন ব্যবস্থার (যার ফলে কোন কোন অঞ্চলে জমিদার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যবর্তী ভূমির উপস্বত্বভোগী স্তরের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশটি বা তারও অধিক) মাধ্যমে কৃষক শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর চেতনার উপস্থিতিটি লক্ষ্যণীয়। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে অত্যাচারিত ক্ষতিগ্রস্ত রায়তদের আইনের সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়েই তাঁর পরমবন্ধু দ্বারকানাথ মিত্রের দ্বারস্থ হয়েছেন ("এ বেঙ্গল জমিদার", পৃঃ ২৭৪—এন মুখার্জী)। শোষিত উৎপীড়িত রায়তের প্রতি

আন্তরিক সহানুভূতিবশত, তাদের স্বার্থরক্ষায় আইনগত সাহায্যদানে দ্বারকানাথ মিত্রের ভূমিকা কারও অজানা নয়।

ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের হাতে যাওয়ার পর থেকে ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারত শোষণের মাত্রা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল। সেই শোষণ দেশের মানুষের ব্যাপক অংশের জীবনে নিয়ে এল চরম দারিদ্র আর অপরিসীম নিঃস্বতা, সৃষ্টি করল নিদারুণ হতাশা। এদেশে ইংরেজ শাসনের ফলস্বরূপ ব্যাপক জনগণের জীবনে যে মর্মান্তিক বিপর্যয় নেমে এল, জনসমক্ষে তার চিত্রটি তুলে ধরতে, সেকালের বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে অগ্রসর অংশের সার্থক মুখপত্র সোমপ্রকাশ (১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ : "সঞ্চয়") লিখল সমাজের মধ্যে যাঁরা উচ্চ শ্রেণী বলে গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ উপার্জন করেন তারাও বিশেষ সঞ্চয় করে যেতে পারছেন না তার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের কথা বলা বাহুল্যমাত্র। তাঁরা ঋণদায়ে বিব্রত অন্নচিন্তায় জর্জর। (১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮১ : এই কি ভারতবাসীর হিতার্থ ভারত শাসন ?) শ্রমজীবী এবং সামান্য চাকুরে লোকদের ত কথাই নেই, হঠাৎ বিপদ হলে ঘর থেকে এক পয়সা বের করার সঙ্গতি নেই। এই প্রসঙ্গে সেকালের বুদ্ধিজীবীদের আর একখানি জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল সংবাদপত্র (২০শে জুন ১৮৭২) "অমৃতবাজার" লিখল "এবম্বিধ ব্যক্তিদের হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাহাদিগের পরিবার ও শিশু সন্তানেরা যারপরনাই কষ্টে পতিত হয়, সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান দূরে থাকুক, গ্রাসাচ্ছাদনই জুটিয়া উঠে না।"

দেশের মানুষের এই পরিস্থিতিতে তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যে সঞ্চয়ের সমস্যাটি স্বভাবতই দেশের নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। এই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সবচেয়ে অগ্রসর অংশটির মনে সমকালীন ইওরোপের "কমিউনিস্ট মতাবলম্বীদের" চিন্তাধারার কথা মনে হয়েছে। এঁদের মতাদর্শ সম্পর্কে "সোমপ্রকাশ" লিখেছে (১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ : সঞ্চয়) ইওরোপে কমিউনিস্ট নামক এক মতাবলম্বী কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে অর্থ সঞ্চয় অন্যায় মনে করেন। যিনি যাহা উপার্জন করিবেন সমুদায় সাধারণ ধনাগারে অর্পিত হইবে এবং সংসার নির্বাহ করিতে যে ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হইবে তিনি তাহা সাধারণ ধনাগার হইতে পাইবেন। উদ্বৃত্ত অর্থ সাধারণের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে।"

এই মতাদর্শ সম্পর্কে সোমপ্রকাশের বক্তব্য "এই মতটি উন্নত ও সভ্যতা সাপেক্ষ। নিঃস্বার্থভাবে কেবল সাধারণের জন্য উপার্জন করা, এই অবস্থায় আসিতে জগতের এখনও অনেকদিন লাগিবে।" তার মতে আপাততঃ দেশের পুনরুজ্জীবনের একমাত্র পথ কৃষিশিল্পে উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ। সে যে পথের নির্দেশ করেছে নিঃসন্দেহে সেটি ধনতন্ত্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ, ইওরোপে তখন চলছে যার বিকাশ। কিন্তু সেই সাথে ধনতান্ত্রিক পথের সার্থকতার প্রশ্নে তারমধ্যে ছিল একটা অস্ফুট দ্বিধা যা গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। সমকালীন ইওরোপের ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে ভয়াবহ দুর্দশা ইত্যাদি সম্পর্কে সোমপ্রকাশ বেশ সচেতন। চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয় সম্পর্কে সোমপ্রকাশের অভিমত "যতদিন পরিবারদিগের জন্য সংস্থান করিবার কোন প্রকৃষ্টতর উপায় না হইতেছে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করিবার যে সকল পদ্ধতি আছে তাহা অবলম্বন করিতেই হইবে।" কিন্তু তার বড়ই আক্ষেপ, ইংলণ্ডে শ্রমজীবী ও সামান্য লোকদের সঞ্চয়ের সুবিধার জন্যে যদিও জীবন বীমা ইত্যাদির মত নানাবিধ উপায় আছে, আমাদের দেশে সেরকম কোন উপায় এখনও অবলম্বিত হয় নি। (১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ : "সঞ্চয়") এই কথা অনুমান করা মনে হয় অসংগত হবে না যে এই রকম একটা চিন্তাভাবনার বশবর্তী হয়েই দরিদ্র স্বল্পবিত্ত মানুষের সঞ্চয়কার্যে সাহায্য করার উপযোগী দেশে সঞ্চয় প্রকল্পের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও কয়েকজনের সহায়তায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দু পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার কাজে তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হল দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত।

দেশে সামাজিক পুনরুজ্জীবনে কৃষক সম্প্রদায়ই হল সম্ভাবনাময় শক্তি এবং একারণ এদের অবস্থার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় পুনরুজ্জীবন কখনই সম্ভব নয়— এই চিন্তাধারার প্রবক্তা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মূলত পেশাজীবী অংশটির সাথে ইংরেজ শাসনের তল্পীবাহক ভূমিজীবী সামন্ততান্ত্রিক শোষক অংশটির মতাদর্শগত সংঘাতটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতপক্ষে ছয়ের দশকের সূচনাতেই সেই বিরোধ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যদের একাংশের মনে এসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে

গিয়ে পৃথক সংগঠন গড়ার চিন্তা রীতিমত দানা বেঁধে উঠেছিল এবং তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। কৃষক-দরদী উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে জমিদার-ভূস্বামী স্বার্থপ্রধান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিকল্প তাদের একটি নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা আবশ্যক—এই উপলব্ধির বাস্তবায়িত রূপ ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত "ভারতসভা"। রাজনীতিতে দেশের ব্যাপক অংশ কৃষকসমাজকে টেনে আনার উদ্দেশ্যে "রেন্টবিল" উপলক্ষে রায়তদের স্বপক্ষে গড়ে তোলা ভারতসভার আন্দোলন সুবিদিত। কিন্তু দেশে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজনীয়তা, "ভারতসভা" গঠনের প্রচেষ্টার বহু আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর পরমবন্ধু, রায়তের স্বার্থের একজন আন্তরিক সমর্থক দ্বারকানাথ মিত্রের সহযোগিতায় "বেঙ্গল এসোসিয়েশন" নামে একটি সভা গঠনে উদ্যোগীও হয়েছিলেন ("এ নেশন ইন মেকিং, পৃঃ ৪১ : এস এন ব্যানার্জী)। পাবনার কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭২-৭৩) পরিপ্রেক্ষিতে লেখা ১৮৭৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের "সাধারণী" পত্রিকায় প্রকাশিত "বঙ্গদেশের প্রজার জন্যে কি কর্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকেও এই কথাটিই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে সমকালীনদের চোখেও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদেরই একজন হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন, যাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সম্পর্কে সচেতন, কৃষকের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যে জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার পক্ষপাতি, যাতে থাকবে না জমিদারদের কোন প্রবেশাধিকার। বস্তুত এইরকম উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি সংগঠন গড়ে ওঠা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। "ভারতসভা" গঠনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে তার প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ জানাতে আনন্দমোহন বসুর সাথে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হন। বয়সের দরুণ সে অনুরোধ রক্ষায় অক্ষমতা জানালেও, গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে, বিদ্যাসাগর বলেছিলেন "এতদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।" "ভারতসভার" উদ্যোক্তাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সেই সভার প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধটি নিশ্চয়ই এইপ্রসঙ্গে তাৎপর্যমণ্ডিত।

এখানে একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে দেশের তৎকালীন

আর্থিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিতে জনস্বার্থ রক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিভিন্ন কর্মোদ্যোগে (যার দুই একটির পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে) যাঁরা ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট সহযোগী (দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত), দুর্গত অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল সুবিদিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "পরম বন্ধু" গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিংবা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ছিলেন বাংলা সাংবাদিকতা জগতের এক একজন বিশিষ্ট দিকপাল—যাঁরা নীলকর জমিদারদের ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রায়তের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়তার সাথে সুসংবদ্ধভাবে লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন।

সর্বোপরি, দেশে কৃষকের সমস্যাই যে সবচেয়ে বড় জাতীয় সমস্যা এবং এটির সমাধান ব্যতীত জাতীয় পুনরুজ্জীবন যে কোনমতেই সম্ভব নয়, এই মতাদর্শের বলিষ্ঠ প্রবক্তা উনিশ শতকের দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সোমপ্রকাশ ছিল নেতৃস্থানীয়। পরাধীন দেশের জনগোষ্ঠীকে রীতিমত রাজনৈতিক শিক্ষা-দানের সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন একথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। শুধু রূপ পরিকল্পনাই নয়, এটির সূচনা থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় "সোমপ্রকাশের" সাথে সক্রিয় আগ্রহ নিয়েই যে যুক্ত ছিলেন, সে কথাও সন্দেহাতীত। পত্রিকার প্রথম কয়েকটি সংখ্যা নিজেই লেখা ছাড়াও, পরবর্তী-কালে পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর স্বনির্বাচিত সম্পাদক তাঁর "পরম বন্ধু" দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সময়ে সময়ে পরামর্শ দানে সহায়তা করার বিষয়টিও জানা যায় একজন সমকালীন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যেই (প্রথম প্রকাশ ১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮)। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, "হিন্দু পেট্রিয়টের" কৃষকদরদী প্রগতিশীল সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ঐ পত্রিকার পরিচালনভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একক হস্ত বনাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কয়েকজন সভোর যৌথ হস্তে রাখার প্রশ্নে যে দলাদলি সৃষ্টি হয়, রামগোপাল সান্যাল রচিত কৃষ্ণদাস পালের জীবনী পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না, তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই সময়কার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জমিদার ঘেঁষা অংশটির সাথে কৃষকদরদী উদীয়মান পেশাজীবী অংশটির ক্রমবর্ধমান মতাদর্শগত বিরোধটিই প্রতিফলিত হয়েছিল। কারণ হরিশ মুখার্জীর আমলের হিন্দু পেট্রিয়টের কৃষকস্বার্থ সমর্থক প্রগতিশীল ঐতিহ্য

অব্যাহত রেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্রিকাটিকে যে সোমপ্রকাশের অনুপূরক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কৃষকদরদী অংশটির ইংরেজী মুখপত্র রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "মানবিকতার পরিধি নির্ধারণ" করতে গিয়ে পরোক্ষে নিজেকে একজন "খাঁটি" মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিয়ে সম্প্রতিকালে একজন লেখক তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "নিজের কথা, লেখা ও কর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর কৃষকসমাজের সুখদুঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃঃ ৮৪—বদরুদ্দীন উমর)। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত আদৌ মেনে নেওয়া যায় না। লেখক তথাগতভাবে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে লিখেছেন "কাজেই বৃহত্তর কৃষকসমাজের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে উদাসীন না থাকতেন, তা' হলে পত্র-পত্রিকা হাতে থাকা সত্ত্বেও লেখনী তাঁর এ ব্যাপারে নীরব থাকত না (পৃঃ ৯১)। "সরাসরি কোন সময়ই নিজের স্বাক্ষরে এবিষয়ে কিছু লেখেন নি" (পৃঃ ৮৯)। ইত্যাদি। লেখকের এই মন্তব্যের উত্তরে, এখানে ইতিহাসে একালের একজন বিশিষ্ট গবেষক, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের একটি মন্তব্য উধৃত করাই যথেষ্ট, মনে হয়। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত উদ্যোক্তা হিসাবে রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে বিতর্ক প্রসঙ্গে ডঃ সিংহ মন্তব্য করেছেন : "Many things happen which leave no record. But well disciplined imagination which follows the facts helps us to come to certain conclusions with some amount of certainty." (Bengal Past and Present : July-December 1972, P. 189)।

আসল কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের যে অংশটির সাথে একাত্ম, তাঁরা ছিলেন এদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনার প্রথম দূত। সেই চেতনার আলোকেই তাঁরা দেখেছিলেন দেশের তৎকালীন কৃষকসমস্যাটিকে এবং সেইভাবে দেখতে গিয়ে তাঁরা ইংরেজের সাথে ভারতবাসীর এবং ইংরেজ শাসনের সাথে দেশের জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ কৃষকসমাজের বিরোধটিকে তুলে ধরেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তা যথেষ্ট দুর্বল। তাঁদের অনেক দ্বৈততা ছিল, কিন্তু এই "দ্বৈততা" বুর্জোয়াদেরই

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশের তৎকালীন মধ্যবিত্তদের মধ্যে সেটা যে আরও বেশী করেই থাকবে—এটাই ত স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে এই বুদ্ধিজীবীরা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিবর্তে বেছে নিয়েছিলেন বুর্জোয়া লিবারেল চিন্তাধারা, অনুসরণ করেছিলেন নিয়মতন্ত্রের পথ। নিয়মতন্ত্রের পথে চলতে গিয়ে তাঁরা দেশের ব্যাপক জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন সেটাই তাঁদের মস্ত কৃতিত্ব। সেই রাজনৈতিক সচেতনতায় ছিল ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনার আভাস। দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে এই চেতনায় সঞ্জীবিত করে তোলার মধ্যেই ছিল তাঁদের প্রগতিশীলতা।

নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ

সুশীল জানা

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সম্পর্কে আজ আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের নানা অংশে—এমনকি বিদেশীদের মধ্যেও নানা রকম প্রশ্ন উঠতে দেখা যাচ্ছে। ওই নবজাগরণের প্রাণপুরুষ যাঁরা তাঁদের কাজকর্ম চিন্তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন একপক্ষ দাবী করেছেন—এ দেশে নবজীবনবোধ উন্মেষের উৎস তাঁরাই, এমনকি এদেশের সবরকম প্রগতিশীল সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক চেতনার প্রাথমিক প্রেরণা, পরিবেশ জাতি ও কালগত নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এসেছে তাঁদের কাছ থেকেই—কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো গোষ্ঠীগতভাবে—কখনো সম্মিলিতভাবে। তেমনি অন্যপক্ষ উপরোক্ত নবজাগরণকে শুধু অলীক বলেই প্রতিপন্ন করতে চাইছেন না—তার প্রাণপুরুষদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে ক্ষুরধার সমালোচনায় কাটছাঁট করে খর্ব করে এনেছেন। দুই পক্ষই দাবী করেন বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। কিন্তু সত্য কে? সত্য 'ইতিহাস'—ইতি হ আস: এ সব ঘটেছিল। সেই সব ঘটনা ও রচনার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যকে আমাদের বেছে নিতে হবে—চিনে নিতে হবে। গোটা ইংরেজ শাসন কালটা জুড়ে আমাদের দেশে ইতিহাসের চাকা চলেছে নানা বাঁকাচোরা পথে, নানা বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে—এই পরিপ্রেক্ষিতে কতটা পথ আমরা কতটা সময়ে অতিক্রম করেছি—তেমন নীট হিসাব ইওরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারবো না ঠিক কিন্তু আমাদের কিছুমাত্র অগ্রগতি ঘটে নি, এ কথা একমাত্র নির্বোধ ও মতলববাজ ছাড়া আর কেউ বলবে না।

যাকে আমরা 'নবজাগরণ' বলি তাকে সাধারণত চিহ্নিত করা হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কিন্তু এর উপকরণ সমাহার, প্রস্তুতিপর্ব—এসব ধরলে দেখা যায় সারা শতাব্দী কাল জুড়ে চলেছে এর কর্মধারা। শতাব্দীর শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব—জন্ম সাল ১৮৬১, যখন নবজাগরণের ইতিহাস তার প্রাথমিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের একটা স্তর অতিক্রম করে এসেছে। মধ্যযুগীয়

নানা অন্ধ সংস্কারের অন্ধকার ও অজ্ঞতা সমাজের সর্বস্তরে তখনও পরিব্যাপ্ত—কেবলমাত্র সীমিত এক চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণীর স্তরে আলোকের যা কিছু বিচ্ছুরণ ঘটছে, নতুন জীবন-বোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে। সে-বোধ ও বিকাশের ধীর গতিটাও লক্ষণীয়। উপরন্তু পরাধীনতার প্রতিবন্ধকতা, দুর্মর মধ্যযুগীয় ভৌমস্বার্থ ও বর্ণাশ্রম স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা তাকে আরও ধীর করে দিয়েছে। তবু এরই মধ্যে দিয়ে গতি তার প্রসারিত হয়েছে নানা পথে—শিক্ষায়, সমাজ-বোধে, স্বাদেশিকতায় এবং আন্তর্জাতিকতা বোধে। এই গোটা কালটার নানা তরঙ্গ ভঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক শতাব্দীতে জন্ম তাঁর, জীবনাবসান পরবর্তী শতাব্দীতে। এক শতাব্দীর দ্বন্দ্ব ও উন্মেষের মধ্যে তাঁর জীবন-চেতনা, শিল্পী-চেতনার জন্ম ও পরিপোষণ—জীবন শেষ আর এক শতাব্দীতে যখন তাঁর পরিপোষিত সভ্যতার সংকট সমুপস্থিত। এদিক থেকে তাঁকে 'নবজাগরণের' শেষ মহান পতাকাবাহী বলা যায়—যে পতাকা তিনি বহন করে এনেছেন আমাদের বিংশ শতাব্দীতে, যেখানে রেখে গেছেন তাঁর শেষ সাক্ষর, শুধু বাংলা দেশ নয়—সারা ভারতবর্ষের তরফ থেকে। তাঁর সুবিশাল বিচিত্র রচনাবলী এটারই সাক্ষ্য দেয়। কি সে স্বাক্ষর? সে কথা পরে আলোচ্য। আপাতত আমাদের কৌতূহল, যিনি জন্মেছেন সেই দুই কালের মাঝখানে—আলো আর অন্ধকারের দ্বন্দ্ব-মুখর মুহূর্তে, সেখানে তাঁর হলফ-নামা কি?

এ কথা ঠিক, বাংলার 'নবজাগরণ' সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্রভাবে কোনো প্রবন্ধ রচনা করেন নি। কারণ বোধ করি এই যে, স্বয়ং যিনি নবজাগরণের একজন মহৎ অংশীদার, তাঁর কাছে 'নবজাগরণ' ছিল স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এ দেশের মধ্যযুগীয় পটভূমিতে সেদিন তাঁর যা নবীন জীবন-বোধের মানবীয় স্বাদ বলে মনে হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর কোনও প্রশ্ন ছিল না। ছিল সংশয়হীন স্বীকৃতি। এসব স্বীকৃতি ছড়িয়ে আছে তাঁর নানা রচনায়। আমরা মোটা-মুটি তার একটা স্বরূপ এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> 'পূর্বে কি ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি;—কোথা

হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র।···

'আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নব-সমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।···'

'বঙ্গদর্শনের' প্রথম আবির্ভাব ১৮৭২ সাল। এ মন্তব্য সে-কাল প্রসঙ্গেই। একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পর্কে উদ্ধৃত মন্তব্যে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু সাহিত্যকে আমরা দেশ ও জাতির জীবন-বীণা—ভাব ও চিন্তার নিখাদ ঝংকার-ক্বলে মনে করি, তা প্রগতিশীল হোক অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হোক। কাল চলে যায়, ব্যক্তির চিহ্ন মুছে যায়—কিন্তু তার যা কিছু চিন্তা ও কর্ম, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির চিহ্ন পড়ে থাকে সাহিত্যের মধ্যে। তাই 'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই।

সংক্ষেপে বলতে গেলে—কর্মে জ্ঞানে ও চিন্তায় বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'। দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনার দ্বারা শিক্ষিত বাঙালীর মনে যাতে আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয় সেই জন্য ছিল এই অধ্যবসায়। সেই সঙ্গে ছিল সমাজবোধ জাগাবারও প্রচেষ্টা। ছিল দেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাবের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণের সচেতন প্রয়াস।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে উদ্ধৃত 'সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি'র ছবিটা কি? বলা বাহুল্য—তা মান্ধাতার আমলের সেই ধর্মসংস্কার—যার সঙ্গে জড়ানো নানা লৌকিক অলৌকিক কথা-উপকথার বিশ্বাস, কুসংস্কার, তন্ত্র-মন্ত্র-পুরোহিতের প্রতাপ, রহস্যময় বিধিলিপি-নির্ভরতা ইত্যাদি। সমাজের বুকে—মানুষের সমস্ত চিন্তা-শক্তির উপরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল বহু প্রাচীন একটা সমাজ-ব্যবস্থার ধারা। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়—

'The crass rites, ceremonies, beliefs that were being added to Brahmins since rhe Gupta period, made it a jumble of rites and customs existing only for priestly exploitation ..

Indo-Aryan customs at the time of marriage and law,

> Pauranic fasts and festivals ,...totemistic notions of purity and taboo in the matter of touch and smell, non-Aryan customs, Buddhist-Tantrika rites and nacromancies, Sahajyanist laxity of moral, non-vedic Phallic worship, worship of Moslem Satyapir,...belief in astrology, auguries and divinations, belief in witch-craft and sorcery were the compound known as Hinduism.*

ঋগ্বেদের মাত্র ৩৩টি দেবতা তখন ৩৩ কোটি দেবতায় সম্প্রসারিত ও প্রচারিত —অর্থাৎ পৌত্তলিকতার বিপুল প্রসার। ব্রাহ্মণসমাজ তখন ত্রাত্য অনার্য কোনো দেবতাকেই আর বাইরে রাখে নি—দু-চার ছত্র সংস্কৃত-মন্ত্র রচনা করে বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। নেতৃত্ব তার একচ্ছত্র।

বাংলার জনসমাজ তখন প্রধান দুই ধর্ম ধারায় চালিত—এক ব্রাহ্মণ, অন্যটি বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণরা অধিকাংশই শাক্ত। অন্যদিকে বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে। গোস্বামীরা—যারা গৃহস্থের গুরুস্থানীয়। এই দুই প্রবল ধর্ম-ধারার নির্দেশে চলেছে বাংলার সমগ্র জনসমাজ। তার নানা আচার নানা অনুষ্ঠান—জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। দু-একটা নমুনা দিলেই রবীন্দ্রনাথের উল্লেখিত 'অন্ধকার, একাকার ও সুপ্তির' স্বরূপটা কিছু বোঝা যাবে। বোঝা যাবে—ধর্মাদর্শের ধারাটা তখন লোকজীবনে কোন ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

Francois Bernier তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে আমাদের দেশের রথযাত্রার উৎসবে কেমন করে, কি উদ্দেশ্যে ধর্মোন্মাদ মানুষ রথের চাকায় নিজেকে উৎসর্গ করে তার এক ছবি দিয়ে গিয়েছেন। বার্নিয়ের লিখছেন—

> '...যখন সেই জগন্নাথের রথ ঘর্ঘর করে চলতে থাকে তখন সমবেত দর্শক-যাত্রীদের মধ্যে এমন এক বিকট বন্য উদ্দামতার সঞ্চার হয় যে তার তাড়নায় অনেকে সেই চলন্ত রথের চাকার তলায় পথের উপর শুয়ে পড়ে এবং নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।...এর চেয়ে মহত্তর আত্মত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শন আর কিছু নেই,...এইভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে পারলে তারা তৎক্ষণাৎ

* Nineteenth Century and Renaissance

স্বর্গে চলে যাবে এবং সেখানে দেবতা তাদের পুত্রবৎ স্নেহ করবেন ও পালন করবেন। [বিনয় ঘোষ অনূদিত]

সহমরণ ॥ ১৫ নভেম্বর, ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০। সমাচার দর্পণ। 'মোং কোন্‌নগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্বশুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদ্দশাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্তমান ছিল।···২১ কার্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোকপ্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাসবাড়িয়ার এক স্ত্রী ও নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারিজন সহমরণোদ্যতা হইল।···২৩ কার্তিক···তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্ন কালে···ঐ চারিজন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে।'

শোকার্ত সদ্যবিধবার আকস্মিক শূন্যতাবোধ, বা হৃদয়ের প্রবল আর্তি এবং তার থেকে সহমরণ কামনা স্বাভাবিক। কিন্তু সহমরণের সব ঘটনা শুধু মাত্র তা থেকেই ঘটে নি। পুরুষ স্মার্তপ্রবরেরা বহু যুগ ধরে নারীর মনে এ সম্পর্কে একটা মিথ্যা ছলনার কল্পলোক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৬ আগস্ট, ১৮২৩ সালের সমাচার দর্পণের অন্য এক সংবাদে বলা হয়েছে—শান্তিপুরের 'অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা' এক পরামাসুন্দরী সহমরণে উদ্যত হলে স্থানীয় থানাদার অনেক লোকজন নিয়ে হাজির হয় এবং বাধা দেয়। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে—

···"কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা-পরিবারের বিদ্রূপের ভয়ে এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সহমরণ করিতে আমার উপরে কেহ জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রজাল পর্যন্ত পতিলোকে বাস করিব।'···

বহু পূর্বে বার্নিয়েরও এরকম ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন। সহমরণ-যাত্রীর মুখে বুনেছেন এই অলীক দার্শনিকতা ও রহস্যময় জন্মান্তর-সম্পর্কের কথা। এই সব মেয়েদের সম্পর্কে মন্তব্য করে গেছেন—মৃত স্বামীর ভস্মাবশেষের সঙ্গে নিজের দেহ মিশিয়ে দেওয়ার চেয়ে জীবনের মহত্তর কর্তব্য আর কি

হতে পারে না। এইটাই হলো সনাতন প্রথা।...আমার ধারণা, পুরুষরাই হল এই সব প্রথা ও সংস্কারের স্রষ্টা।' [বিনয় ঘোষ অনূদিত]

সাহেবের ধারণা অমূলক ছিল না। হিন্দুভারতে ঋগ্বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী বলে স্বীকৃত—তা অপরিহার্য এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থে তথা-কথিত স্মার্ত বিধান-দাতার (রঘুনন্দন) সমাজ তাকে বিকৃত করতেও দ্বিধা করে নি। চিতার সম্মুখে সদ্য বিধবার প্রতি ঋগ্বেদ উচ্চারণ করেছে—

> 'ওঠ নারী, সংসার-জীবনে ফিরে এস। যার সঙ্গে একত্রে তুমি শয়ন করেছ সে আর নেই। এস আমাদের মাঝখানে। যে তোমার পানিগ্রহণ করেছিল সে তোমাকে মাতৃত্ব দিয়েছে—স্বামীর প্রতি তুমি তোমার সব কর্তব্য সম্পাদন করেছ।' (ঋগ্বেদ ১০ম/ ১৮/৮)

এর ঠিক পূর্ববর্তী মন্ত্রে শবানুগমনকারী অন্যান্য মেয়েদের প্রতি আহ্বান ছিল—যারা অঞ্জন ও ঘৃত অর্পণ করবে চিতায় তাদের আহ্বান করে বলা হয়েছে—'এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া, উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া "অগ্রে" গৃহে আগমন করুক।' (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)* এই 'অগ্রে' শব্দটিকে কৌশলে 'অগ্নে' শব্দে বিকৃত করে লক্ষ লক্ষ মেয়েকে এদেশে পোড়ানো হয়েছে। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ম্যাক্সমুলারের রচনা থেকে জানা যায়—মূল পাঠের এই বিকৃতি প্রথম ধরা পড়ে অধ্যাপক উইলসনের চোখে।

বাংলাদেশে এই সতীদাহের আরও একটা কারণ ছিল—যা বিশুদ্ধ বৈষয়িক। ১৮১৫-১৮২৮ সালের মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই সতী হয়েছিল ৭,২৪১। অন্যদিকে খাস বারানসী-কেন্দ্রিক সনাতন বিধানের উত্তর ভারতে মাত্র ২০৩টি। এর কারণ দুই সমাজবিধির প্রথা—মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। মিতাক্ষরা মতে সংসারে জ্যেষ্ঠই সম্পত্তির অধিকারী, সেখানে বিধবার কোন অধিকার দেওয়া হয় নি। এ নিয়ম উত্তর ভারতে প্রচলিত। বাংলাদেশে প্রচলিত 'দায়ভাগ'—যেখানে সন্তানহীনা বিধবারও সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব দেওয়া হয়েছে। অতএব তাকে 'সতীধর্মে' উদ্দীপিত করতে পারলে সম্পত্তির অন্য অংশীদারদের লাভ ছিল। সম্পত্তির বখরা কমলে বাড়তি লাভ।

---

* আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং (গৃহে) অগ্রে।

এই মর্মান্তিক প্রথা রহিত করার জন্য রামমোহন দ্বারকানাথ প্রমুখ বেন্টিঙ্কের কাছে যে আবেদন করেন তাতে আরও একই বাস্তব ও জৈব কারণ দেখানো হয়েছে '—হিন্দু প্রধানেরা আপন ২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া···অবলা জাতির রক্ষণাবেক্ষণ যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান···' ইত্যাদি। এসব কারণও বিদ্যমান ছিল—এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের মর্যাদাহানিকর দুর্ঘটনার অপ্রতুলতাও তখন ছিল না। বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজে দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন রহস্যের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কৌলীন্য-মর্যাদার অহংকারে ভরা দেশ, বহু বিবাহ যেখানে ধর্মের সম্মান পায়, স্ত্রীশিক্ষা যেখানে একেবারে শূন্য—কেবল মা ঠাকুরমার মুখ থেকে শোনা সতীধর্মের ব্যাখ্যান মাত্র সম্বল। তার ভেতরের চেহারাটা যে কি, আমাদের এ শতাব্দীতেও শরৎচন্দ্র তাঁর 'বামুনের মেয়ে'-তে উদ্ঘাটিত করে গেছেন নির্মমভাবে।

আমরা জানি, সেদিনের সেই দেশ ও সমাজ—এবং তার আচার-বিচার-বিশ্বাস আজ উপকথার মতই শোনাবে। নরবলি১, অন্তর্জলি কাপালিক ও জঘন্য শাক্ত বামাচার২, মখ্৩, সাগরে সন্তান বিসর্জন৪, সতীদাহ৫ ইত্যাদির সংবাদে এ প্রবন্ধ ভরে তোলার স্থানও আমাদের কম। তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য-চর্যার এই সব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চলেছে বাংলার বৈষ্ণব ধারা। আগেই বলেছি—বাঙালীর জীবন-চর্যায় এ দুটি ধারাই প্রবল এবং প্রধান। এককালে চৈতন্য, প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধারাই ছিল প্রবলতম—কিন্তু আমাদের আলোচ্যকালে সে ধর্মের আদর্শগত উচ্চমান অতীতের স্মৃতিমাত্র। গুরু গোঁসাই—যাঁরা সমাজের নেতা, তাঁরা গোঁড়া ব্রাহ্মণদেরই আচার পদ্ধতি অনুকরণ করতেন। 'আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল' তখন পুথির কথা মাত্র—জীবনের কথা নয়। গোস্বামীরা একদিকে যেমন ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য-কৌশল প্রচলন করলেন—অন্যদিকে খোলা রইল সহজাচার, 'ভেক', 'কণ্ঠিবদল', সহস্র ভ্রষ্টাচার।

এ সম্পর্কে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর Social Heredity of 19th Century প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন :

'...various Vaishnava sects fell under the influence of

১ ও ২ কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র
৩ সম্পত্তি-সমর্পণ—গল্পগুচ্ছ : রবীন্দ্রনাথ
৪ দেবতার গ্রাস—রবীন্দ্রনাথ
৫ মহামায়া—গল্পগুচ্ছ : রবীন্দ্রনাথ

old Sahajyana cult and extreme form of Bamachara. They have unspeakable practices. In the name of love of Radha for Krishna , sex-laxity became prevalent. Again, the Goswami Gurus put into practice the custom of Guru gnai or Guru-prasad... i. e. the custom of sending the newly married wife after attaining her puberty, to spend her first night with the Goswami who is the Guru of the family. This practice has been prevalent all over the country among the Vaishnavas irrespective of caste and rank ... To the Vallavacharya sect it is a part of their "Pustimarga" doctrine.'

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে সুরু হয় "বল্লভাচার্য মানহানি মামলা"। দেশের দৃষ্টি আকর্ষিত হল এই কুৎসিত প্রথার দিকে। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম-অধ্যুষিত সমাজে এ প্রথা নিষিদ্ধ ছিল না—বরং সুপ্রচলিতই ছিল।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ছাড়াও আরও একটা ধর্ম-প্ররোচনার চাপ ছিল—আগন্তুক ক্রিশ্চান মিশনারীদের। বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শক্ত ভিত্তিতে।

এর মধ্যে বাঙালী সমাজে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সমবেত রাষ্ট্র চিন্তা বা রাজনৈতিক চিন্তা বা সামন্ততান্ত্রিক ধরনের কোন একটা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের আভাসও পাওয়া যায় না। সিরাজের পতনের কালে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদিবা তাদের কিছু উচ্চাশা ও স্বপ্ন ছিল তা ইংরেজ কোম্পানীর দুর্ধর্ষ তাড়না ও ছলাকলায় একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ১১৭৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পুরাতন ভূম্যধিকারীর সব চিহ্ন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। বাঙালী হিন্দুর যে উচ্চতর মহল পাঠান মুঘলের আমল থেকে সুলতান ও সম্রাট সেবায় দীর্ঘকাল অভ্যস্ত—প্রভু বদলে তারা ফার্সি ছেড়ে বরং দ্রুত ইংরেজি ভাষা আয়ত্তের দিকে ঝুঁকে পড়ল; রাজশক্তি আয়ত্তের বিন্দুমাত্র চিন্তা সেখানে ছিল না। অন্যদিকে বিপর্যস্ত, রাজ্যহারা বাংলার মুসলমান

মসনদ্-ই-আলারা দীর্ঘকাল নীরবতার অন্তরালে বোধ করি অমর্যাদায় অভিমানে স্তব্ধ হয়ে রইল। হিন্দু মুসলমানের বাংলার তখন এই হাল।

সামাজিক এই অবক্ষয়, ভাবের এই শূন্যতা, অপরিচিত এই মুমূর্ষু জীবন প্রবাহের মধ্যে শুধু সাহিত্যের 'অন্ধকার, একাকার ও সুপ্তি' নয়—সকল সাহিত্যের যে মূল মানব-জীবন—সেও অন্ধকারে, একেবারে, সুপ্তিতে তখন মরণাপন্ন। সেদিনের ভয়াবহ আশাশূন্য সেই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন—ধর্মাশ্রয়ী দেশ ও সমাজের ধর্মের সত্যানুসন্ধানী এক পুরুষ :

> 'রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।···
>
> 'অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায় যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়। রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল।···সেই নিশীথে "মাভৈঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়তো ঠিক অনুভব করিতে পারিব না।···
>
> 'কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দু সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।' (রামমোহন রায়)

কেন মাঝখানে দাঁড়ালেন, কেন এই বাধা? একালের কিছু সমালোচক যাঁরা তাঁকে ইংরেজ কোম্পানীর 'দালাল মাত্র' হিসাবে চিহ্নিত করতে উন্মুখ তাঁদের মতানুসারে তাঁকে সে-সময় শুধু কোম্পানীর নয়, খৃস্টানীরও দালালী করতে দেখতাম।—কিন্তু তাঁর এই রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের মধ্যে শুধু বাঙালীত্ব নয়, ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর বলিষ্ঠ মালিন্যমুক্ত ঐতিহ্য, তাঁর স্বদেশীয়ানা লক্ষ্য করেছেন এই প্রবন্ধের অন্যত্র বলছেন—

'শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গ সাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল···তিনি কোন কাজে না হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।'

চরিত্রের দৃঢ়তায় এবং দেশের সামগ্রিক বলিষ্ঠ এক ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে আর একটি ব্যক্তির প্রতি প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে গেছেন—তিনি বিদ্যাসাগর।

'বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল।'

কী সে অনন্যতন্ত্রতা? রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরকে একই বন্ধনীতে রেখে তিনি বলছেন—

'একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই।···বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন। স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন।' (বিদ্যাসাগর চরিত)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে আমাদের 'নবজাগরণের' বিশেষ কয়েকটি লক্ষণের কথা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম—মাতৃভাষার চর্চা। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে তার উল্লেখ তিনি যথাস্থানে করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে—তখনো সে ভাষা যথার্থ সাহিত্যের যোগ্য হয়ে ওঠে নি। তা হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। সে সম্পর্কে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় বলছেন—

'তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজ পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন।

'·····যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্যপ্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ

চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন।'··· (বঙ্কিমচন্দ্র)

দ্বিতীয় লক্ষণ—স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞান ও তার আলোচনা। সেদিনের ধর্মানিষ্ট সমাজে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের স্থান দুর্ভেদ্য) এক অন্ধ সংস্কার ও অশেষ শ্রদ্ধার মধ্যে বিরাজ করছে—তার উপরে জমেছে শতাব্দী পুঞ্জিত রঘুনন্দনি পুরোহিত-তন্ত্রের বিধান, প্রথা ইত্যাদি। সে জঞ্জাল সরিয়ে প্রধানত মালিন্য-মুক্ত একটি ধর্মকে, প্রধানত ইন্দো-আর্যের বৈদিক ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ছিল। এদেশের ধর্মকে বিকৃত করার খৃশ্চানী অপচেষ্টাও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'···একদিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যগত শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদের সঙ্কোচ ; ···যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয় সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। (বঙ্কিমচন্দ্র)

পুরোহিত নির্দেশিত স্মার্তশাস্ত্র নয়—যুক্তি, বুদ্ধি ও ইতিহাস গ্রাহ্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা সেদিন হিন্দু নব জাগরণের একটা বিশেষ লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। অস্বীকার করা যাবে না। তবু, এরই ভেতর দিয়ে প্রাচীন রচনাগুলির সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ; খাড়া করা পুরোহিত তন্ত্রের মিথ্যার দুর্গ ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, ধূলিসাৎ হয়েছে অলীক অবতারবাদ। এ সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যেটা বড় হয়ে উঠেছে—সেটা কোনও বিধি-বিধানের দাবী নয়, মানুষের দাবী। এ সম্পর্কে স্মরণীয় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার-বিতর্ক—রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে স্মরণ করেছেন প্রথম যুগের অগ্রপথিক রামমোহনের নাম —যাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবন সেদিনের বাঙালী হিন্দুসমাজের একাংশে প্রজ্ঞাতীত ছিল না—আজও নয়। এক রকম ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বলেছেন—

···"রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা—আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন-কি, আজ

> প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব শিক্ষাভিমানে পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ-পুরাণ-তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়া ছিলেন।···বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।' (বঙ্কিমচন্দ্র)

রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যের তারিখ ১৮৯৪ সাল। তারপরেও বর্তমান কাল পর্যন্ত নবশিক্ষার অভিমান আমাদের বেড়েছে বই কমে নি। 'কৃতজ্ঞতা' কথাটার জোর আজ আরও কমার দিকে। তবু, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব, বিচার ও কর্ম-ধারার গুরুত্ব ও লক্ষ্য যথাযথ উপলব্ধি করতে হলে নবজাগরণ পূর্ব বাঙলার ধর্ম-পীড়িত সমাজের ভয়াবহ চেহারাটা মনে রাখা দরকার—যার সামান্য চিত্র-উদ্ঘাটন এ প্রবন্ধের পূর্বেই সামান্য কিছু উদ্ধৃতির মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

আমাদের সমগ্র 'নবজাগরণের' প্রেরণার যে মূল উৎস—ইওরোপীয় নব-সংস্কৃতি তথা বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে। এ বিষয়ে এটি তাঁর সম্পূর্ণ ও শেষতম প্রবন্ধ—রচনাকাল ১৯৩৩ (বাং ১৩৪০)। আমাদের এ কালের যথেচ্ছ ব্যবহৃত 'বুর্জোয়া' 'পেটি-বুর্জোয়া' কি 'কম্প্রাডোর বুর্জোয়া' ইত্যাদি শব্দগুলো রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি—বলা বাহুল্য, আমাদের একালের ইস্কুলের তিনি পড়ুয়া নন। তবু তাঁর উল্লেখিত এ রচনা থেকে সবকটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

আমরা জানি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু পাঠক তিনি—তার পরিচয় তাঁর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটকে নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। এখানেও তার পরিচয় সুস্পষ্ট। সংক্ষেপে তিনি এ প্রবন্ধের গোড়ায় হিন্দু ও মুসলমান যুগ এবং তার সামন্তযুগীয় সংকীর্ণতা ও নিষ্প্রাণ বৈচিত্র্যহীনতা উল্লেখ করে বাংলায় ইংরেজ আগমনের পরবর্তী অধ্যায়টিকে ভাব-আন্দোলনের দিক থেকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। বলছেন—

> 'তারপরে এল ইংরেজ কেবল মানুষ রূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্ত প্রতীক রূপে।···'

অন্যত্র বলছেন—

> 'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত

> য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্য-স্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়। না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে চিত্ত জেগে আছে।'

এই 'বাঁচা চিত্ত', 'জাগা চিত্ত'—কথা দুটো লক্ষ্যণীয়। সামন্তযুগীয় ব্যাপক অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের চিত্ত কী তবে কোথাও বেঁচেছিল, কোথাও জেগেছিল? নতুনকে গ্রহণ করবার মতো মনের শক্তি কি কোথাও অবশিষ্ট ছিল? ছিল যে—তার প্রমাণ রামমোহন, প্রমাণ 'নবজাগরণের' অন্য অন্য প্রাণপুরুষেরা। তাঁরা কোনও এক গোষ্ঠীভুক্ত নন—বরং বিচ্ছিন্ন। এবং সমবেতভাবে একটা যুগের নূতন মানসলোক সৃষ্টিতে সহায়তা করে গেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা জ্যোতির্ময় প্রশান্ত উপলব্ধি ছিল রবীন্দ্রনাথের—তার উপরে এসে আচার ও প্রথাজাত, উদ্দেশ্যমূলক পুরোহিত-তন্ত্রজাত নানা অবর্জনা এসে জমতে পারে, অবসন্ন করে দিতে পারে—কিন্তু সে অমৃত। জ্ঞান রাজ্যে অমৃতের সঙ্গে নবাগত সভ্যতার মিলন-রূপ দেখেছেন তিনি—

> "যদিও আমাদের চারদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ।'

অন্যত্র বলছেন—

> 'যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস গ্রহণ করেছিলাম তা নয়, আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধ প্রয়াস।'...
>
> 'রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুসন যুগে য়ুরোপ যে মত-স্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ন হয় নি।... ম্যাটসিনি-গারিবল্ডির বাণীতে কীর্তিতে

সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্ত্রিত হয়েছিল গ্লাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি।···কোন যুগ থেকে সহসা কোন যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন শিক্ষায়।'

বক্তব্য আমার সীমাবদ্ধ 'নব জাগরণ' বিষয়ে—ভারতে ইংরাজ শাসনের অন্য পরিণাম নিয়ে নয়। তবু, সেকালের সেই বুর্জোয়া চরিত্রের ভয়াবহ পরিণামকেও তিনি এ প্রবন্ধে উল্লেখ করতে বিস্মৃত হন নি। বলছেন—

'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য।···

চীন, পারস্য, কঙ্গো, যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো নিগ্রহের বীভৎস ঘটনাগুলো তাঁর চিন্তার ধারা দিয়েছে বদলে—তারও পরে এসে পড়েছে নির্মম আঘাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। বলেছেন সক্ষোভে—

'তারপরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আক্র গেল ঘুচে। এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধযুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি।'···

য়ুরোপের যে নব সভ্যতাকে একদিন তিনি আলো বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আজ তার অভ্যন্তরীণ গ্লানিময় পরিণাম দেখে জীবনাবসানের দিকে এসে ধিক্কার জানিয়ে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তবু একটা জিনিস লক্ষ্য করার—এই য়ুরোপের মানুষের কাছে তিনি ছুটে গেছেন এক বাণী নিয়ে—যেটাকে তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের বাণী। বোধ করি তিনি তখনো অতবড় শক্তিমান একটা সভ্যতায় লালিত যে মানুষ এবং তার প্রতি বিশ্বাস হারান নি। এবং এই বিশ্বাস ছিল তাঁর মহৎ সম্বল।

ব্যক্তিপূজা

নির্মাল্য বাগচী

এই 'ফেনোমেনা' (প্রপঞ্চ) ইতিহাসে দীর্ঘ দিনের। রাষ্ট্রের সৃষ্টি থেকেই এই অতিমানববাদ, গুরুপূজা, পুরুষোত্তম, যুগে যুগে, এসব ধারণা চলে আসছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রাচীনকালেও চলেছে—বিশেষ বুদ্ধদেবের জীবনচর্যার মধ্যে দেখা যায়। এরিস্টোটল বলেছিলেন, "প্লেটো আমার প্রিয়, কিন্তু তার থেকেও প্রিয় হল সত্য"। অতীতের ইতিহাসে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা এই লেখার লক্ষ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য এই প্রপঞ্চ সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কি ভেবেছিলেন? স্ট্যালিন ও মাওয়ের মধ্যে যে উৎকট ব্যক্তিপূজার প্রকাশ ঘটেছিল, তার কারণও উৎস নিয়ে আলোচনা ভালভাবে হয় নি। অথচ মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন এই [illegible] সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মার্কস তাঁর কোন লেখায় বলেছেন "প্রত্যেক নূতন ঐতিহাসিক স্তরে পুরনো ভুলগুলি আত্মপ্রকাশ করে সম্পূর্ণরূপে বিদায় গ্রহণ করার জন্যে।" (রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪১৭)

মার্কস

মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন, জার্মানীতে ল্যাসালেকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিপূজার উদ্ভব হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে মার্কসের চিঠিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে, "আমরা উভয়ে জনপ্রিয়তাকে নগণ্য বোধে উপেক্ষা করেছি। আন্তর্জাতিকের আমলে বিভিন্ন দেশ থেকে আনা যে-সব বহু অভিনন্দন দ্বারা আমি উত্যক্ত হতাম, যে কোনও ধরনের ব্যক্তিপূজার সম্পর্কে বিরূপতার দরুন সেগুলিকে প্রচারের জগতে উপস্থিত করতে আমি কখনও অনুমতি দিই নি, এবং মাঝে মাঝে তিরস্কার করা ছাড়া সেগুলির কোনও উত্তরও দিই নি।" (মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত পত্রাবলী, ১৯৬৫, পৃঃ ৩১০)

যখন মার্কস ও এঙ্গেলস গুপ্ত কমিউনিস্ট সংগঠনে যোগ দেন, তখন তার

নিয়মাবলী থেকে নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেয় এমন সব কিছু অনুশাসন বাদ দিতে হবে, এই সর্ত আরোপ করেন। "আমরা উভয়ে সর্বদাই ব্যক্তি বিশেষের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ছিলাম। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল, যদি কোন বড় উদ্দেশ্য এর পিছনে থাকত। আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের প্রতি এরূপ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিশেষ করে বিরুদ্ধে ছিলাম।" (রচনাবলী, ২৮শ খণ্ড, পৃ: ৩৮৫)

প্রথম আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা ফ্রেডারিক সর্জ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "মার্কস কখনও কর্তৃত্ব করতেন না, কখনও চেষ্টাও করতেন না। তাঁর বিশাল সর্বব্যাপী জ্ঞান, তাঁর বহুমুখী শিক্ষা, তাঁর শ্রদ্ধা-উদ্দীপক চরিত্রের ফলে তাঁর এই প্রভাব গড়ে উঠেছিল।" (ডাই-নিউ-জিট)

মার্কস তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "ক্যাপিটেলের" প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেন, সাইলেসিয়ার এক অবজ্ঞাত কৃষক উইলিয়াম উলফকে, যিনি মাঞ্চেস্টারে নির্বাসনে মারা যান। এই বইখানি লিখেছিলেন সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, এবং আক্ষেপ করে বলেছিলেন "যদি জনসাধারণ শুধু পড়তে পারত।"

সত্তরের দশকে ফরাসী মার্কসবাদীদের নির্বিচারবাদ লক্ষ্য করে মার্কস বলেছিলেন "আমি এইটুকু জানি, আমি মার্কসবাদী নই" (পত্রাবলী, ১৯৬৫, পৃ: ৪১৩)

এঙ্গেলস

১৮৯০ সালে এঙ্গেলসের সপ্ততিতম জন্মদিনে যখন নানা দিক থেকে অভিনন্দন আসতে সুরু করল, এঙ্গেলস বিব্রত বোধ করলেন। এঙ্গেলস বন্ধু ফ্রেডারিক সর্জকে লিখছেন "এসব শেষ হলে বাঁচি; আমি মোটেই উৎসবের মেজাজে নেই। এসব তুচ্ছ উত্তেজনায় আমার ঘেন্না ধরে।" (রচনাবলী, ৩৭ খণ্ড, পৃ: ৪২৬) পরে আরেক বন্ধুকে লিখছেন, "যে সম্মান আমার উপর বর্ষিত হয়েছে, তার সিংহভাগ আমার প্রাপ্য নয়; আমার অনুমতি নিয়ে মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, আমি তাঁকেই অনুসরণ করছি; যে সামান্য অংশ আমি বিনয়সহকারে গ্রহণ করছি, তার প্রত্যুত্তরে বলতে চাই, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।" (পৃ: ৪৩৫-৩৬)

১৮৯০ সালে এঙ্গেলস বন্ধু মেহেরিংকে চিঠিতে লিখছেন; "একটাই আপত্তি, আমার যা প্রাপ্য, তার থেকে বেশী প্রশংসা আপনি করেছেন; আমি

যা সময় মত ধরতে পারতাম, মার্কস তার থেকে অনেক স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অনেক দ্রুত এবং ব্যাপকতর পরিধিতে তা আবিষ্কার করেছেন। দুজনে এক সঙ্গে চল্লিশ বছর কাজ করেছি···বড় যখন মারা গেলেন, তখন ছোট সহজেই বেশী দাম পেতে লাগল, আমার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। কিন্তু ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ঠিকই বিচার করবে।···(পত্রাবলী, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৫৮-৯)

১৮৯৪ সালে প্লেখানভকে লিখছেন "প্রথমেই আমি আপনাকে বলছি, আমাকে "শিক্ষক" অভিহিত করা বন্ধ করুন। আমার নাম শুধু এঙ্গেলস···" (খণ্ড ৩৯, পৃঃ ২০৯)

এঙ্গেলস তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "মার্কসের জীবদ্দশায় আমি তার সহকারী ছিলাম।" (লেনিন : সংগৃহীত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৬)

১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের উপর প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে লেনিন বলছেন, "ক্যাপিটেল ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রকৃত প্রস্তাবে মার্কস ও এঙ্গেলস, এই দু'জনের কৃতি।" (ঐ)

লেনিন

লেনিন একটি গভীর উক্তিতে বলেছেন, "মহত্তম প্রতিভা দূরদৃষ্টিতে যা দেখতে পাবেন, তার চেয়ে অপরিসীম উন্নততর কিছু সৃষ্টি করতে পারে লক্ষ লক্ষ কর্মরত মানুষের মন।' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪)

একদিকে যেমন ব্যক্তির থেকে জনগণকে বৃহৎ বলে ভেবেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে মার্কসবাদ তাঁর কাছে অনুশাসন হয়ে ওঠে নি।

১৮৯৯ সালে "আমাদের কর্মসূচি"তে লেনিন লিখছেন, "মার্কসের তত্ত্বকে আমরা পরিসমাপ্ত ও স্পর্শাতীত কিছু একটা বলে ভাবি না; বরং এই কথাই আমরা বিশ্বাস করি যে সে তত্ত্ব বিজ্ঞানের মাত্র ভিত্তিপ্রস্তরটা গেতেছে, আর সমাজতন্ত্রী যদি বাস্তবজীবন থেকে পেছিয়ে পড়তে না চায় তা হলে সবদিক দিয়ে সে তত্ত্বকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার কর্তব্য। আমরা মনে করি যে মার্কসীয় তত্ত্বের স্বাধীন পরিবিকাশ রুশী সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে বিশেষ রকম আবশ্যক, কেননা সে তত্ত্ব দেয় কেবল সাধারণ দিগদর্শক প্রস্তাব যা তার খুঁটিনাটিতে ইংলণ্ডে প্রযোজ্য ফ্রান্সের চেয়ে ভিন্নভাবে, প্রযোজ্য জার্মানীর চেয়ে স্বতন্ত্ররূপে, রাশিয়ায় প্রযোজ্য জার্মানীর চেয়ে অন্য প্রকারে।" (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১১-১২)

সমাজের দুর্বল ক্ষত স্থানগুলি সম্পর্কে লেনিন সচেতন ছিলেন, সবকিছু ঝোঁক যেখান থেকে জন্মায়। "কমিউনিজমে 'বামপন্থার' শিশুরোগ" বইয়ে লিখেছেন, "লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি লোকের অভ্যাস অতি ভয়ঙ্কর এক শক্তি।"

এইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি কমিউনিস্টদের মধ্যে conceit বা দম্ভকে তিনি তিন প্রধান শত্রুর মধ্যে প্রথম বলে চিহ্নিত করেন। (৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ৭৭) এবং কমরেডদের কাছে যা চেয়েছেন তা হল বিনয় (modesty)। (৩২শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫)

লেনিনের একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী আছে; বিপ্লবের মাত্র কয়েক মাস পূর্বেকার কথা—সবে প্রবাসে দীর্ঘ নির্বাসিতের জীবন কাটানোর পর স্বদেশে ফিরেছেন; পেট্রোগ্রাডের সোভিয়েত লেনিনের কাছে জানতে চাইল, তাঁর পরিচয়, তাঁর কাজকর্ম, তাঁর কাজের ফলে দেশের লাভ না ক্ষতি হচ্ছে; লেনিন সংক্ষেপে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন; কিন্তু শেষ প্রশ্নটির উত্তর দিলেন না, বললেন, এর বিচারের ভার আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।" (৪১ খণ্ড, পৃঃ ৪৩০)

ইটালির পরিস্থিতি নিয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের কাছে বললেন, "কমরেড্ ল্যাজারি বলেছেন, ইটালির জনগণের মানসিকতা তাঁরা জানেন। কিন্তু আমার পক্ষে রাশিয়ার জনগণ সম্পর্কে এমন কথা বলার দুঃসাহস নাই।" (খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪৬৩)

লেনিন যখন শুনলেন যে তাঁর কিছু পার্টি-কমরেড তাঁর জীবন ও কার্য-কলাপের প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি মিউজিয়াম স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করেছেন, তখন তিনি তার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন।

১৯২০ সালের ২৩শে এপ্রিল লেনিনের যখন ৫০ বছর পূর্তি হল, তখন মস্কো কমিটি যে সভার আয়োজন করেন, লেনিন সেখানে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। (৩০শে খণ্ড, পৃঃ ৫২৬) অভিনন্দনমূলক কোন বক্তৃতা না দিয়ে পুরনো "ইস্ক্রা" থেকে কার্ল কাউৎস্কীর লেখার অংশবিশেষ পড়ে মন্তব্য করলেন, "এর থেকে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে, আমাদের পার্টি গভীর বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে পারে—গর্বস্ফীত ব্যক্তির অবস্থা (a man with a swelled head); এ হবে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ, লজ্জাকর এবং হাস্যকর অবস্থা·····রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা ও পতনের আগে এই রকম গর্বস্ফীত অবস্থা হয়, ···কোন অবস্থাতেই আমাদের পার্টিকে গর্বস্ফীত (swelled head) হতে দেব না।"

এর সঙ্গে তুলনা করুন ষ্ট্যালিনের সপ্ততিবর্ষ পালনের জাঁকজমক, আড়ম্বর, মূঢ়তা ও স্থূলতা।

১৯২১ সালে লেনিন কমরেড্ যোফেকে লিখেছেন "আমি তোমার চিঠি পড়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। ...প্রথম তুমি একাধিকবার লিখেছ "আমিই কেন্দ্রীয় কমিটি," তুমি ভুল করেছ। ...এত নার্ভাস হয়ে পড়ো না, এসব লিখো না, চূড়ান্ত অসম্ভব, চূড়ান্ত অসম্ভব কথা যে আমি হচ্ছি কেন্দ্রীয় কমিটি।" (বড় অক্ষর মূলে) (খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৯৯)

লেনিনের মৃত্যুর পর পত্নী ক্রুপস্কায়া যখন স্মৃতিকথা লিখতে বসলেন, প্রচুর উপাদান, তাঁর হাতে এসেছে, কিন্তু তা ৬২ পাতার বেশী বড় হল না। লিখতে বসে অদ্ভুত অনুভূতি হল, একবার মনে হচ্ছে, আমি ইলিচের সম্বন্ধে সব কিছু তরুণদের জন্য লিখে যাব, আবার মনে হচ্ছে ইলিচের নিজের কথা বেশী বলার অভ্যাস ছিল না, এত সব লিখলে ইলিচ অসন্তুষ্ট হবেন। এইজন্যে দুঃখ করে লিখেছেন, এত কার্পণ্য, এত খণ্ড খণ্ড, এত নীরস এই স্মৃতিকথা, বন্ধুরা তাই নিয়ে অনুযোগ করেছেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর সমগ্র দেশ যখন অভিভূত তখন ঘটা করে লেনিনের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন হল, সেই অবস্থায় লেনিন জায়া আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে। কৃত্রিম উপায়ে লেনিনের মৃতদেহকে রক্ষা করা ও জাঁকালো স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে কে বা কারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এসব জানবার উপায় নেই। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই, এচ, কার সন্ধান পান নি।

মৃত্যুর ৮ দিন পর ৩০শে জানুয়ারী, ১৯২৪ এর "প্রাভদায়" ক্রুপস্কায়া লিখছেন,

"আপনাদের কাছে একটি বড় অনুরোধ, ইলিচের প্রতি আপনাদের শোক যেন তাঁর ব্যক্তির প্রতি বাহ্যিক উক্তির আকার গ্রহণ না করে। তাঁর নামে কোনও স্মারক নির্মাণ করো না, তাঁর নামে প্রাসাদ স্থাপন করো না, কোন গম্ভীর পার্বণ করো না, এসব কিছু করো না। সারা জীবন এসবের প্রতি তিনি এত সামান্য গুরুত্ব দিয়েছেন, এসব তাঁর কাছে ছিল বিড়ম্বনা মাত্র। ভাবুন, আমাদের দেশে এখনও কত দারিদ্র ও অবহেলা চারিদিকে। ভ্লাদিমির ইলিচের নামে যদি শ্রদ্ধা জানাতে হয়, তবে স্কেশে, কিণ্ডার

গার্টেন, বাড়ী-ঘর, স্কুল, পাঠাগার, চিকিৎসা কেন্দ্র, আতুরালয় ইত্যাদি গড়ে তুলুন এবং তার থেকে বড় কথা তাঁর কথাকে কাজে পরিণত করুন।"

ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে বিংশতিতম কংগ্রেসের (১৯৫৬) বিরাট অবদান; সেখানে আত্মগত (subjective) এবং বিষয়গত (objective) কারণ নিয়ে এর উৎস সন্ধান করা হয়েছে। তবু আরো আরো আলোচনার দাবি সঙ্গত কারণেই উঠেছে, এই ব্যাধি বারে বারে আত্মপ্রকাশ করছে ও করতে পারে। আমাদের দেশের সাম্যবাদী দল ও আন্দোলন কি এর থেকে উদ্ধার পেয়েছে? স্ট্যালিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত লেখক গেরাসিমভ একটি মূল্যবান নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। (সোভিয়েত রিভিউ, সংখ্যা ৫৮-৫৯, ১৯৭৯)

সেক্সপিয়রের "জুলিয়াস সিজার" থেকে একটি বহুশ্রুত উধৃতি তিনি দিয়েছেন,

"The evil that men do live after them.
The good is often interred with their bone"
"মানুষের মন্দটাই মৃত্যুর পরও থেকে যায়,
তাদের ভাল কাজ প্রায়ই কবরের সঙ্গে সমাহিত হয়।"

গেরাসিমভ একটি নতুন প্রশ্ন তুলেছেন, যদিও আলোচনায় যোগ দেন নি—সেটি মার্কসীয় দর্শনের একটি মূল প্রশ্ন—কার্য সিদ্ধির উপায় (means) এবং লক্ষ্যের (ends) মধ্যে সম্পর্ক। এ নিয়ে আলোচনা তোলা দরকার। মার্কসের উক্তিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার:

The means must accord with the end...
The end for which the wrong means are
demanded, is not the righ tend ..(BDIS 60)

"উপায় এবং লক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গতি থাকতেই হবে। যে লক্ষ্যের জন্য অন্যায় উপায় গ্রহণ করতে হয়, সেখানে লক্ষ্য সঠিক নয়।"

রজনী পাম দত্ত ইংলণ্ডের কুলীন পত্রিকা "টাইমস লিটারেরী সাপ্লিমেণ্টে" "ব্যক্তিপূজা" ও "পার্টির স্বাধীন অবস্থান" সম্পর্কে যেসব চিঠি দেন তার অংশ-বিশেষ এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

"At the seventh congress, we were in conflict again over a public demonstration of resistance to what we regarded as the cult of excessive adulation of Stalin, not that we were opposed

to his political line and leadership. We regarded the method of deification and assumption of infallibility as contrary to the traditions and interests of the international communist movement)

(মে ৫, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৮৭)

১৯৩৫ সালে সপ্তম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্ট্যালিনের প্রতি অতিমাত্রায় তোষামোদ নিয়ে বিরোধ বাধে। দেবত্ব আরোপ ও অভ্রান্ত হিসাবে গণ্য করা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা ও স্বার্থের বিরোধী বলে তাঁরা ঘোষণা করেন।

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সেই শ্রমিক প্রতিনিধিকে অভিনন্দন জানাই যিনি কথায় কথায় ঘনঘন উঠে দাঁড়িয়ে স্ট্যালিনের জয়ধ্বনি করতে অস্বীকার করেন। রজনী পাম দত্তের নেতৃত্বে (এবং এবং সেই স্থায়ি পলিটকেও যুক্ত করে) ইতিহাসে এই প্রথম স্ট্যালিন যুগে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে রণধ্বনি উঠেছিল।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের দ্বৈতরূপ ঃ আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্ভব

শ্রীকালকেতু সেন

ভারতের শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক শক্তি ত্রিপুরার ভয়াবহ ঘটনায় শোকাহত হয়েছেন, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরামের ঘটনায় শংকা প্রকাশ করছেন। এই রাজ্যগুলির ঘটনার পশ্চাৎভাগে জনগণের ন্যায্য ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এর পরিণতির গতিমুখ বিচ্ছিন্নতার বিষক্রিয়ায় পূর্ণ বলেই বিচলিত না হয়ে থাকা যায় না।

ভারতের ভ্রাতৃপ্রতিম অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে জাতিতে জাতিতে, জাতি-উপজাতিতে, উপজাতি-উপজাতিতে. উচ্চবর্ণে-নিম্নবর্ণে বিরোধ. সংঘর্ষ খুনোখুনি ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়গ্রামে ঘটে গেছে। ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতো আছেই, তার উপর একই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত উপসাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। জাতিগত, উপজাতিগত, ভাষাগত, সম্প্রদায়গত, বর্ণগত সংঘর্ষও ভারতে ঘটলেও সাম্প্রতিক কালের ত্রিপুরা, আসাম, মিজোরাম, মণিপুর এবং মেঘালয়ের ঘটনা অতীতের দুঃখবহুল [redacted] নজিরগুলিকে শুধু অতিক্রম করে নি, ভারত ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, না খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, সে প্রশ্ন বড় করে সামনে এনে তুলে ধরছে।

এ কথা ঠিক, বেশ কয়েক বৎসর আগে 'স্বাধীন কাশ্মীর', 'স্বাধীন নাগাভূমি', 'স্বাধীন মিজোরাম' প্রভৃতি স্লোগান উঠেছিল। 'স্বতন্ত্র দ্রাবিড় রাজ্য' নিয়ে কিছু হৈচৈ হয়েছিল। অন্ধ্র রাজ্য থেকে তেলেঙ্গানাকে "আলাদা" করবার চেষ্টা করেছিল, 'মহাবিদর্ভের' কথা শোনা গিয়েছিল, 'শিখভূমির' দাবি উচ্চারিত হয়েছিল। এখন 'উদয়াচল', 'প্রান্তিক রাজ্য', 'স্বাধীন ত্রিপুরা',

'উত্তরভাগ' (উত্তরপ্রদেশ), 'উত্তরখণ্ড' (পশ্চিমবঙ্গ), 'ঝাড়খণ্ড', 'বাঙ্গালীস্থান' প্রভৃতি দাবি উঠতে আরম্ভ করেছে।

এ ছাড়া কয়েক বৎসর ধরেই 'ওড়িশ্যা ওড়িয়াদের জন্য', 'বিহার বিহারীদের (হিন্দীভাষী) জন্য', 'অসম অসমিয়াদের জন্য', 'শিলিং খাসিদের জন্য', 'তুরা গারোদের জন্য', 'মহারাষ্ট্র মারাঠিদের জন্য' কোন কোন মহল থেকে বলে আসা হচ্ছে। এর বিপরীতে হিন্দী ভাষাকে বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যে বলপূর্বক প্রচলনের প্রয়াস আছে; 'এক দেশ, একজাতি, এক রাষ্ট্র, এক নেতা'র সরব প্রচার আছে। 'অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রের' ধ্বনি আছে। 'খণ্ড খণ্ড মুক্তাঞ্চলের' তত্ত্ব শোনা যাচ্ছে। এখন যা ঘটছে তা' একটিমাত্র রাজ্যের রাজ্যগত সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন রাজ্যে, অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় এর প্রকাশ হচ্ছে। তাই বিরোধের মূল ঘটনাস্থলে রাজ্য থাকলেও, এটি একটি সর্বভারতীয় বিষয় এবং তা জরুরী বিষয়। সর্বভারতের পটভূমিতে ও সমস্যার পর্যালোচনা করে সমাধানের পথ বের করা আশু প্রয়োজন। রাজ্যের দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব সমগ্র ভারতের দায়িত্বেরই অঙ্গ। সমগ্র ভারত যদি এখন এ দায়িত্ব গ্রহণ এবং পালন না করে, বর্তমান ভয়াবহ ঘটনার জন্য রাজ্যকে 'বলির পাঁঠার মতো হাড়কাঠের সামনে দাঁড় করিয়ে' কেন্দ্র মূল সমস্যার সমাধানে জোড়াতালি দিতে চেষ্টা করে, তবে তার পরিণতি নিকটভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ হতে পারে। রোগ না সারালে তা সংক্রামিত এবং সম্প্রসারিত হয়। ভয়াবহ ঘটনাগুলি স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরের পরেও ঘটছে। ধনতন্ত্রের যাত্রাপথে তার বিকাশের দ্বৈতরূপের প্রকাশে এই অন্ধকারের দিকগুলি ঘোরতর বিপদরূপেই বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট বিবেচিত হচ্ছে।

দেশভাগ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল। সাম্রাজ্যবাদীরাই চারের দশকে জার্মানী, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং ভারতকে ভাগ করেছিল। বাঙ্গালাকে এবং বাংলার একাধিক জেলাকে একাধিকবার তারা ভাগ করেছে। ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রেরই দোসর। কোন দেশেরই ধনতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যতন্ত্রের এই অপকৌশলকে প্রতিহত বা পরাস্ত করতে পারে নি বা চায় নি। ভারত ভাগকে ভারতের ধনিক শ্রেণী এবং তার রাজনীতিক প্রতিনিধিরা মেনে নিয়েছিল। একথা ভুলে গেলে ইতিহাসকে অবমাননা করা হবে। এক্ষেত্রে এটাও উল্লেখ্য, ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের এখনকার বহু সমস্যা ১৯৪৭ সালের দেশভাগজনিত।

সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক একদা বিভক্ত দেশকে পুনরায় সংযুক্তিকরণের উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত এ বিশ্বে আছে—সে দেশ হল ভিয়েতনাম। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শক্তি ভিয়েতনামকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত চীন দেশেও আছে। একদা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনকে নানা ভাগে ভাগ করেছিল, তিব্বতকে তারা আলাদা করে ফেলেছিল।

রাজ্য ও রাষ্ট্র গঠন এবং জাতি, উপজাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে আজ দু'টি পথ—একটি পুরান পথ ধনতান্ত্রিক, আর একটি নবীন পথ বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক। ভারতের বর্তমান সমস্যার স্থায়ী সমাধানের যাত্রাপথে একথা মনে রাখতে হবে। বিচ্ছিন্নতার যে প্রবণতা তা ধনতন্ত্রের মধ্যে থেকেই প্রসারিত হচ্ছে, ধনতন্ত্রের অসম বিকাশ এই প্রবণতাকে পুষ্ট করছে, তার বিকাশে দারিদ্র্যের প্রসারে দরিদ্রের বিক্ষুব্ধ চিত্ত ভ্রাতৃঘাতীতে নিযুক্ত করছে। হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষবীজ আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনে ইংরেজ শাসকরাই সুকৌশলে রোপন করেছিল। তাদেরই সযত্নে লালিত সে বীজ কণ্টক বৃক্ষে পরিণত হয়। তারই ফল দেশ ভাগ। ভারতে বর্ণাশ্রম প্রথার সমাজজীবনে, আদিবাসী সমাজের যথার্থ উন্নতি ও উপজাতিকে জাতিতে উত্তরণের অভাবে ইংরেজ শাসকশ্রেণী জাতি বনাম উপজাতির, নিম্নবর্ণ বনাম উচ্চবর্ণের বিরোধের বীজ রোপন করার সুযোগ পায়। সেই বীজ থেকে বিষবৃক্ষ হয়েছে। তারই ফল আমরা ভক্ষণ করছি। এ ফল ভক্ষণ করতে হত না, যদি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হত। অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবে আধা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধে ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের ভয়াবহ পরিণতির যথার্থ পরিচয় বর্তমান ভারত।

জাতিগত এবং জাতি ও উপজাতিগত সংঘর্ষের ঘটনা শুধু ভারতেই যে ঘটছে তা নয়। একদা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লুণ্ঠিত, শাসিত উপনিবেশগুলি, যা নিকটঅতীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে এমন একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে জাতি-উপজাতির সংঘর্ষের সংবাদ মাঝে মাঝেই শোনা যায়। বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার শক্তি নিপীড়িত বঞ্চিত আদিবাসী জনগণকে তাদের দাবার ঘোড়ে করতে চাইছে। অথচ তারাই তাদের উপনিবেশগুলিতে আদিবাসী সমাজের নর-নারীকে সমাজবিকাশের গতিধারায় জাতিতে উত্তরণের ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন করে নি। সমাজের পশ্চাৎপদতাকে টিকিয়ে রেখে বিকাশের সমস্যাকে জটিলতর করে দিয়ে উত্তরপুরুষের ঘাড়ে এর বোঝা

চাপিয়ে দিয়ে গেছে। দীর্ঘকাল ধরে পশ্চাৎপদতার দুঃখবহ ফল সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে এখন ভোগ করতে হচ্ছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর যে দেশগুলি ধনতন্ত্রের পথ নিয়েছে সেই দেশগুলিতে এর ফলাফল অধিক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। ভারতে পশ্চাৎপদ আধা-সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদের উপর ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন এবং তেত্রিশ বছর ধরে তার শাসন-শোষণ আদিবাসী সমাজের বিকাশের সমস্যাকে সমাধান করতে পারে নি। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ভারতীয় ধনতন্ত্রের এটাও একটা ব্যর্থতা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে এখন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পশ্চাতে 'বিদেশী হস্তক্ষেপের' অভিযোগ উঠেছে। ন্যায্য অভিযোগ। ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ও তার রাজনীতিক প্রতিনিধিরাই 'বহুজাতিক ক্লাবে' যোগদান করে এই হস্তক্ষেপের পথ সুগম করেছেন। ভারত নামক "বাজারটি" "বহুজাতিক ক্লাবের" নিকট শোষণের এক লীলাক্ষেত্র। মার্কিন পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত এই 'ক্লাব'। বিশ্বব্যাঙ্কের "সাহায্য" (আসলে অদৃশ্য কঠিন বন্ধন) সুদূর পল্লীর গৃহকোণে অনুপ্রবেশ করেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বনামে এবং ভারতীয় সাইনবোর্ডের আড়ালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ব্যক্তিগত পুঁজির বছর বছর পরিমাণ বাড়ালে রাজনীতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার 'হস্তক্ষেপ' সুনিশ্চিত হয়। 'সাহায্য' নামক কাটা খালে কুমির যে প্রবেশ করে তার একাধিক নজির সদ্যস্বাধীন ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দুর্লভ নয়। দোষটা শুধু কুমিরের নয়, খাল কাটারও দোষ আছে। অবশ্য দোষারোপের বিষয় নয়—এটা ধনতন্ত্রবাদের বিধান। মনে রাখা দরকার—নয়া উপনিবেশবাদ বিলুপ্ত হয় নি।

সাম্রাজ্যতন্ত্র বনাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বময় দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে ধনতান্ত্রিক ভারতে বিকাশশীল প্রতিটি জাতি-উপজাতির মধ্যে দ্রুত বিকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। এ আকাঙ্ক্ষায় কোন পাপ নেই। কিন্তু বিকাশের প্রতিপদক্ষেপেই প্রতিবন্ধকতা, ওই প্রতিবন্ধকতার মূলে ধনতান্ত্রিক প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের অবশেষ রয়েছে। 'সোনার পাথরের বাটি' হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিকে বাড়তে দেব আর জনগণের সার্বিক বিকাশ ঘটাব—এটা চলে না। এক পুকুরে বোয়াল আর পোনার চাষ হয় না, হতে পারে না।

আজকের ভারতে ধন এবং নির্ধনের ক্রম প্রসারিত বৈষম্যই সকল বিরোধের উৎসস্থল। ধন যত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, নির্ধন ও নিঃস্বের সংখ্যা তত বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান নিঃস্ব নর-নারীর তলদেশে উপজাতি নর-নারীরা রয়েছেন। আজও তাঁরা মধ্যযুগের পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক জীবন থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ওঁদের ঘিরেই অর্ধক্রীতদাস প্রথা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে টিকে আছে। আদিবাসী এবং হরিজন নর-নারীর মধ্যেই বণ্ডেড লেবার সর্বাধিক। একদিকে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত, অশোকচক্র খচিত পতাকা আর একদিকে অর্ধক্রীতদাস, বণ্ডেড লেবার—দেশের এই যে স্ববিরোধী অবস্থা, এই অবস্থাই সকল বিরোধের মধ্যে বড় বিরোধ।

কতকগুলি দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভগুলি উঠছে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ছে। যথা—(১) জমি চাই (২) কাজ চাই (৩) বাসস্থান চাই (৪) শিক্ষা চাই (৫) বড় হতে চাই (৬) রাজনীতিক ক্ষমতা চাই। মানুষ হিসাবে, নাগরিক হিসাবে এর কোনটিই প্রতিক্রিয়াশীল দাবি নয়, দাবিগুলি মৌলিক এবং গণতান্ত্রিক। অথচ গত তেত্রিশ বছরে ভারতের ধনতান্ত্রিক পথ এর কোনটিই পূরণ করতে পারে নি, পূরণ তো করেই নি, উপরন্তু প্রতি বছর কোন কোন রাজ্যে ২ শতাংশ কোথাও এর কিছু কম হারে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত পরিবারের নর-নারীকে দারিদ্র সীমার নীচে টেনে নামিয়েছে। সমগ্র ভারতে এই "হার ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ৪২ এবং ১৯৭৩-৭৪-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪৭·৬"। যে দেশে দারিদ্রের সংখ্যা বেড়ে চলে, সে দেশের আর্থনীতিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার জয়গান মানুষে কি করে গাইবে? দারিদ্র্যের জন্যই কি স্বাধীনতা? ভারতীয় ধনতন্ত্রের দ্বৈতরূপে 'রোহিনী' বা 'আর্য ভট্ট' কোটি কোটি মানুষের ভাত-কাপড় ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে নি, 'সবুজ বিপ্লব' কোটি কোটি অনাহারীকে আহার যোগাতে পারে নি, গড়ে ওঠা বড় বড় কাপড়ের কল লক্ষ লক্ষ নর-নারীর লজ্জা নিবারণ করে নি, নতুন নতুন কল-কারখানা যুবকদের বেকারিত্বের অসহনীয় জ্বালা কমাতে পারে নি। বড় বড় সড়ক, হাজার হাজার লরী গ্রামে গ্রামে খাদ্য-বস্ত্র পৌঁছাতে পারে নি, বড় বড় সেচপ্রকল্প লক্ষ লক্ষ গরিব ও মাঝারি কৃষককে জল দেয় নি, বড় বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প লক্ষ লক্ষ গরিবের ঘরকে আলোকিত করে নি। "পিঠে যত বড় হবে প্রত্যেকের ভাগও তত বাড়বে" এই প্রথাগত প্রজ্ঞা নেহাতই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনীতিক নিপীড়ন এবং সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে

শ্রমিক-কৃষক ও দরিদ্র জনগণের [বড় অংশ আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দু] ক্ষোভ ন্যায্য, ক্ষোভের প্রকাশও অন্যায্য নয়। ধনিকশ্রেণীর রাজনীতিক প্রতিনিধিরা, ধনিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রনাধীন প্রচার মাধ্যমগুলি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের ন্যায্য দাবির গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এক এক সময় এক একটি বিশেষণ দিয়ে প্রচার করে থাকে। এই তো কিছুদিন আগে 'অপারেশন বর্গা'কে 'বর্গীর হামলা'রূপে চিত্রিত করা হল।

বৈচিত্র্যে ঐক্য ভারতের স্থায়ী বাণী। একমাত্র বৈচিত্র্য ভারতের পূর্ণসত্য নয়; একমাত্র ঐক্য ভারতের অর্ধ সত্য। অর্থাৎ বৈচিত্র্য এবং ঐক্য এই দুয়ের সমবায়ে ভারত পূর্ণতর হতে পারে। তাই, যে শক্তি ঐক্যকে বর্জন করে শুধু বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে, আবার শুধু বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে ঐক্যকে বর্জন করে সে শক্তি সমদোষে দোষী হয়। বৈচিত্র্যের অর্থ বিচ্ছিন্নতা নয়, ঐক্যের অর্থ গিলে ফেলা নয়। ভারতে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া এখনও চলছে। সাঁওতাল ভাষাভাষী সংখ্যাধিক্যের অঞ্চল নিয়ে সাঁওতাল রাজ্য বা সাঁওতাল প্রদেশ (ঝাড়খণ্ড নয়) গঠন, এক একটি উপজাতি সংখ্যাধিক্যের স্বায়ত্তশাসিত জেলা, মহকুমা গঠনে বিচ্ছিন্নতার কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে সোভিয়েত ও চীনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি, পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ বিষয়ে যে উদ্যোগ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা ন্যায্য ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছিল। যাঁরা মনে করছেন ভারতে জাতি বিকাশের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে, রাজ্য এবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, জেলা, মহকুমা গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—তাঁরা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। ধনতন্ত্রেই ভারতের শেষ নয়, সমাজতন্ত্র সামনে রয়েছে।

আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের জনজীবনে একাধিক শক্তি বিরাজ করছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যে ভারতে ঐক্যকামী শক্তি আছে আবার বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিও আছে। লক্ষ্য করার বিষয় আসাম-ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক শক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তা সংহত ও প্রসারিত হচ্ছিল তখনই বিভেদকামী শক্তি মারমুখী হয়ে ওঠে, ভয়াবহ ঘটনা ঘটায়।

বিচ্ছিন্নতা এবং আঞ্চলিকতা সমার্থক নয়। যদিও আঞ্চলিকতা অনেকক্ষেত্রে

বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, জাতি-উপজাতি ভেদের দ্বন্দ্ব ভারতের মূল শ্রেণীদ্বন্দ্ব নয়, এ দ্বন্দ্ব জনগণের নিজেকার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদ তা' নয়। নয়া উপনিবেশবাদের সহচর বর্তমানের বিচ্ছিন্নতাবাদ। এখনকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে নয়া উপনিবেশবাদীদের অনুপ্রবেশকে সহায়তা করে। কারণ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আগে শ্রমজীবী জনগণকে বিভক্ত করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করে, দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চায়। তাই, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদকে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। এটা শুধু ভারতে নয়, বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার সহায়তায় আঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিতে দেখা গেছে। আফগানিস্তানকে খণ্ড খণ্ড করার এক চক্রান্তের কথা আফগান রাষ্ট্রপ্রধানের সাম্প্রতিক এক বিবৃতি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তাই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে কোনক্রমেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিচরণভূমি। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সর্বক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম চালনা করা দরকার। রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক সর্ব শাখাতেই এ সংগ্রাম পরিচালিত হওয়া উচিত। বিচ্ছিন্নতাবাদের দর্শন, তত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি আছে। শুধুমাত্র দমনমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে পরাস্ত করা যায় না, যাবে না। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের চারপাশে দরিদ্র জনগণকে সমবেত করে, এই জনগণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিচ্ছিন্ন করাই প্রধানতম কাজ। এটা করতে হলে জনগনের যে ন্যায্য অসন্তোষের ভিত্তির ওপর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দাঁড়ায় সেই অসন্তোষের দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

আঞ্চলিকতার ঝোঁক বৃদ্ধি পাবার পেছনের কারণগুলি এক নজরে দেখা যাক। একটু পেছনে ফেলে আসা বছরগুলির কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাক। পঞ্চাশের দশকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বড় বড় আন্দোলন হয়। রাজ্যে রাজ্যে কৃষকসমাজের জমির বড় বড় সংগ্রাম হয়। শ্রমিকদের বড় বড় ধর্মঘট হতে দেখা যায়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বেড়ে রাজ্যে রাজ্যে বিস্তারলাভ করতে থাকে। বিকল্প গণতান্ত্রিক পথ এবং বিকল্প সরকার গঠনের কথা পঞ্চাশের দশকেই কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে।

ষাটের দশকে অর্থনৈতিক সংকট বাড়তে থাকে, রাজনীতিক সংকট প্রকাশ

পায়। কংগ্রেসের খাড়াখাড়ি ভাঙন আরম্ভ হয়। দুঃখজনক হলেও কমিউনিস্ট পার্টিরও ভাঙন দেখা দেয়। সর্বভারতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূণ্যতার সূচনায় আঞ্চলিক দল সৃষ্টি হতে থাকে। যুক্তফ্রন্ট, সংযুক্ত বিধায়ক দেখা দেয়, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। আঞ্চলিক দলের গোড়াপত্তন হয়।

সত্তরের দশকে এ ধারা অব্যাহত থাকে। বহু উপদলে বিভক্ত কংগ্রেস নামে সর্বভারতীয় হলেও, কাজে বহু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টদের প্রভাব মাত্র ৩।৪টি রাজ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পরস্পরের বিরোধে তাঁরা তাঁদের বিস্তারের পরিবর্তে যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে, কৃষক আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে, ছাত্র আন্দোলন প্রায় উঠে যায়, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠে যায়। ভোটে জয় একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস ভাঙন এবং তা রাজ্যে রাজ্যে টুকরো টুকরো হবার পর সর্বভারতীয় চরিত্র সম্পন্নত নেতৃত্বের যে শূণ্যতার সৃষ্টি হল, সে শূণ্যতা পূরণ করার আংশিক ক্ষমতা কমিউনিস্টদের ছিল। কিন্তু তাঁদের নিজেদের ভিতরকার অনৈক্য, বিবাদ ও বিরোধে তা ফলপ্রসূ হয় না।

সর্বভারতের মঞ্চে এই যে শূন্যতা, অক্ষমতা, ভ্রান্তি; তার সুযোগে আঞ্চলিকতা গ্রহণ করে। বহু আঞ্চলিক দল আত্মপ্রকাশ করে। 'বাংলা কংগ্রেস', 'কেরালা কংগ্রেস', 'আকালি', 'ডি. এম. কে', 'গোর্খালীগ', 'ঝাড়খণ্ড', 'মনিপুর পিপলস পার্টি', 'গোয়া গোমন্তক দল', 'শিব সেনা', তেলেঙ্গানা প্রজা দল', লোকদলকে ক্ষমতা অর্জনে দেখা দেয়। বর্তমানে ভারতে আঞ্চলিক দলের যেন শেষ নেই। ধনতান্ত্রিক পথের শ্রেণীগত বৈষম্যের গভীরতর ক্ষতের মধ্যে থেকে অসাম্যের যন্ত্রণায় আঞ্চলিক দলগুলি প্রধানত আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে সামনে আনার সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে স্ব স্ব অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয়, সমাজের চালিকা-শক্তি শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের নেতৃত্ব এই আঞ্চলিক দলগুলিতে নেই। শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা নিয়ে এ দলগুলি ভাবিত নয়। মধ্যবিত্ত ও পেটিবুর্জোয়াদের মধ্য থেকে আসা ছাত্র-যুবক-শিক্ষক প্রমুখের একটি অংশের নেতৃত্বে এ দলগুলি সাধারণভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। ষাটের শেষাশেষি সত্তরের প্রথম থেকে পেটিবুর্জোয়া-মধ্যবিত্তের "যুব নেতৃত্ব" সম্পর্কে একটি ভ্রান্তিকর প্রচার অভিযান আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় এমন একটা ধারণার সৃষ্টি

করা হয় যে, "যুব নেতৃত্বই" বর্তমান সমস্যাসংকুল ভারতের বিশ্বস্ত "কাণ্ডারী"। "কাণ্ডারী" সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এর প্রভাব অন্যান্য অংশেও পড়ে। যুবশক্তি উপেক্ষার নয়, কিন্তু তাঁরা মৌলিক শক্তি নয়, চালিকা-শক্তিতো নয়ই।

আঞ্চলিক দলগুলি, তাঁদের আর্থিক বৈষম্যের মূল কারণ যে পুঁজিবাদ, বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজিবাদ তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন না।

আঞ্চলিক পশ্চাৎপদতার জন্য সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এবং কৃষি ও শিল্প সম্পদের কেন্দ্রীভবন ও দেশী-বিদেশী পুঁজির লুণ্ঠন মূলতঃ দায়ী তার প্রতি আঞ্চলিক দলগুলি কোন আলোকপাত করেন নি। টাটা-বিড়লা প্রমুখ সকল জাতি-উপজাতির নর-নারীকেই প্রতিদিন নিঙড়ে নিচ্ছে, এই সত্য আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ ঘুণাক্ষরেও বলতে চান না। তাঁরা মূল শিকড় দেখছেন না, লতাপাতা দেখাচ্ছেন।

তাই আঞ্চলিক দলগুলি শোষণের মূল কেন্দ্রে, শোষণ-প্রথাকে আঘাত না করে উপকেন্দ্রে পায়তাড়া কষছেন। তাঁদের কৌশলের পরিচয়ে মনে হতে পারে, মূল শত্রুকে আড়ালে রেখে মিত্রকে আঘাত করে তাঁরা শোষণের পাহাড়ের বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণের এই পর্বের ন্যায্য ক্ষোভকে বিপথগামী করে দিচ্ছেন। ষাটের দশকের শেষদিকে নকশাল-বন্ধুরাও অনুরূপ কাজ করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য ক্ষোভকে বিপথে পরিচালিত করলে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষিত হয়।

ভারতে আঞ্চলিকতা দিয়ে কোন কোন জাতি-উপজাতির মৌলিক সমস্যার স্থায়ী সমধান সম্ভব নয়। ইতিহাস স্বেচ্ছামূলক ভ্রাতৃত্ববন্ধনেই ভারতকে গড়ে তুলেছে। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী হয়েছে। সেই কাঠামোর বাইরে গিয়ে কোন রাজ্যেই আজ এককভাবে বিকশিত হতে পারে না। প্রতিটি রাজ্যই আজ পরস্পরের সহযোগী, পরস্পরের নির্ভরশীল। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রীর পথে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-পরিবার গড়ে উঠছে। অগ্রগতির এই বিশ্বে ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতা যে অচল, অসম্ভব তা' প্রাত্যহিক জীবন প্রমাণ করে চলেছে। যাঁরা "স্বাধীন রাজ্য", "স্বাধীন অঞ্চল" দাবি করেন, তাঁরা জীবনকেই অস্বীকার করেন। জীবনের যেখানে অস্বীকৃতি, সেখানে কোন সাফল্য নেই।

বর্তমান ধনতান্ত্রিক ভারতে কোন জাতিরই সুসম বিকাশ হয় নি। এখানে

শোষক জাতি শোষিত জাতি নেই। কয়েকটি জাতির মধ্য থেকে কয়েকটি বৃহৎ একচেটিয়া শিল্পপতির আবির্ভাব হয়েছে। বহু জাতির মধ্যে বড় শিল্পপতির কোন অস্তিত্বই নেই। মুষ্টিমেয় বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির দ্রুত বিকাশ সকল জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের বহু শিল্পপতিকে বিনাশ করে চলেছে। এতো ধনতন্ত্রেই অবক্ষয়। তাই এর মধ্যে জাতিগত বিরোধ কোথায়? বৃহৎ জাতি ও ক্ষুদ্র জাতি ভারতে নেই।

বিটিশ আগমনের আগেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি অংশের লোক ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। রাজস্থানের লোক বাংলায় এসেছিলেন, বাংলার লোক উড়িষ্যায়, কেরালায় গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে রেলপথের আবির্ভাবে, শিল্পের সীমিত উদ্ভবে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের লোক ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন। বাঙ্গালীরা যেমন আসাম, উড়িষ্যা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ছড়িয়ে পড়েন, অনুরূপভাবে বাঙ্গালতেও প্রায় সকল রাজ্যের লোকেরা আসেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভারতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান জাতি, ভাষাভাষী এবং উপজাতির নর-নারীরা পশ্চিমঙ্গে বাস করছেন। ইতিহাসের এই পরিণতিকে কিছু ছাত্র, কিছু যুবক কি পাল্টে দিতে পারেন? শিল্পের বিকাশে, যোগাযোগের নৈকট্যে মানুষের অবাধ গতিকে রোধ করবে কে? প্রবাদে বলে 'সন্তার তিন অবস্থা', সান্ত্বা বুলিতে যতই উত্তেজনা থাক, কোন স্থায়ী সমাধান নেই।

আজ যাঁরা 'বাঙ্গালীর জন্যে বাংলা', 'বিহারীর জন্য বিহার', অসমিয়ার জন্য অসম', উড়িয়ার জন্য উড়িষ্যা', 'মারাঠিদের জন্য মহারাষ্ট্র' ইত্যাদির দাবি তুলে জনচিত্ত, বিশেষ করে যুবচিত্তকে উত্তেজিত করছেন, তারা ভাল করেই জানেন এ দাবির অসারতা। সাদা চোখেই ধরা যাক, সর্বভারতে ছড়িয়ে থাকা, বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকপুরুষ ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী নরনারী তাদের স্ব স্ব ভাষী রাজ্যে পুনর্বাসন কি সম্ভব? বাংলা ভাগের সমস্যা এখনও জটিল হয়ে আছে, তার উপর রাজ্যে রাজ্যে ভাষাভাষী মানুষের ভাগ, 'গোদের উপর বিষ ফোড়ারই' সমতুল্য। ইতিহাসের অগ্রগতির চাকাকে এঁরা পেছনের দিকে টানতে চান।

মূল সমস্যা ভাষাভাষীর আঞ্চলিক বা রাজ্যিক জনসংখ্যার ভাগ বাটোয়ারা নয়; মূল সমস্যা—সকল জাতির, সকল উপজাতির প্রতিটি নর-নারীর সম-অধিকার, সম-সুযোগ, সম-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠার। এক কথায়: সকল জাতি-

উপজাতির সুসম বিকাশ। সকলের সুসম বিকাশের জটিল সমস্যার সামনে বর্তমানে সকল জাতি-উপজাতির নর-নারীরা এসে দাঁড়িয়েছেন। এর সমাধান প্রয়োজন, কিন্তু তা কোন্ পথে ?

সামনের দিনের পথের কথা ভাবতে হলে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলিতে ভারত যেভাবে চলে এসেছে তার পরিচয় নিতে হয়। অর্থাৎ বলতে হবে, এতদিন যেভাবে চলেছে, তাতে ভারতের জাতি-উপজাতির বিকাশের সমস্যার সমাধানতো হয় নি, উপরন্তু তা এখন জটিলতর হয়ে উঠেছে। এমন একটা পর্যায়ে তা এসেছে, যা সংযুক্ত ভারতকে খণ্ড খণ্ড করবার দিকে টানছে।

এক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, ভারত ধনতান্ত্রিক পথে চলে এসেছে। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক পথ ভারতের জাতি-উপজাতির সুসম বিকাশেরও সমাধান করতে পারে নি তা স্বীকার করে নিতে হবে। ধনতান্ত্রিক অভিধানে সুসম বিকাশ নেই। আমেরিকা কি নিগ্রোদের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে ? ব্রিটেন কি চেয়েছে আয়ারল্যাণ্ডের বিকাশ ?

ধনতন্ত্রের বিকল্প পথ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। আজকের বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সুসম বিকাশের পথরেখা একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই দিতে সক্ষম হয়েছে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতি-উপজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সাফল্য সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্রে রয়েছে। ওই মূলমন্ত্রের প্রয়োগে এ বিষয়ে চীনের সাফল্যের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, সাফল্য এসেছে চেকোশ্লোভেকিয়ায়। কোন দেশকে অনুকরণের কথা বলছি না, প্রতি দেশেরই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাধানের রূপরেখায় বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। কিন্তু যে মূলমন্ত্রের যথার্থ প্রয়োগে এর সমাধান হয়েছে তা আত্মস্থ করতে বাধা কোথায় ?

আগামী দিনে সমাজতান্ত্রিক ভারতে সুপ্রাচীন সকল জাতি-উপজাতির প্রকৃত বিকাশের যথার্থ পথরেখা পাওয়া সম্ভব হবে এবং তা রূপায়িত হবে এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখা চলতে পারে।

কিন্তু ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে বর্তমানের যন্ত্রণার সামনে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কি সমীচীন ? না, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য বর্তমানেও পথ আছে। তার আলোচনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সে আলোচনার আগে, উন্নত জাতিসুলভ জাতীয়তাবোধ এবং পশ্চাৎপদ

আঞ্চলিক উগ্র হীনমন্যতাবোধের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও ঝোঁকের বিরুদ্ধে সচেতন অথচ নমনীয় সংগ্রাম চালান এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলেই গণ্য করতে হবে। ভারতে এখন বৃহৎ ধনিকশ্রেণী বনাম শ্রমিকশ্রেণী, জোতদার বনাম কৃষকসমাজ এবং শোষক বনাম শোষিতের যে মূল শ্রেণীদ্বন্দ্ব চলেছে এবং এই মৌলিক সংঘাতের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিকাশের বৈষম্যে উদ্ভূত জাতি বনাম জাতি, জাতি বনাম উপজাতি, উপজাতি বনাম খণ্ডজাতির মধ্যে যে গৌণ দ্বন্দ্ব চলছে সে দ্বন্দ্ব বিকাশকামী জনগণের নিজেদের মধ্যেকার বন্ধুত্বের দ্বন্দ্ব— এর সমাধান সংঘর্ষে নয়; আলোচনা, অভিজ্ঞতা এবং সহনশীলতায় এর সমাধানের পথ রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে।

এরই পাশাপাশি বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত উদ্যোগে কঠোর সংগ্রাম চালাতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতার উৎসমুখে ঐক্যবদ্ধ জনগণের আঘাতকে কেন্দ্রিভূত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীকে এ সংগ্রামের পুরোভাগে থাকতে হবে।

ধনতন্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই, ভবিষ্যৎ পড়ে আছে সমাজতন্ত্রের জন্য। তাই বর্তমানের এই জরুরী কাজে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে যাঁরা সজ্জিত তাঁদের দায়িত্ব সর্বাধিক।

আলো-আঁধারিতে স্তালিন

[স্তালিন-পর্বের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে পূর্ব-সমালোচনায় স্থির থেকেও স্তালিন-বিরোধী কুৎসা-অভিযানে সোভিয়েত পার্টি গা ভাসিয়ে দিতে রাজী নন। স্তালিন সম্পর্কে সোভিয়েতের মূল্যায়ন যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, স্তালিনের ভূমিকার ইতিবাচক দিকটি যে সোভিয়েত পার্টি জোরের সঙ্গে তুলে ধরছেন—তার প্রমাণ মিলবে এই প্রবন্ধে।]—সম্পাদক

সোভিয়েত ইউনিয়ন, লেনিনবাদী পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত আক্রমণের জন্য সমাজতন্ত্রের শত্রুদের কাছে যে-কোন কিছুই অভিপ্রেত। এবারে তারা জে. ভি. স্তালিনের জন্মশতবর্ধকে বেছে নিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রসমূহ ও বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম একসময় স্তালিনের কিছু যথার্থ সত্য ও কাল্পনিক ভ্রান্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপারে অনুমানের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা 'স্তালিনবাদ' নামে এক তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সামাজিক রাজনৈতিক অনুশীলনের উপযোগী ধারণা খাড়া করতে চেষ্টা করছে ব্যবস্থা হিসাবে। স্তালিন ও "স্তালিনবাদের" সমালোচনার নামে তারা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের ইতিহাসে কুৎসামূলক আবিষ্কার করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ামক অবদানকে ছোট করার জন্য "যুক্তি" আমদানী করছে এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়যাত্রার বিষয়ে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণকাণ্ডের সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও শোধণবাদী অপপ্রচারের মাধ্যমে তারা ব্যক্তিপূজার নেতিবাচক প্রপঞ্চকে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার প্রধান উপাদান হিসাবে চালাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

আমাদের পার্টির অবস্থান এ প্রশ্নে নীতিভিত্তিক এবং অত্যন্ত পরিষ্কার। সি. পি. এস. ইউ'র বিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ (১৯৫৬), ৩০শে জুন, ১৯৫৬

সালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব "ব্যক্তিপূজার থেকে মুক্তি ও তার ফলাফল", "মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর"—১৯৬৭র সি পি এস ইউর থিসিস, বিভিন্ন পার্টি নেতার বক্তৃতা প্রভৃতি যেসব কিছু পার্টি দলিল স্তালিনের কর্মকাণ্ড ও তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত দৃষ্টি ও ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রামাণ্য মূল্যায়ন করেছে।

ব্যক্তিপূজা প্রভাবিত সব ধরনের বিকৃতি, যৌথ নেতৃত্বের নীতি ও লেনিনবাদী পদ্ধতি ও নীতি থেকে বিচ্যুতি, ক্ষমতার স্থূল অপব্যবহার এবং সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিধি লঙ্ঘনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি এস ইউ) দৃঢ়তার সাথে নিন্দা করেছে। সাথে সাথে সি পি এস ইউর কেন্দ্রীয় কমিটির অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর সংক্রান্ত দলিল এ-নির্দেশও করেছে যে "এই বিকৃতিসমূহ তার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের চরিত্র বদলায় নি বা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে নাড়া দেয় নি। পার্টি ও জনগণ দৃঢ়তার সাথে কমিউনিজমের উদ্দেশ্যের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছে, লেনিনের আদর্শকে রূপায়িত করেছে সাময়িক ভুলভ্রান্তি, বিচ্যুতিকে অতিক্রম করেছে"।

একদিকে স্তালিনের ভ্রান্তির জন্য পার্টিকে দায়ী করা এবং সোভিয়েত ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য শত্রুতাপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে পার্টি ও জনগণের দ্বারা অর্জিত সমস্ত সাফল্য ও বিজয়ে, সমাজতন্ত্র নির্মাণ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধজয়ের সমস্ত কৃতিত্বই স্তালিনের উপর বর্তানো: ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিষয়গত অন্তর্বস্তু বিকৃতকামী দুই ধরনের অতিরঞ্জনকেই পার্টি দলিলসমূহ সমভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে বিরোধিতা করেছে।

পার্টির কাছে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিগুলিতে লেনিন যে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে স্তালিনের চরিত্রচিত্রণ করেছেন, সেইভাবেই, পার্টির দলিলসমূহ ও অন্যান্য রচনাবলী ট্রটস্কিবাদ ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে স্তালিনকে, নেতা এবং মানুষ হিসেবে তাঁর সকল জটিলতা ও স্ববিরোধিতা সহ একজন মহান সংগঠকরূপে আলোকপাত করেছে।

আমাদের পার্টি ও জনগণ বিষয়গতভাবেই স্তালিনের কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহের মূল্যায়ন করে। এটাই লেনিনবাদী সত্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ধারা।

সমাজতন্ত্রের সাফল্য সংবদ্ধকরণ ও প্রসার এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে স্তালিনের প্রকৃত স্থান সংজ্ঞায়নে ও সাথে সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী ব্যক্তিপূজা গড়ে তোলার বিষয়গত কারণগুলি ও বিষয়ীগত উদ্দেশ্য-বলী উপরোক্ত দলিলসমূহে বিস্তৃতভাবে পরীক্ষিত ; ২৫ বছর পরে আজকে আমরা সেইসব প্রশ্নে ফিরে না গেলেও পারি। কিন্তু সুনিশ্চিত কারণে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পশ্চিমী দুনিয়ায় এ প্রশ্ন বারবার উত্থাপিত হওয়ায়, আমরা এই সংশয়াতীতরূপে চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক স্মরণ করব।

লেনিনের জীবিতাবস্থায় তাঁর জ্ঞাতসারেই স্তালিন পার্টির সর্বোচ্চপদে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন আর লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাষ্ট্র ও পার্টির একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হয়েছিলেন। তিন দশক ধরে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা হিসাবে স্তালিন তাঁর সংবাদপত্রের বিবৃতি মারফৎ এবং জনগণের সামনে বক্তব্য মারফৎ পার্টির যৌথভাবে গৃহীত লেনিনবাদী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিসমূহকেই তুলে ধরেছিলেন, তুলে ধরেছিলেন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের অভিজ্ঞতা।

আমরা একথা উল্লেখ না করে পারি না যে লেনিনের সাথে স্তালিনের বহুবারই মতপার্থক্য ঘটেছে : প্রথমত সেটা বুঝতে পারার সাথে সাথেই স্তালিন-লেনিনের মতকে গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয়ত কখনই লেনিনের বিপক্ষে যান নি বরং নিজেকে ব্যতিক্রমবিহীনভাবেই লেনিনের অনুসারী এবং ছাত্র হিসাবে মনে করেছেন।

স্তালিন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব হতে সারবস্তুগতভাবে পৃথক কোনো মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রচলন করেন নি। সি পি এস ইউর কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুনের সিদ্ধান্তে তাঁকে একজন অগ্রগণ্য তাত্ত্বিক ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচারক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর বহু তত্ত্বগত রচনা, পার্টি কংগ্রেসে তাঁর পেশ করা কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট লেনিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি ও অগ্রগতির স্বার্থে, শান্তি ও সাধারণ নিরাপত্তা রক্ষায় নিশ্চিতভাবে বৈপ্লবিক তত্ত্ব বিকাশে ও আমাদের পার্টির সংগ্রামে মূল্যবান অবদান। এবং এর অর্থই হ'ল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব বা এর কাঠামোর বাইরেও মতাদর্শগত ধারা হিসাবে "স্তালিনবাদ"এর কোন

প্রশ্ন ওঠে না। এই একমাত্র কারণেই স্তালিনের ব্যক্তিপূজার প্রশ্নটিকে পার্টির সমগ্র যুগের কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি কমিউনিস্ট আদর্শের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি বলা যায় না কারণ স্তালিনের ব্যক্তিপ্রাধান্য গড়ে উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং কঠিন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে।

এটাও জানা কথা যে স্তালিন তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে এবং জনসভাসমূহের বক্তৃতায় সবসময় ব্যক্তির ভূমিকা অতিরঞ্জনের বিরোধিতা করতেন, বিশেষভাবে তাঁর নিজের ভূমিকারই। স্তালিনের কর্মধারা ছিল পরস্পরবিরোধী। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর অবিচল প্রত্যয় এবং বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে কোন বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তাঁর আপোসহীন সংগ্রামের পাশাপাশি দেখা যায় যে তিনি নেতৃত্বের প্রশ্নে মার্কসবাদ লেনিনবাদ কর্তৃক পরিত্যক্ত পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। সমাজতন্ত্রের বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি স্তালিন কিন্তু নিজেকে এবং অন্যদের এমন পদ্ধতিতে চলতে দিয়েছেন যা পার্টি পরিচালনার পদ্ধতি, পার্টি-জীবনের জন্য স্বীকৃত লেনিনবাদী নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের তত্ত্বগত অপরিবর্তনীয় নীতিসমূহের পরিপন্থী।

একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শান্তির সময়ে সৃজনশীল কাজের পদ্ধতি এবং যুদ্ধকালীন বা বিষয়ীগত বিশেষ পরিস্থিতির চাপে শ্রেণীসংগ্রাম চলাকালীন বিশেষ সময়কার সাংগঠনিক কাজের পদ্ধতির মধ্যে নিরূপণে স্তালিন প্রায়সই সীমারেখা টানেন নি। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেসের (১৯১৯) কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে লেনিন বলেছেন "সর্বহারা বিপ্লবের সর্বপ্রধান সমস্যাই হ'ল সংগঠনের সমস্যা। সংগঠনের প্রশ্নকে সর্বাধিক গুরুত্ব এখানে অকারণে দেওয়া হয় নি। সাধ্যমত সর্বশক্তি দিয়ে দৃঢ়তা এবং প্রত্যয়ের সাথে এই প্রশ্নে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। দীর্ঘদিনের শিক্ষা এবং অনুশীলন ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে বিপ্লবী হিংসা ও একনায়কত্বের অপপ্রয়োগ হতে পারে। আমি এই অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে এই কঠিন হুঁশিয়ারী দিতে চাই। বিপ্লবী হিংসা ও একনায়কত্ব চমৎকার ব্যাপার যখন তা সঠিক রাস্তায় সঠিক লোকের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তা সংগঠনের ক্ষেত্রে কখনই ব্যবহৃত হতে পারে না।" (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৯, পৃঃ ১৬২) লেনিনের এ নির্দেশ স্তালিন সব সময় মেনে চলেন নি। নতুন সংবিধানের

খসড়া আলোচনার জন্য ১৯৭৭-এর মে মাসে সি পি এস ইউর কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক বিধির অযৌক্তিক, প্রতিশোধমূলক হিংসা আমদানী করার অন্ধকারাচ্ছন্ন কয়েকটি বছর, বিষয়ে আলোচনায় কমরেড এল, আই ব্রেজনেভ ঘোষণা করেন : "এটা সাংবিধানিক ধারাকে নস্যাৎ করেই করা হয়েছিল। এ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করাকে পার্টি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে এবং এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি কখনই ঘটতে দেওয়া যায় না।"

আমাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিপূজা যে ক্ষতি করেছে তাকে অস্বীকার করা বা ছোট করে দেখা হবে অবাস্তব এবং অনৈতিহাসিক। ঠিক যেমন অনৈতিহাসিক ও অবাস্তব এটা বিশ্বাস করা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তার লক্ষ্য এবং অগ্রগতিকে বিপথচালিত করেছে কারণ দুটোই শেষ পর্যন্ত জনগণের সৃজনশীল ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল আর অক্টোবর বিপ্লব থেকেই দেশের জনসাধারণ ছিল সত্যিকারের বিপ্লবী ও ও সমাজতন্ত্রী। পার্টি সর্বদাই এই দৃষ্টিভঙ্গী লালন করেছে।

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণপর্বের বিভিন্ন জটিল অধ্যায় ও সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির ঐতিহাসিক প্রগতির বিশ্লেষণে কখনোই এমন বিকৃত বা নিছক অজ্ঞ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যার দ্বারা বলা যায় যে স্তালিনের কর্মধারায় সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন বিকলাঙ্গ হয়েছিল বা তাঁর কর্মকাণ্ড পার্টিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত করে অস্তিত্বহীন স্তালিনবাদে নিয়ে গিয়েছিল। "ব্যক্তিপূজার একটি নির্দিষ্ট সময়কে সোভিয়েত সমাজের ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টার লক্ষ্যই হ'ল নয়া সমাজব্যবস্থা বিকাশের বিষয়গত বৈজ্ঞানিক ধারণাকে কার্যত অস্পষ্টতার কুহেলিকাবৃত করা। স্তালিনের নাম ব্যবহার করে নিজেদের প্রভুত্ববাদী বৃহৎ উগ্রজাতিদম্ভ, বামপন্থী আমলাতন্ত্র এবং সামাজিক সমরবাদী কর্মনীতিকে যুক্তিযুক্ত বলে চালাবার স্তালিনের নাম করে মাওবাদী অপপ্রয়াসও কম ভিত্তিহীন নয়, যে নীতিগুলি সমাজতন্ত্রের স্বার্থে কখনই প্রয়োগ হতে পারে না, এবং আমাদের পার্টিও কখনই এমন নীতি গ্রহণ করে নি।

স্তালিনের সময়ে আমাদের পার্টি আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে লেনিনবাদী ধারাই প্রধানত অনুসরণ করেছে এবং মূল বিষয়াবলীর গুণাগুণ ও কার্যকরিতা লক্ষ্য করার জন্য তা সবসময়ই উৎসাহী জনগণের মধ্যেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সামাজিক ঐতিহাসিক উপাদানের দিক থেকে এ সময়টা 'ব্যক্তিপূজার কালপর্ব' নয়, নয়া সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার যুগ, প্রথমে আমাদের দেশ ও পরে ইওরোপ ও এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের যুগ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উন্মেষের যুগ। ব্যক্তিপূজা সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগত পরিণতিপ্রবণতার আরোহনে কোন পরিবর্তনই ঘটায় নি, যদিও এ সময়টা সমাজতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছুটা মন্থরতার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সে অগ্রগতিকে কখনই স্তব্ধ করে নি।

এর প্রমাণ হল ১৯৩৬ সালে প্রণীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান। সংবিধানের ইতিহাসে প্রথম জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের পূর্ণ বিচার-বিভাগীয় সমান অধিকার প্রবর্তন করল, সমস্ত রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বাতিল করল এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করল যা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাধীন নাগরিকদের নাগালের বাইরে। পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও নির্বাচনে গোপন ভোটব্যবস্থা চালু হল প্রতি স্তরে এবং নেতৃস্থানীয় প্রতিটি পার্টি-সংগঠনে, নিষিদ্ধ হল মনোনয়ন এবং তালিকা অনুযায়ী ভোট। এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সোভিয়েত বিরোধীরা প্রচার করে যে সে-সময় পার্টি অতি দ্রুতহারে শিল্পায়নের নীতি জোর করে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল আর তার ফলে জনগণের কষ্ট ও অসুবিধা হয়েছে। বিরাট চাপ পড়েছিল ঠিকই যখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ফেলে পরিস্থিতি ঘোরালো করতে চেয়েছিল এবং আমাদের দেশের জনগণের অনেক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের যথেষ্ট ঘাটতির অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত জনগণ সচেতনভাবে স্বাধীনতা, মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য আত্মবলিদান করেছে। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে জয়লাভ, দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রমাণ করেছে যে ঐ আত্মত্যাগগুলি বৃথা যায় নি।

আমাদের তিরস্কার করা হয় যে সমাজতান্ত্রিক ধারায় দেশে জোর করে কৃষি পুনর্গঠিত করা হয়েছে। কিন্তু তারা ইচ্ছে করেই বলে না যে যৌথকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র জন্মানোর প্রথম দিনগুলিতেই এবং পঞ্চাশ বছর আগে (১৯২৯) "বিপুল পথের ধাক্কা" ও কৃষকদের যৌথখামারে সমূহতা প্রত্যাবর্তন ছিল গ্রামীন মেহনতী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দীর্ঘ রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির ফল, যারা দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ধনতান্ত্রিক শৃঙ্খলের দুঃস্থ অভিজ্ঞতার মধ্যে আর থাকতে চাইল না।

এটা ছিল জনগণের আন্দোলন কারণ "নিযুত নিযুত জনগণ কখনোই পার্টি-গুলির উপদেশে কর্ণপাত করবে না যদি সেই উপদেশ তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ না খায়" (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪১৫)। এ প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই অনেক ভুল হয়েছে। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী জনগণ এখানে সেখানে মধ্যচাষীদেরও কুলাক, এমনকি ধনতন্ত্রী শক্তি হিসাবে চরিত্রায়িত করেছে। কিন্তু এই বিচ্যুতি প্রকাশ্য করে পার্টি ঐ দোষীদের সমাজতন্ত্রের শত্রু হিসাবে নিন্দিতও করেছে।

স্তালিন পার্টিবিরোধী গোষ্ঠীগুলির ও প্রবণতার অনেক প্রাক্তন ও কাল্পনিক ব্যক্তিদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য দোষী। পঞ্চাশ দশকে, মাত্রাতিরিক্ত-ভাবে শাস্তিভোগী ও দণ্ডভোগী অনেকেই পুনর্বাসন পেয়েছেন ; যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন ও সমাজতান্ত্রিক ন্যায়াধিকার লঙ্ঘন করেছিলেন তাদের কঠোর শাস্তিদান হয়েছিল। কিন্তু তার মানে যারা অন্তর্ঘাত ও সোভিয়েত-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার কথা পর্যন্ত বলেছিল, সচেতন ট্রটস্কিপন্থী দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকারী ও জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক নির্দোষ ঘোষণা করা হয় নি, আমাদের পার্টি সর্বদাই সদাজাগরূকভাবে মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ঐক্যকে রক্ষা করেছে ও করছে এবং কখনোই কর্মীদের মধ্যে 'মতাদর্শগত বহুমত" অনু-মোদন করবে না।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের নতুনত্ব, অসাধারণত্ব এবং অভূতপূর্ব চরিত্র ও বিস্তৃতি, পুঁজিতন্ত্র তাদের যে ক্ষমতার বিকাশ হতে দেয় নি নিযুত নিযুত মেহনতী জনগণকে সেই সক্রিয় সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করানো, এসবই জটিল ও সংঘাতপূর্ণ ঘটনা। নতুন সমাজগঠন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ভ্রান্তিগুলি সমাজতন্ত্রের শত্রুরা বিষায়িত করে তোলে এবং সামাজিক পাপ হিসাবে তুলে ধরে। লেনিন এইসব আক্রমণের যোগ্য জবাব দিয়েছেন। অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকীতে তিনি লিখলেন : "মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলতে পারি না যে আমরা অসংখ্য ভুল করেছি ও করছি ও আমাদের অসংখ্য বিপর্যয় হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এত নতুন এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রকাঠামো গড়তে গেলে ভুল ও বিপর্যয় কি করে এড়ানো যাবে" (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৫৪-৫৫)।

লেনিন আরও বলেছেন যে আমরা আমাদের ভুলগুলি স্বীকার করতে ভীত

নই এবং আমরা আবেগহীনভাবে এই ভুলগুলির মূল পরীক্ষা করে দেখবো। (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৫৭) অর্থপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত আত্মসমালোচনা, পার্টি কর্তৃক তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও বাস্তব পদক্ষেপগুলিকে জনগণের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নেওয়া, লেনিনবাদী নীতিতে অবিচল থেকে পার্টি কর্তৃক কখনও কখনও তার রণকৌশলকে খাপ খাইয়ে নেওয়া—এইগুলিই হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা ও সজীবতার প্রধান গ্যারান্টি।

অনুবাদ—রতন বসু মজুমদার

(কমিউনিস্ট, ১৮, ১৯৭৯—সম্পাদকীয়)

["সোভিয়েত ইউনিয়ন : থিওরি এ্যাণ্ড প্র্যাকটিস", জুন, ১৯৮০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

টীকা

১ লেনিনের 'কংগ্রেসের প্রতি চিঠি' ও তার বস্তুগত সংযোজক, অনুলেখনধৃত শেষ রচনাগুলির কথা এখানে বলা হচ্ছে। সেই সময়ে, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২২ থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, লেনিন গুরুতরভাবে অসুস্থ। তাঁর অসুস্থতার কথা সম্যক উপলব্ধি করে লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে এ রচনাবলী রাজনৈতিক নির্দেশাবলী হিসাবে কাজ করবে। 'কংগ্রেসের কাছে চিঠি'তে তিনি ট্রটস্কিকে 'অ-বলশেভিকবাদ'-এর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কথাই বলেছেন এবং লিখেছেন যে ট্রটস্কি এমনই এক ব্যক্তি যিনি "অতি-মাত্রায় আত্ম-বিশ্বাস দেখান ও বিশুদ্ধ প্রশাসনিক কাজকর্মে নিয়োজিত থাকেন।" কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মূল্যায়নের মধ্যে স্তালিন চরিত্রায়নও করেন লেনিন। স্তালিনকে পার্টির অসামান্য ব্যক্তিদের অন্যতম মান্য করে লেনিন তাঁর দোষগুলিও বলেন: "কমরেড স্তালিন সাধারণ সম্পাদক হবার পরে নিজের হাতে সীমাহীন কর্তৃত্ব নিয়েছেন এবং আমি নিশ্চিত নই যে তিনি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে সর্বদাই ঐ কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে পারবেন।" লেনিন অনুভাবিত করেছিলেন "এমন একজনকে স্তালিনের স্থলাভিষিক্ত করতে যিনি তার অন্যান্য গুণসমন্বিত অথচ অন্যরূপে

হবেন, যেমন আরো বেশী সহনশীল, অনুগত, নম্র ও কমরেডদের প্রতি বেশী বিবেচনাবান এবং কম খেয়ালী হবেন।"

লেনিনের মৃত্যুর পরে ১৩শ পার্টি কংগ্রেসে (১৯২৪), ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর হল, তখন প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে লেনিনের চিঠিগুলি আলোচনা করেন। লেনিনবাদের উপর ট্রটস্কিবাদী আক্রমণ প্রতিহত করায় স্তালিনের বিশেষ ভূমিকা ও পার্টির মধ্যে তাঁর সম্মানের কথা এবং লেনিনের সমালোচনা তিনি মনে রাখবেন এ সমস্ত বিচার করে প্রতিনিধিবৃন্দ স্তালিনকে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

সি পি আই—সি পি এম ঃ মৈত্রীর সমস্যা

অসীমেশ গোস্বামী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি, আই) সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. এম.) রাজনীতি, রণনীতি এমনকি মতাদর্শগত প্রশ্নেও মতবিরোধ রয়েছে। তাহলে ভারতে বর্তমানে বামপন্থী ঐক্য বা বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভবিষ্যৎ কি একেবারেই অন্ধকার ? এই প্রশ্নে পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছিলেন (কালান্তর, ৬-২-১৯৮০) তাহল এই যে "যেসব মতপার্থক্যের মীমাংসা করা যাচ্ছে না সেগুলি যাতে প্রধান প্রধান প্রশ্নে পরস্পরের কাছে আসার প্রক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।"

বলা যেতে পারে যে সি পি আইয়ের কাছে পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাওয়ের উপরোক্ত বক্তব্যটি সি পি এম সম্পর্কিত নির্দেশক-নীতির সামিল। ঐ নির্দেশনাটি মনে রেখে আলোচ্য দুই পার্টির সমকালীন মতৈক্য এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলি খতিয়ে দেখা এবং দুই পার্টির মধ্যে সংগ্রামী মৈত্রীর সমস্যাটি আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মতৈক্যের ক্ষেত্র :

(১) রাজনৈতিক লাইন বা রণকৌশল গ্রহণের প্রশ্নে দুই' পার্টি উল্লেখযোগ্য ভাবে কাছাকাছি আসতে পেরেছে। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেস-গুলিতে দুই পার্টিই কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তব্য বা লক্ষ্য নির্ধারণের প্রশ্নে পৃথক পৃথকভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এ সম্পর্কে সি পি আইয়ের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে "বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্পই হচ্ছে একমাত্র জাতীয় বিকল্প যা আমাদের দেশ ও জনগণকে বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে···। এই পরিপ্রেক্ষিতকে বাস্তব করে তুলতে হলে জনতা দলের শাসন চলতে থাকা বা কংগ্রেসের শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাধা করতে হবে। ভারতের জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশ বর্তমানে এই পরিপ্রেক্ষিতকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতকে বাস্তব করে তোলাকেই

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আগামী দিনে তার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছে।" (রাজনৈতিক প্রস্তাব, পৃ-২৩)।

সি পি এমের রাজনৈতিক প্রস্তাবেও বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কর্মসূচী-ভিত্তিক ঐক্যকেই বুর্জোয়া শাসনের "প্রকৃত বিকল্প" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৮ সালে যে সময়ে পার্টি দুটির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিবর্তে বুর্জোয়াদের অপর একটি জগাখিচুড়ী অর্থাৎ জনতা দল ক্ষমতায় আসীন ছিল। সি পি এম নেতারা জনতা দলের অর্থ-নৈতিক, শ্রমসংক্রান্ত নীতি ও বৈদেশিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সি পি এম কংগ্রেস (ই) তথা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী একটি ব্যাপক রাজনৈতিক মোর্চার আহ্বান জানায়। (Political Resolution, পৃঃ ৩৮) স্বৈরতন্ত্রবিরোধী এই ধরনের মোর্চায় যেহেতু শাসক জনতা দল অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই কারণে জনতা সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে সি পি এমের সংগ্রাম শুধুমাত্র কাগুজে সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। জনতা সরকারও সি পি এমের রাজনৈতিক সমর্থন উপভোগ করে।

অন্যদিকে সি পি আই যে ঐক্যের ডাক দেয় তা নিছক কংগ্রেস (ই) ও জনতা দল-বিরোধী তথা সাম্প্রদায়িক-প্রতিক্রিয়া বিরোধী ঐক্য নয়। এটা এমনই একটি ঐক্য যা স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তি—দুয়েরই বিরুদ্ধে দেশের সামনে একটি তৃতীয় বিকল্পের পথ দেখায়। জনতা সরকারের সঙ্গে সি পি এমের রাজনৈতিক সহযোগিতা চলতে থাকায় সি পি এমের নীতি কার্যত বামপন্থী-গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের পথে একটি "বড় বাধা" হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেসী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, জনতা দলের সঙ্গে সি পি এমের মৈত্রী একটা "রণকৌশল" মাত্র—সি পি এমের এই সাফাই একেবারেই অযৌক্তিক বলে সি পি আই ঘোষণা করে যে "আমাদের দেশে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এক বুর্জোয়া দলের বিরুদ্ধে আর এক বুর্জোয়া দলের উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রকেও রক্ষা করা যায় না, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করা যায় না। স্বৈরাচারের কৌকের জন্মই হয় ধনবাদী বিকাশের পথ থেকে, তার সংকট থেকে এবং ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়া ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা থেকে। স্বৈরাচারের বিপদকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা যায়, একমাত্র যদি দেশের বামপন্থী শক্তিসমূহ একজোট হয়, এবং একটি বাম ও গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্প গড়ে তোলে।" (প্রস্তাব, পৃঃ ২৭)

দেশের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্যক উপলব্ধি-প্রসূত সি পি আইয়ের উপরোক্ত বক্তব্য কতখানি সঠিক ছিল—তা জনতা সরকারের পতনসংক্রান্ত ঘটনাবলী থেকেই প্রমাণিত হয়।

জনতা দল বা সরকার সম্পর্কে সি পি এমের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়। স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তি—উভয়েরই বিরুদ্ধে সি পি আই-সি পি এমের সংগ্রামী সহযোগিতা গড়ে ওঠে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে—সর্বত্রই এই সহযোগিতা ক্রমশ বিকশিত হয়। দেশের সকল প্রকৃত বামপন্থী শক্তিগুলি এবং মেহনতি মানুষ এই সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়।

সুতরাং ইন্দিরা-কংগ্রেস সম্পর্কে সি পি আই এবং জনতা দল সম্পর্কে সি পি এমের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই যুক্তিসংগত ও বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাম্প্রতিককালে দুটি দলের রাজনীতিতে মৈত্রীর সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। বিগত লোকসভা ও ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনগুলিতে সর্বত্র সি পি আই-সি পি এম একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। সম্প্রতি (অগাস্ট, ১৯৮০) রাজধানীতে ঐ দুই দল যুক্তভাবে আন্দোলনের সূচনা করেছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ও নারী নিগ্রহের প্রতিবাদে।

(২) প্রত্যেকটি পার্টির কর্মসূচীতে তার রণনীতিগত লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে। এই লক্ষ্য হল : সি পি এমের কর্মসূচীতে, জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করা। সি পি আইয়ের কর্মসূচীতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবর্তে জাতীয় গণতন্ত্র এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত মোর্চা দুটির নামকরণ যাই করা হোক না কেন—জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচী—দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মৈত্রীর পক্ষে তা কিছুতেই বাধা হতে পারে না। কেননা সি পি আই ও সি পি এম উভয়েরই মতে প্রস্তাবিত ফ্রন্টের দৃঢ়ভিত্তি হল, শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অপসারণের জন্য যে ব্যাপক সংগ্রামী মোর্চা গঠনের কথা বলা হচ্ছে তাতে কি জাতীয় বুর্জোয়াদের কোনো অংশকে স্থান দেওয়া হবে? এ প্রশ্নে দুই পার্টির কর্মসূচী ইতিবাচক সম্মতি ঘোষণা করেছে। পার্টি ভাগের পরে সি পি এমের ৭ম পার্টি কংগ্রেসে (১৯৬৯, কলিকাতা) গৃহীত কর্মসূচীর ১০৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বাকি ব্যাপক অংশ, যাদের বিদেশী একচেটিয়াদের সঙ্গে একেবারেই কোনো সংযোগ নেই

কিংবা সংযোগ থাকলেও তা স্থায়ী নয়, যারা নিজেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে না এবং একচেটিয়া কারবারীদের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হয়ে থাকে···জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় তারাও সামিল হতে পারে।"

সি পি আইও কর্মসূচীর ৭৭ নং ধারায় এই প্রসঙ্গে অনুরূপ অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়াপতি-বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রস্তাবিত মোর্চায় (এ ক্ষেত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা) সামিল করার আহ্বান জানিয়েছে।

বিপ্লবের স্তর যে গণতান্ত্রিক এ বিষয়ে দুটি পার্টিই একমত। এস ইউ সি, আর এস পি প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে এখানেই কমিউনিস্টদের একটি প্রধান পার্থক্য—কেননা এই দলগুলি মনে করে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর উপস্থিত।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তাবিত মোর্চার নেতৃত্ব সম্পর্কে কর্মসূচী দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, সি পি এম মনে করে যে "এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর অধি-নেতৃত্বে।" (কর্মসূচী, ৯৬ ধারা) অন্যদিকে সি পি আইয়ের মতে, "কৃষক ও বিপ্লবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই পরিচালিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জন্ম নেবে। ···এই মৈত্রীর নেতৃত্ব থাকবে দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের হাতে।" (কর্মসূচী, ৮০ ধারা)

গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বের প্রশ্নে এই মতবিরোধ সত্ত্বেও এই দুটি পার্টি বর্তমান পর্যায়ে রাজনীতিতে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মেহনতি মানুষের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে। বুর্জোয়া শাসনের একমাত্র প্রকৃত বিকল্প—বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যগঠনের সংগ্রামে দুই পার্টি নিশ্চয়ই একযোগে কাজ করতে পারে।

মতাদৈক্য ঃ

১৯৬৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে না যে দুই পার্টির দুই কর্মসূচীর মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকা সত্ত্বেও পার্টি দুটির মধ্যে বিভেদ ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। ফলে ভারতীয় বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতি হয়। ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষও কম হয় না।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কি করে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হল ? মতাদর্শগত প্রশ্নে মতবিরোধ অবশ্যই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে। চীনের মাওবাদী পার্টির কার্যকলাপ এবং বিভেদপন্থী আচরণ (যেমন, ১৯৬২'তে ভারত আক্রমণ এবং পার্টি নেতৃত্বের একটি অংশকে সি পি আই থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উস্কানী) ১৯৬২-৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখনকার মত মাওবাদীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সি পি আইয়ের একটি অংশ পার্টি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে সি পি এম গঠন করলেন—মতাদর্শের প্রশ্নে তাঁদের মাওবাদী অবস্থান সমর্থন এবং সেইসঙ্গে সোভিয়েত-বিরোধিতা ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যেকার মতবিরোধের তীব্রতাকে প্রচণ্ড-ভাবে বাড়িয়ে তোলে। ফলে অ-বৈরীতামূলক দ্বন্দ্ব কার্যত বৈরীতাপূর্ণ দ্বন্দ্বে পরিণত হয় যা শুধু পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। বলাই বাহুল্য, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা এবং শোষকশ্রেণীগুলি কমিউনিস্ট গৃহবিবাদের এই সুবর্ণ সুযোগটির সদ্ব্যবহারে নিজেদের নিয়োজিত করতে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করে নি।

সি পি এম নেতৃত্ব প্রথমদিকে (১৯৬০-এর দশকে) স্পষ্টতই চীনের পার্টির ক্ষতিকারক প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উগ্র মাওবাদীরা সি পি এম থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও পার্টির মধ্যে অন্ধ সোভিয়েত-বিদ্বেষ ও সেইসঙ্গে সি পি আই বিরোধিতার বীজ থেকে যায়।

১৯৭০-এর দশকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলিতে (অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি বিসাউ, চিলি, বাংলাদেশ ইত্যাদি) মাওবাদী চীনের সাম্রাজ্যবাদ-সহায়ক বিশ্বাসঘাতী ভূমিকা এবং তার বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপ্লবী কার্যকলাপ—এককথায় চলতি দুনিয়ার বাস্তবতা সি পি এমের মতাদর্শগত অবস্থান পুনরুদ্ধারে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক ও মতাদর্শগত প্রশ্নগুলিতে এযাবৎ সি পি এমের কোনো পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন অবস্থান ছিল না। ফলে প্রায়শই আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি সি পি এম হয় এড়িয়ে যেতে চেয়েছে অথবা, চীন ও সোভিয়েত থেকে তথাকথিত "সমদূরত্বের" পলিসি নিয়ে চলেছে।

কিন্তু যত দিন যায়, মাওবাদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী আগ্রাসী চরিত্র আরও নগ্ন হয়ে ফুটে ওঠে। ১৯৭৯ সালে মাওবাদী চীন

সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। শেষপর্যন্ত গণচীনের বর্তমান মাওবাদী শাসক পার্টি ও সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই মার্কিন, জাপানী ও পশ্চিম জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে চক্রান্ত শুরু করেছে। এ হেন অবস্থায় সি পি এম মাওবাদী চীনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অধিকতর কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি পিপল্‌স ডেমোক্রেসী (সি পি এমের কেন্দ্রীয় মুখপত্র) চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনেক সঠিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছে। এই সকল প্রবন্ধে শুধু "মাও-সে-তুঙ-এর চিন্তাধারা'র সমালোচনা হয়েছে তাই নয়। স্বয়ং মাও-সে-তুঙও রেহাই পান নি। চীনের বর্তমান পার্টি-নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে চীনের বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য সব দোষ-দায়িত্ব শুধু লিন পিয়াও ও চারচক্রের ঘাড়ে চাপানো চলবে না। ভ্রান্তিগুলির উৎস সন্ধান করতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রধান বিভেদপন্থী-প্রবণতা মাওবাদ সম্পর্কে সি পি এমের বহুপ্রতীক্ষিত সমালোচনা সত্ত্বেও চীনের নয়া-মাওবাদী শাসক পার্টির সঙ্গে হঠাৎ নতুন করে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সি পি এম নেতৃত্বের ব্যস্ততা কমিউনিস্টদের মধ্যে পুনরায় সন্দেহ সৃষ্টি করবে।

মতাদর্শের ক্ষেত্রে সি পি এমের এই দোদুল্যমানতার মূলে হল মাওবাদ সম্পর্কে ইতিহাসগত, বস্তুগত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অভাব। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে সি পি এম ক্রমেই বেশী বেশী মাওবাদের সমালোচনা করতে শুরু করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শ ও নীতিতে অবিচল সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং সোভিয়েত পার্টি সম্পর্কে সি পি এমের পুরোনো নেতিবাচক মনোভাব আজ বহু পরিমাণে অতিক্রান্ত হয়েছে।

ফলে সি পি আই—সি পি এমের মধ্যে মতাদর্শগত মতানৈক্যের ব্যবধানে ক্রমশ কমে আসতে শুরু করেছে। সমাজতন্ত্র-মুখীন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে কর্মসূচী দুই পার্টি পৃথক পৃথকভাবে ১৯৬৪ সালে গ্রহণ করেছে—আগেই তা আলোচনা করা হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে জাতীয় বুর্জোয়াদের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে দুই পার্টির অবস্থান আমরা জানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সি পি আই জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা যান্ত্রিকভাবে অতিরঞ্জিত করে দেখে এবং সত্তরের দশকের প্রথমে 'দক্ষিণ প্রতিক্রিয়া'কে

রুখবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে গা ভাসিয়ে ছিল। অন্যদিকে সি পি এম স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে 'গণতন্ত্র'-বিরোধী সংগ্রামে 'গণতন্ত্র' রক্ষার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীরই সঙ্গে (এ ক্ষেত্রে জনতা পার্টি) একত্রে রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তুললো।

তাহলে কি বলতে হবে যে দুই পার্টিই নিজ নিজ কর্মসূচীগত অবস্থান থেকে সাময়িকভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল?

সি পি আইয়ের একাদশ পার্টি কংগ্রেসে এই প্রশ্ন গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। ঐ কংগ্রেসের দলিলেই (রাজনৈতিক পর্যালোচনা) স্বীকার করা হয়েছে যে সি পি আই সাময়িকভাবে নিজ কর্মসূচী থেকেই সরে গিয়েছিল। জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল সম্ভাবনাটিকে বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল। সি পি এমও জনতা পার্টির সঙ্গে রাজনৈতিক মোর্চাবদ্ধ হয়ে অনুরূপ ভুল করে। জনতা সরকারের কার্যকলাপই প্রমাণ করে দেয় যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনতা দলের উপর নির্ভর করে গণতন্ত্র রক্ষা বা স্বৈরতন্ত্র-প্রতিহত করা কোনোটাই করা সম্ভব নয়। সি পি এম-নেতৃত্ব যদি তাঁদের এই ভ্রান্তিটি—যা তাঁদের নিজ কর্মসূচীগত অবস্থান থেকে নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর বিচ্যুতি—স্বীকার করে নিতেন তাহলে খুবই ভালো কাজ করতেন।

যাই হোক—আজ প্রায় দু' দশক হতে চললো—ভারতের বিখণ্ডিত কমিউনিস্ট আন্দোলন আবার কাছাকাছি আসতে আরম্ভ করেছে। নীতিনিষ্ঠ ভিত্তিতে যতদ্রুত ভারতে এই দুই পার্টির মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠবে—ভারতীয় শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির দিন ততই উজ্জ্বল হবে। ভারতীয় বিপ্লবের কাছে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি হল: মেহনতি মানুষের স্বার্থে এই দুটি পার্টি একযোগে চলবে কিনা; বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত থেকে ভারতীয় বিপ্লব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী মাওবাদীদের মোকাবেলা করবে কিনা; ভারতে সব ধরনের বুর্জোয়া শাসনের অপসারণের জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী এবং স্বৈরতন্ত্র—সাম্প্রদায়িকতা—বিচ্ছিন্নতাবাদ-বিরোধী সমস্ত বামপন্থী ও গণ-তান্ত্রিক শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হবে কিনা।

এই সব প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার পূর্বসর্ত হল—সি পি আই ও সি পি এমের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং চিরায়ত নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সৎ প্রচেষ্টা চালানো।

চীন-প্রসঙ্গ ও সি পি এম

ভানুদেব দত্ত

কিছুকাল ধরে সি পি আই-সি পি এমের মধ্যে কাছাকাছি আসার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি এক উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। তবে এই বোঝাপড়া গড়ে উঠছে প্রয়োগধর্মিতার তাড়নায়।

সি পি আই-সি পি এমের বিগত পার্টি কংগ্রেসের পরে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যুক্ত আন্দোলন গঠন করার সংকল্প এক যৌথ বিবৃতিতে ঘোষিত হয়েছিল। অতীতে তীব্র মতান্ধতা, বিষয়ীমুখিনতা (subjectivism) ও পেটিবুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী উভয় পার্টিকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং যার ফলে যুক্ত আন্দোলনের প্রবণতা অতীতে কিছুতেই এক সুস্পষ্ট গতিমুখ পাচ্ছিল না, ঘোষিত ঐ যৌথ বিবৃতির পর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির দাবিতে যুক্ত আন্দোলন, মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি ঘটনাগুলি খুবই আশাব্যঞ্জক—সন্দেহ নেই। তবে ইতিবাচক এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি উভয় দলের কিছু কিছু অংশের মধ্যে নেতিবাচক ঝোঁকগুলিরও পুনরাবির্ভাব ঘটছে—এই বিষয়টি স্মরণে রাখা দরকার।

সি পি এমের একাংশের মধ্যে সাধারণভাবে চীন কর্তৃক অনুসৃত 'সাধারণ লাইন'এর প্রতি ঝোঁক আজও রয়েছে। তবে সি পি এমের মধ্যে নতুনত্ব হল—বহু বিষয়ে চীনের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ যা সি পি আইয়ের অবস্থানের কাছাকাছি।

সি পি আই-সি পি এম দুই পার্টির মধ্যে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মত-পার্থক্যের দুটি প্রধান বিষয় ছিল—ইন্দিরা গান্ধীর শাসন ও এর প্রতি সি পি আইয়ের মনোভাব এবং চীনের ভূমিকা ও এর প্রতি সি পি এমের মনোভাব।

ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের প্রতি মোহ এবং এ সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস —সি পি আইকে বহুদিন গ্রাস করে রেখেছিল। সি পি আই সেই

মনোভাবকে বিগত ভাতিণ্ডা পার্টি-কংগ্রেসে দৃঢ়ভাবে আত্মসমালোচনা করে বর্তমানে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। মতপার্থক্য নিরসনের ক্ষেত্রে এটি এক বড় পদক্ষেপ।

কিন্তু সি পি এম চীনের ভূমিকার সমালোচনা করলেও, তাঁদের পক্ষ থেকে নিজেদের পূর্বতন চিন্তাভাবনা ও অবস্থানের আত্মসমালোচনার কোন নজীর পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা বোঝাতে চাইছেন 'চীনের বিচ্যুতি ১৯৬৫ সালের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে' (Falsification of History to Cover up Mistakes by Harikishan Singh Surjeet—People's Democracy 27. 7. 80)। অর্থাৎ এর আগে পর্যন্ত চীনের মধ্যে বৈপ্লবিক চরিত্র পূর্ণ মাত্রায় ছিল এবং ১৯৬৩ সালের ১৪ই জুনের চিঠি ছিল চীনের এক সঠিক অবস্থান। তাহলে সি পি এমের মতে চীন তার 'সাধারণ লাইন' নিয়ে মাত্র দেড় বছর ঠিকভাবে চলেছিল। এর পর 'সাধারণ লাইন'টি ঠিক থাকলেও, চীন ভিন্ন পথে চলে যায়। প্রশ্ন থেকে যায় চীনের 'সাধারণ লাইন' কি তাহলে চীনেও বর্তমানে পরিত্যক্ত? নাকি চীনের বর্তমান ভূমিকা সেই "সাধারণ লাইনের" অনুসারী?

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনের কার্যকলাপ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক নম্বর শত্রু গণ্য করা, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নিজের অবস্থানকে নিয়ে আসা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকামী বিভিন্ন দেশের বিরোধিতা করা, ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবিদ্বেষকে মদৎ দেওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী শুধুমাত্র ভ্রান্ত নীতির ফল নয়। এগুলি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এ হল ভ্রান্ত তত্ত্বের পরিণাম। প্রতিটি ঘটনার পিছনে যেমন তাৎক্ষণিক কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে, তেমনি এর গভীরে এক তত্ত্বও কাজ করে। সি পি এম তাৎক্ষণিক কার্যকারণ সম্পর্কে সমালোচনা করলেও, সেগুলি কোন্ তত্ত্ব-প্রসূত, এব্যাপারে কোন অনুসন্ধানের তাঁরা চেষ্টা করছেন না। এই আত্মসমীক্ষা বা আত্মসমালোচনার রাস্তায় না যাওয়ার জন্য বারবার তাদের মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দিচ্ছে।

সেই কারণেই আমরা দেখি চীনের বর্তমান ভূমিকাকে সমালোচনা করতে গিয়ে সি-পি-এমকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে চীনের পার্টির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী ঐতিহ্যের অবতারণা করতে হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে গুরুতর বিচ্যুতিকে কেবলমাত্র 'ভ্রান্ত নীতি' বলে লঘু করে দেখাবার একটা প্রচেষ্টা থেকে যায়। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, চীন

সম্পর্কে ফেলে আসা চিন্তার অবশেষ এখনও সি পি এমের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে যা কিনা সি পি আই-সি পি এমের মধ্যে মতপার্থক্য নিরসনের পথে এক বড় অন্তরায়।

বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর স্রোত যেদিকে এবং এই স্রোত-ধারায় বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বড় বড় দেশগুলি যেভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে—তাতে চীনের অবস্থানের মধ্যে যে কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই, একথা সি পি এমও স্বীকার করে। যেমন তাদের পলিটব্যুরো নেতা হরিকিশেন সিং সুরজিৎ বলেছেন, "যখন চীনের নেতৃত্ব ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক দলিলের স্বীকৃত ধারণা থেকে সরে আসতে আরম্ভ করল, আমরা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গকে যেসব বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেছি, তা হল—তিন দুনিয়ার তত্ত্ব; সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ বলে গণ্য করা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে তাকে প্রধান শত্রু মনে করা; আঙ্গোলা, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করা; চিলির ফ্যাসিস্ত পিনোচেতের স্বৈরনায়কতন্ত্রী শাসন ও জায়রের (Zaire) মবুতুর শাসনকে সমর্থনদান; ভিয়েতনামের উপর আগ্রাসন এবং কাম্পুচিয়ার পল্‌পত্‌কে ক্রমাগত সমর্থনদান; ন্যাটো ও জাপানের সামরিক প্রস্তুতিকে সমর্থনদান ইত্যাদি" (Why is the CPI so Perturbed by Harikishan Singh Surjeet—People's Democracy 13. 7. 80)।

এই উদ্ধৃতি থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে সি পি এমের মতে চীন সমাজতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, শান্তি, গণতন্ত্র এগুলির বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। অর্থাৎ চীনের ভূমিকা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।

কেবল তাই নয়, চীনের কার্যকলাপ যে সাম্রাজ্যবাদী রণকৌশলকে সাহায্য করছে এ স্বীকৃতিও সি পি এম পলিটব্যুরোর বক্তব্যে রয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তরফ থেকে 'সল্ট' চুক্তি অনুমোদনের অস্বীকৃতি, ইওরোপে নতুন ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণ, পশ্চিম এশিয়াকে রণক্ষেত্রে পরিণত করার প্রস্তুতি, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করা, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে থাইল্যাণ্ডকে ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম পলিটব্যুরো দুঃখ করে বলেছে, "…সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ

দেখার পরিবর্তে, চীনের নেতৃবর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ষণ করে চলেছে যাতে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল এগিয়ে চলে" (PB on current situation—People's Democracy 17. 8. 80)।

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ভূমিকা পালন করার পরও সি পি এম যদি চীনের ভূমিকার জন্য কেবলমাত্র দুঃখপ্রকাশ করে, তবে সি পি এমের এই ভূমিকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দলিল বারো ও একাশী পার্টির সিদ্ধান্ত থেকে চীন সরে এসেছে এরকম স্বীকৃতি সি পি এমের তরফ থেকে দেওয়ার পরও তাঁরা চীনের ভূমিকাকে সামগ্রিকভাবে দেখছে না। চীনের এই ভূমিকার পিছনে এক ইতিহাস আছে, এক তত্ত্ব আছে—যেটা তারা বুঝতে চাইছে না।

সি পি এম কিছুতেই এই জায়গায় পৌঁছতে পারছে না বলে ভিয়েতনামের উপর চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে, আফগান বিপ্লবের বিরুদ্ধে চীনের ভূমিকা ইত্যাদি ঘটনায় তাঁরা কেবলমাত্র প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে তাদের কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখছে।

চীনের বিপ্লববিরোধী ভূমিকা বস্তুত ১৯৬৩ সালের ১৪ই জুন চিঠির অনুসারী—এই মূলকথাটা সি পি এমকে বুঝতে হবে। ১৪ই জুন চিঠির মূলকথা হল—(ক) এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সর্বত্রই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বিদ্যমান; (খ) বিশ্বের মূল বিরোধ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্র নয়, সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম (গ) জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠী সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই (ঘ) জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-পুঁজিবাদী পথ সম্পর্কে উল্লেখ নেই।

এসবই বারো ও একাশী পার্টি দলিলের বিরোধী। সি পি এম যদি বলে যে এ ৩'টি দলিল থেকে চীনের বিচ্যুতি ঘটেছে, তাহলে তাঁদেরকে স্বীকার করে নিতে হয় ১৪ই জুনের চিঠিটাই ভ্রান্ত। কিন্তু সে স্বীকৃতি কই?

অথচ এই চারটি মূল বক্তব্যের প্রথম তিনটির সঙ্গে সি পি এমের বিরোধ বর্তমান। বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নে দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিরোধই হল একালের মৌল বিরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ায় গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছে, ইত্যাদি সি পি এম মেনে নিয়েছে। এগুলি মেনে নেওয়ার পর ১৪ই জুন চিঠির মূলকথাগুলির

একটিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেটি হল "জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-পুঁজিবাদী পথের" ধারণা। এরই জন্য কি সি পি এম আজও চীনের "সাধারণ লাইন" ধরে আছে?

এই চারটি মূল বিষয় ছাড়াও, আরো কয়েকটি বিষয় রয়েছে। যেমন—শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধ ও শান্তি। এ দু'টি প্রশ্নে তাঁদের যে অবস্থান, তাও ১৪ই জুন চিঠির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ধারণা সম্পর্কে সি পি এমের অবস্থান শুরুতে ১৪ই জুনের চিঠির মত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তকালে এর পরিবর্তন ঘটে! এ বিষয়ে পরিবর্তিত অবস্থান হল, (ক) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দ্রুত বিকাশের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে পারছে। (খ) এই সাহায্য মূলধনী সামগ্রী ও প্রযুক্তিবিদ্যা সরবরাহে সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে পারছে। সি পি এম মনে করে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার এই ঘটনা দুই দুনিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে আরো বৃদ্ধি করছে (সি পি এমের দশম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব)। আগের অবস্থা থেকে এটা নিশ্চয়ই এককদম অগ্রগতি। কিন্তু পূর্বতন অবস্থানের পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল কেন, তার কোন ব্যাখ্যা এর মধ্যে নেই।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি সম্পর্কেও চীনের পার্টির সঙ্গে সি পি এমের গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য রয়েছে। চীন যেখানে দেঁতাতকে পুরোপুরি আক্রমণ করে চলেছে সি পি এম সেখানে হেলসিঙ্কি সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় অধিকাংশ ঘটনায় চীনের ভূমিকা সি পি এমের কাছে গ্রহণীয় হচ্ছে না এবং ১৪ই জুনের অধিকাংশ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিতে যেমন: যুগের সংজ্ঞা, এর প্রধান বিরোধ, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়ে সি পি এম বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করছে। এহেন পরিস্থিতিতে চীনের ১৪ই জুন চিঠির "সাধারণ লাইন" যে ভ্রান্ত এটা স্বীকার করতে এত দ্বিধা হচ্ছে কেন?

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে যে, চীনের রাজনীতিতে বিপরীত-ধর্মী দুই চিন্তাধারার লড়াই বরাবর চলে এসেছে। এ দু'টি হল—মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তাধারা এবং পেটিবুর্জোয়া

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা। প্রথম চিন্তাধারার শরিক ছিলেন—লি-তা-চাও, চু চিউ পো, পেং পাই, চাং তাই-লি, সু চাও চেঙ, চু তে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মাও সে-তুঙ ছিলেন দ্বিতীয় চিন্তাধারার শরিক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে চীনের বিচ্যুতি সেই মাওবাদেরই পরিণাম, যে মাওবাদ শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা-বাদের জায়গায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণা আমদানী করেছে।

এই মাওবাদের বৈশিষ্ট্য হল—(ক) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বর্জন। (খ) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে ইতিহাসের স্বতঃস্ফূর্ততাবাদী ব্যাখ্যার তত্ত্ব আবিষ্কার। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই মাওবাদ পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বকে প্রধান বলে মানতে চায় নি। শ্রেণীসংগ্রামকে নীতিনিষ্ঠ বলে গণ্য করে নি। মাও সে-তুঙ তাঁর নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বে জাতীয় বুর্জোয়াসহ যৌথ একনায়কত্বের ধারণা নিয়ে এসেছেন।

আর এই মাওবাদ গড়ে উঠেছে চীনের সামাজিক বিন্যাসে পেটিবুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রাধান্য হেতু, পেটিবুর্জোয়া মানসিকতা এবং বৃহৎ শক্তিসুলভ জাতির উগ্রজাত্যভিমান বোধের উপর দাঁড়িয়ে।

১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশনে যখন তেং সিয়াও পিঙ বলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিছুকাল পর্যন্ত যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব ছিল, সেটা ইতিমধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেছে", তখন তিনি তা বলেন ১৯৬৩ সালের ১৪ই জুন চিঠির সূত্র ধরেই। "সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিরোধ এ যুগের প্রধান বিরোধ"—১৪ই জুনের এই প্রতিপাদ্যের অর্থই হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্ধারক ভূমিকাকে অবহেলা করা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া।

জাতীয় মুক্তিকামী দেশগুলির প্রতি চীন যতই তত্ত্বগতভাবে সমর্থনের কথা বলুক না কেন, সেই সমর্থন আসলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালে মাও সে-তুঙ চীনের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে খোলাখুলি বলেছিলেন, "এই ভূমণ্ডল জয় আমাদের করতেই হবে। আমাদের লক্ষ্য হল সমগ্র ভূমণ্ডল এবং এখানে আমরা দারুন শক্তিশালী কর্তৃত্ব গড়ে তুলব।" এই বৈদেশিক নীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটা পররাজ্য লোভী ও জাতিদম্ভী মনোভাব যা বস্তুত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এসেছে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধে।

পৃথিবীর বহু দেশেরই অন্য দেশের সঙ্গে সম-সীমানা রয়েছে। কিন্তু চীনের মত অন্য কোন দেশের এরকম বিরোধ রয়েছে বলে জানা নেই। চীনের সম-সীমানাভুক্ত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ৪টি সমাজতান্ত্রিক দেশ, যেমন—সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া ও উত্তর কোরিয়া এবং ৮টি অন্যান্য দেশ, যেমন—আফগানিস্তান, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, ভূটান, সিকিম, বার্মা ও লাওস। এই সমস্ত দেশের অধিকাংশের সঙ্গে চীনের হয় সীমানা বা অন্য কোন কারণে বিরোধ রয়েছে।

এই বিরোধের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের কোন সম্পর্ক নেই। সে লেনিনের "শান্তি সংক্রান্ত রিপোর্ট"কে কোন মূল্য দেয় না। সীমান্ত বিরোধ সমস্যা নিরসনের জন্য এই রিপোর্ট দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল, যেমন—শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও বিদ্বেষভাবাপন্ন জাতির আস্থা অর্জন।

চীন যখন ভিয়েতনামে অবস্থিত চীন বংশীয় পুঁজিপতিদের জন্য চিন্তিত হয়ে 'প্রেফারেন্স' দাবি করে এবং এরই আড়ালে ভিয়েতনামের জনগণ এবং ভিয়েতনামে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ চীন বংশীয় জনগণের উপর শোষণ করে যাওয়ার অধিকার চায়, সে-সময়ও কি সি পি এমের মধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হয় না যে, এ হল রাজ্যের সীমানার বাইরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের হাতকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা? এর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর বিন্দুমাত্র কোন সম্পর্ক নেই।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আচ্ছন্ন, জাত্যভিমানবোধ ও আধিপত্য বিস্তারকামী মনোভাব—এগুলি যে চীনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেকথা উল্লেখ করলে সি পি এম আহত হয় কেন—তা আজও দুর্বোধ্য।

জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য কমিউনিস্টরা ভুল স্বীকার করে, ভুলের উৎস সন্ধানে যায় এবং ভুল থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংশোধনের রাস্তা বের করার চেষ্টা করে।

সেই কারণে যখন দেখা যায় চীন ১৯৬২ সালে নবীন সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবার স্বার্থবিরোধী কাজ করছে, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে বোম্বেটে নীতি অনুসরণ করছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন-ভিয়েতনাম এ দু'টি সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের চুক্তিকে আক্রমণ করছে, বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম ও অতন্দ্রপ্রহরী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিরোধিতাকে বীজমন্ত্র

বলে মনে করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এই অভিযোগ তুলছে, তখন তা সে করছে সাম্রাজ্যবাদকে সেবা করার জন্য যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে মানুষের লড়াই চলেছে।

যখন দেখা যায় আঙ্গোলার বিপ্লবকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য বহুজাতিক কর্পোরেশন ও সিয়ার নেতৃত্বের সঙ্গে চীন মদত দিচ্ছে, ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, বার্মা, কাম্পুচিয়া ও আরো অনেক দেশে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করছে, তখন চীন এগুলি করছে সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য, যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সপক্ষে মানুষ লড়ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, লাওস এবং সাধারণভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে জাপান-চীন চুক্তি; ফ্রান্স, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী ও ন্যাটোর গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে চীনের গোয়েন্দা সংস্থার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ; ন্যাটো সামরিক জোটের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-চীন-জাপান অক্ষশক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব—এগুলি সবই চীনের দিক থেকে গড়ে উঠেছে বিপ্লববিরোধী মনোভাব থেকে। চীনের এই নীতির ফলে তার জনগণের কোন লাভ হচ্ছে না, তবে এর ফসল কুড়োচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—যে শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ লড়ছে।

কোন দেশ যদি প্রতিক্রিয়া, প্রতিবিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একই কক্ষপথে চলে যায়, যদি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করে, যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করে, বিশ্ববিপ্লবী স্রোতধারার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে, তখন সেই দেশের আর কি-বা বাকি থাকে?

সুদানের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বহু কমিউনিস্টের আত্মত্যাগ সত্ত্বেও সেখানকার প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে চীন সমর্থন জানিয়েছিল, চিলির ফ্যাসিস্ত জুন্টার হাতে হাজার হাজার কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের প্রাণবলি সত্ত্বেও যে চীনের কোন হুঁশ হয় নি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ব্যাপক হত্যালীলার মধ্যে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের সমর্থনে যার দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। অন্তত আশা করা যেতে পারে যে সি পি এম শত সহস্র শহীদের

স্মৃতির সম্মানে নিধনযজ্ঞের হোতা চীনের ভুলের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হবে—এড়িয়ে বা আড়াল করে নয়, আত্মসমালোচনার পথ ধরে এই কাজে অগ্রসর হতে হবে।

আর এই সংপ্রচেষ্টার পথেই সি পি আই-সিপি এম সান্নিধ্য রচিত হবে যা তৈরী করবে আগামী দিনের মহাতোরণ যার মধ্যে দিয়ে বাম গণতান্ত্রিক স্রোতের মিছিল এগিয়ে যাবে, যা হবে ভারতের বুর্জোয়া শাসনের একমাত্র বিকল্প—সত্যিকারের ভবিষ্যৎ।

চে গুয়েভারা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসকে বদলায় জনগণের অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তি, তার উদ্বোধন করেন যাঁরা তাঁরাই হয়ে ওঠেন ইতিহাসের প্রাণপুরুষ। কিউবা-বিপ্লবের অন্যতম নায়ক চে গুয়েভারা তেমনি একটা যুগের ঐতিহাসিক পুরুষ। বুর্জোয়ারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, এবং ভক্তরা ভক্তির আতিশয্যে চে'র ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে কিংবদন্তীর আড়ালে ঢাকতে চেয়েছে। তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা যা হয়েছে সবই কিউবা-বিপ্লবের পর থেকে, বিপ্লবী হিসেবে তাঁর গড়ে ওঠাকে করা হয়েছে অস্বীকার। চে'র জীবনালেখ্য রচনার উদ্দেশ্যে নয়, কিংবদন্তীর আড়ালের প্রকৃত মানুষটির পরিচয় পাওয়ার জন্য এই আলোচনা।

আর্জেন্টিনার এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্নেস্টো গুয়েভারা নামের এই ছেলেটি জন্মাবধিই দুঃসহ হাঁপানীতে কষ্ট পেত। তাই বোধহয় তার নিরন্তর প্রয়াস ছিল দৈহিক বাধাকে ছাড়িয়ে ওঠার, প্রলোভন ছিল কঠোর পরিশ্রমের কাজের। অল্প বয়সেই সাইকেলে দূরভ্রমণ ও বরফ-ঢাকা পাহাড়-চূড়োয় ওঠার জন্য নাম কিনেছিল সে। কবিতা পড়তে ভালোবাসত আর জানা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লব এবং গেরিলা-বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের ইতিহাস। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ফ্যাসিবিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তার সঙ্গে মিলেছিল বাবা-মার বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট বন্ধুদের সাহচর্য ও ভালোবাসা। বাড়ীর লাইব্রেরীতে পেয়েছিল বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রচনাবলীর পরিচয়।

যদিও ছাত্রাবস্থায় সরকারী দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সেও সহযোগী ছিল কিন্তু তার মানসিক আপত্তি ছিল পুলিশের লাঠির কাছে মাথা-নোয়াতে। তার ধারণা ছিল এর একমাত্র জবাব দেওয়া যায় হাতিয়ার

হাতেই। নিজেকে গেরিলা নেতা হিসেবে কল্পনাও করে নি সেদিনকার কিশোর, কিন্তু অনর্থক প্রাণের অপচয় তার চিন্তাধারা-বিরোধী ছিল।

ডাক্তারী পড়তে পড়তে বেরিয়ে পড়েছিল বন্ধুর সঙ্গে মোটর সাইকেলে গোটা মহাদেশটাকে ঘুরে দেখবার দুঃসাধ্য সাধনে। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়েছে পায়ে হেঁটে। দীর্ঘ ৯ মাসের ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরেছে, সঙ্গে করে এনেছে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি প্রত্যক্ষ করার অনাস্বাদিত-পুলক আর সেই সভ্যতার ধারক ইণ্ডিয়ানদের জীবনের করুণ অবস্থার প্রতি সহমর্মিতা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ঘৃণা। শেষের কটা মাস ছিল আমাজন-মধ্যবর্তী দ্বীপে নির্বাসিত কুষ্ঠ রোগীদের হাসপাতালে। সেখানকার বাসিন্দারা চে ও তার বন্ধুর মধ্যে পেয়েছিল এমন মমতাময় মানুষকে যাঁরা সভ্যসমাজ থেকে বহিষ্কৃত মানুষদের গ্রহণ করেছিল সম-মর্যাদায়। সেখান থেকে দুর্মদ আমাজন পার হয়েছিল রোগীদের ভালোবাসার দান ভেলার নৌকায়। সে এক মর্মস্পর্শী বিদায় দৃশ্য। যারা অবহেলিত, নিষ্পেষিত তাদের জন্য ন্যায়ের এক জগৎ প্রতিষ্ঠার সংকল্প তখন থেকেই মনের মধ্যে বাসা বাঁধছিল।

এক বছর পর মাত্র চব্বিশে পা দেওয়া যুবক আর্নেস্টো ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে ঘর ছেড়েছিল বলিভিয়ার উদ্দেশ্যে। উপেক্ষা করেছিল ধনীর দুলালী প্রেমিকার অনুরাগ, লোভনীয় চাকরী এবং গবেষণার হাতছানি। এ কি শুধুই রোম্যান্টিক ভাবালুতা! মোটেই নয়। এর কিছু দিন আগেই রক্ষক-ভক্ষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাকের ডগায় দিনে একটা করে বিপ্লবের দেশ বলিভিয়ায় হয়ে গেছে এক নতুন ধরনের বিপ্লব যাতে অংশ নিয়েছিল সেই প্রথম খনি-শ্রমিক ও কৃষকরা। 'সোনার খনির ওপর বসা ভিখারী রাজ্য'র দেশের এই অন্য ধরনের বিপ্লবকে বুঝতে চাইছিল সে।

সে গেছে খনি-শ্রমিকদের ধাওড়ায়, ইণ্ডিয়ান-কৃষকের সঙ্গে এক অন্ন ভাগ করে খেয়েছে। বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে, এমনকি সরকারী দপ্তরে কাজও করেছে—কৃষি সংস্কারকে বোঝার জন্য। কিন্তু বীতশ্রদ্ধও হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি।

বুর্জোয়া নেতৃত্বের বাগাড়ম্বর, অর্থ ও ক্ষমতার লোভ, অপশাসন ও শোষণ দেশটাকে আবার এক অন্ধকারের দিকেই যে ঠেলছিল সেটা বুঝতে পারছিল

চে। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশের শোষক উভয়ের প্রতিই সমান ঘৃণা বুকে নিয়ে পরিস্থিতিটা অসহ্য বোধ হয়েছিল তার।

তখন লাতিন আমেরিকার আরেক দেশ গুয়াতেমালায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক প্রগতিশীল সরকার, পরন্তু বুর্জোয়া। বুঝতে পেরেছিল রাষ্ট্রপতি আরবেনজ বিপ্লবী নন্। কিন্তু তিনি বিরাট বিরাট জমিদারীর মালিকানা কেড়ে নিয়েছিলেন, বলিভিয়ার প্রধান সম্পদ টিন খনি জাতীয়করণ করেছিলেন, সর্বোপরি শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। চে'কে যারা আগুন-খেকো বিপ্লবী বলে তারা তার জীবনের এ অধ্যায়কে কী বলবে? লাতিন আমেরিকা যেকালে মার্কিনী বহুজাতিকের বাড়ীর পেছনের বাগান সেখানে যে কোনও রকম প্রগতির পদক্ষেপই যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বৈপ্লবিক এই ধারণা ছিল চে'র। আরবেনজ সরকারকে সমর্থন করেছিল অন্যান্য প্রগতিশীল দল এবং গুয়াতেমালার লেবার পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি)। অবশ্য এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মাত্র ৪ বছর আগে ১৯৪৯-এ এবং দেশের মধ্যে বড় রকম কোনো রাজনৈতিক প্রভাব গড়ে ওঠে নি। কিন্তু চে সহজেই এদের সঙ্গে নিজের সহমর্মিতা খুঁজে পেয়েছিল এবং এর যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেছিল নিজেকে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে সংস্কারবাদও 'ভয়ঙ্কর' ও 'কমিউনিস্ট'। বিশেষ করে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন ডালেস বহুজাতিক ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার এবং তার মুনাফায় হাত পড়েছে। অতএব সি আই এ তৎপর হয়ে উঠল। পার্শ্ববর্তী হণ্ডুরাসে জড়ো হচ্ছিল সি আই এর ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী। এই সময় গিয়ে পড়ল চে। যখন ভাড়াটে-বাহিনী আরবেনজ সরকারকে উচ্ছেদ করতে অপারগ হল, মার্কিনীরা তখন সরাসরি চাপ সৃষ্টি করল আরবেনজের ওপর। গুয়াতেমালার সৈন্যবাহিনী ছিল পুরোপুরি মার্কিনী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভাড়াটে বাহিনীর বিরুদ্ধে এই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হলে চে আহ্বান জানালো শ্রমজীবী জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে। কিন্তু বুর্জোয়াদের সকল দোদুল্যচিত্ততা নিয়ে আরবেনজ ভাবলেন আলোচনার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসায় আসবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল মার্কিন সরকার। চে'র কথায় কর্ণপাত করেনি সংস্কার-বাদী সরকার। তাকে যেতে দেওয়া হল না যুদ্ধরত অঞ্চলে। কিন্তু সে

চুপচাপ বসে হাত কামড়ায় নি। পরন্তু দেশপ্রেমিক শ্রমজীবী ছাত্রদের সঙ্গে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধী গোষ্ঠীতে কাজ করছিল এবং অস্ত্র-শস্ত্র যোগানোর কাজে ব্যস্ত রেখেছিল নিজেকে।

সি আই এ-র তালিকায় তার নাম উঠল 'বিপজ্জনক কমিউনিস্ট' হিসেবে এবং পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। তাকে বাধ্য হয়ে সরে আসতে হল আর্জেন্টিনার দূতাবাসে। সেখানে আরবেনজ-পন্থী গুয়াতেমালানদের সঙ্গে চে এবং অন্যান্য সহানুভূতিশীল কিউবান্‌রাও আশ্রয় নিল। গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট দুটি দলে বিভক্ত এই আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে চে ছিলেন কমিউনিস্টদের সঙ্গে। যদিও তিনি কোনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। তাকে সুযোগ দেওয়া হল দেশে ফেরার। কিন্তু তার পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। কিউবা ও গুয়াতেমালার বিপ্লবী সঙ্গীদের অনেকেই নতুন উদ্যমে বিপ্লব সংগঠনের জন্য মেক্সিকো পৌঁছেছিল। চে-ও গেল সেইখানেই।

কিউবার উপকূলে বিপ্লবী-বাহিনীর সঙ্গে অবতরণ করার আগে গুয়েভারার জীবনে এই হচ্ছে মোটামুটি বড় ঘটনা। এর থেকে তাঁর যে পরিচিতিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটা হল বিপ্লবী পরিস্থিতি অনুশীলনরত এক সংগ্রামী ছাত্রের।

গুয়াতেমালায় থাকার সময়ে তাঁর সময় কাটত কার্যত রুটী-রোজগারের ধান্ধার সঙ্গে সঙ্গে বরং আরো বেশী করে কিউবা, গুয়াতেমালা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশাগত বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে, শ্রমিকদের বস্তিতে এবং বন্ধু-জনের সঙ্গে প্রতিদিন বিপ্লব সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কে। এই সময়েই তাঁর সামনে মার্কসীয় জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার সম্পূর্ণরূপে খুলে গিয়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা, শ্রেণী-সংগ্রাম, কৃষি সংস্কারের গুরুত্ব আর লাতিন আমেরিকার জন্য সমাজতন্ত্রের সোনালী ভবিষ্যৎ।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁকে যারা চিত্রিত করতে চেয়েছেন দুঃসাহসিক এবং হঠকারী তরুণ মাত্র বলে, যে সর্ব-অবস্থায়ই মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিবেদিত-প্রাণ তরুণের দ্বারাই সাফল্যমণ্ডিত বিপ্লব সমাধা করা যায় মনে করে, বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না বলে, বলিভিয়া ও গুয়াতেমালায় তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর কাজ, বিপ্লবকে রক্ষা করার তাঁর আন্তরিক প্রয়াস এর সবগুলো ধারণাকেই কি উৎখাত করছে না?

এর উল্টো দিক থেকে, একই ধরনের বামপন্থী রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে, এমনকি আমাদের দেশেও। অনেক তরুণই মনে করেছেন বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কি না, বিপ্লবের নেতৃত্ব কারা দেবে ইত্যাদি ভাববার কোনো দরকারই নেই, সংগঠনের কয়েকজন মিলে গুটি কয় বন্দুক-পিস্তল নিয়েই সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্র-শক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লব সফল করতে পারবেন। এই দুয়েরই একেবারে বিপ্রতীপ ছিল চে'র জীবন। তিনি রীতিমত অনুশীলন করেছেন বিপ্লবকে. মোটামুটিভাবে, বিজ্ঞান এবং কলা হিসেবে, তার পরেই নিজে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

চে'র জীবনের এর পরের অধ্যায় নানাভাবে মানুষের কাছে পৌঁছেছে, কেননা, কিউবার বিপ্লব ও বলিভিয়ার বিপ্লবী সংগ্রাম দেরীতে হলেও বিশ্ব জানতে পেরেছে। তার মধ্যেও অনেক কিংবদন্তী, অনেক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার, অনেক হঠাৎ গজিয়ে তোলা গল্প-কথার মিশেল থাকলেও, তাঁর জীবন-ধারা চলেছে মোটামুটিভাবে জনচক্ষুর সামনে।

কিউবার বিপ্লব ও চে'র পরবর্তী নাতিদীর্ঘ জীবন এমনই ঘটনা-সঙ্কুল যে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আলাদা করে বই লিখতে হয়। গুয়াতেমালা থেকে চলে আসার পরে মেক্সিকোতে সাক্ষাৎ হল আজীবন ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুই বীর বিপ্লবীর—ফিদেল ক্যাস্ত্রো ও আর্নেস্টো গুয়েভারার। তখনও তাঁর নাম চে' হয় নি।

১৯৫৫-র জুলাইতে ফিদেল ও চে'র প্রথম সাক্ষাৎ হল। ফিদেল তাকে শোনালেন ২৬শে জুলাই আন্দোলন, কিউবাকে মুক্ত করার তার পূর্ব পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কাহিনী, জানালেন 'গ্রানমা' অভিযানের পূর্বাপর পরিকল্পনা, কিউবার বিপ্লবী পরিস্থিতি ও বিপ্লবের মূল এবং মিত্র শক্তিগুলির কথা। প্রথম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ফিদেল বলছেন: চে'র "বিপ্লবী চিন্তা আমার থেকে অনেক পরিণত ছিল। মতাদর্শ ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে সে অনেক এগিয়েছিল। আমার তুলনায় সে অনেক অগ্রসর বিপ্লবী ছিল।" আর চে লিখেছিলেন 'ফিদেলের সম্মানে গান'—যাতে বলেছেন কৃষি-সংস্কার আর মার্কিন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করার কথা। তিনি তখন প্রস্তুত হচ্ছেন অভিযাত্রী

সদস্য হিসাবে কিউবা যাবার জন্য, কেননা, লাতিন আমেরিকায় তাঁর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী জাতিয় মুক্তি সংগ্রামের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক কর্মসূচী মিলল এখানেই।

মূলত রেজি দেব্রে'র গ্রন্থ 'রেভোলিউশন ইন রেভোলিউশন' এবং চে'র বিভিন্ন সময়ের ডায়েরী থেকে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত নতুন তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হিসেবে চে'কে দেখানোর একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল মার্কিন ও পশ্চিম ইওরোপীয় নয়া-বামপন্থীদের মধ্যে, সেটার প্রক্ষেপ এদেশেও এসে পড়েছিল। কিন্তু কিউবা বিপ্লবে অংশগ্রহণ বা পরবর্তী সময়ের কার্যকলাপ থেকে চে নিজেও এ দাবী করেন নি বা প্রকৃতপক্ষে ছিলেনও না কোনো নতুন বিপ্লবী সংগ্রাম তত্ত্বের উদ্গাতা। কিউবা বিপ্লবের তাত্ত্বিক, সাংগঠনিক ও ব্যবহারিক সব দিকেরই নেতা ছিলেন ফিদেল ক্যাস্ত্রো।

তবে চে'র অবদান কোথায় ? ক্যাস্ত্রোর মধ্যে তিনি চিনতে পেরেছিলেন এই প্রথম সমাজতন্ত্রকে ধ্রুবতারার মতো সামনে রেখে শ্রমিক-কৃষক ও সব ধরনের অ-শোষক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য, সর্বপ্রকার শোষণ সম্পর্ক উচ্ছেদের জন্য বিপ্লবের নেতা এবং প্রবক্তাকে ; আর দেখেছিলেন সংগ্রামের সাফল্যের প্রতি প্রজ্বলন্ত এক বিশ্বাস। তাঁর নিজের কথায় "অভিযোগের দিন শেষ হয়ে এগনোর সময় এসেছে।" এ সময়ে তাঁর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের ও শোষকদের প্রতি ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াকে পাল্টানোর রোম্যান্টিকতা ছিল নিশ্চয়ই ; কিন্তু সেটা ভাবালুতা বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা-সর্বস্বতা নয়, পরন্তু লেনিনের ভাষায় যে 'রোমান্টিকতাকে আমরা বাদ দিতে পারি না।'

কিউবা বিপ্লব প্রমাণ করল চে'র বিপ্লব সম্পর্কিত অনুশীলনকে, গেরিলার দুঃসাধ্য জীবনকে বরণ করার মানসিক শক্তিকে এবং জনগণের প্রতি ভালোবাসা, তাদের শক্তিতে এবং বিপ্লবের জন্য তাদের আকুতি ও বিশ্বাসের প্রতি গভীর আস্থাকে। বিপ্লব চলাকালীন সময়ে তিনি ক্রমশই ফিদেলের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন। গেরিলা বাহিনীর রাজনৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। বিপ্লবের একবারে শেষ পর্যায়ে তাঁকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে ফিদেল তাঁকে যে ভার অর্পণ করেছিলেন সেগুলো ছিল : লা ভিলাস প্রদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সান্তা ক্লারা অধিকার এবং রাজধানী হাভানার দিকে এগিয়ে যাওয়া। লা ভিলাসে যে সব বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠী বাতিস্তা-বিরোধী সংগ্রাম করছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে

চে'র অধীনে সমবেত করা, ২৬শে জুলাই আন্দোলন ও কিউবার পার্টিদো সোশিয়ালিস্টা পপুলার'এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিপ্লবী বাহিনীর অগ্রগমন অব্যাহত রাখা এবং অধিকৃত অঞ্চলে কৃষি সংস্কার চালু করা। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কিউবার তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সোশিয়ালিস্ট পপুলার-এর বাহিনী এই অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছিল।

এর কোনোটাই সহজসাধ্য ছিল না, কিন্তু চেও দমেন নি। এবং বিপ্লবের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের যে দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেটা হল দেশের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী সংগঠনগুলির গেরিলা বাহিনীকে সমর্থন ও প্রত্যক্ষ লড়াইতে অংশগ্রহণ। পরবর্তীকালে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার পেছনে চে'র অবদান উল্লেখযোগ্য। ক্যাস্ত্রোর নির্দেশে চে পার্টিদো সোশিয়ালিস্টা পপুলার (তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি) ও ২৬ শে জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, পরে এর ভিত্তিতেই নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ উৎপাটন করার সাফল্য চে'র অবদান।

চে'র নয়া-বাম ভক্তরা উল্লসিত ঘোষণা করে যে সে সরকারী কমিউনিস্ট বা পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের ভাষায় 'গোঁড়া কমিউনিস্ট'দের ঘৃণা করত, বিশ্বাস করত তারা বিপ্লবের শক্তি নয় বলে বা তার নিন্দুকেরা সমালোচনা করেছে একই কারণে কিন্তু বিপরীত দিক থেকে, দুটোই যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ ঘটনাবলী দিয়েছে।

অবশ্য একথা মানতেই হবে যে বাতিস্তার বিরুদ্ধে শহরে আন্দোলনগুলির সমালোচনা করেছিল চে। সে সমালোচনার প্রসঙ্গ ও কারণ ভুলে শুধুমাত্র সমালোচনাটাকেই প্রাধান্য দিলে এক উদ্ভট তাত্ত্বিক বক্তব্য খাড়া করা যায়— তাই করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইয়াংকী সাম্রাজ্যবাদ কোথাও সরাসরি, কোথাও ভাড়াটে প্রতিনিধির মাধ্যমে বহুজাতিক দৈত্যাকৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোর কব্জা বজায় রাখার জন্য অভূতপূর্ব নিপীড়ন, খুন, সন্ত্রাস চালাচ্ছিল প্রায় প্রতিটি লাতিন আমেরিকার দেশে। এবং এই সন্ত্রাসের বলি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক হয়েছে কমিউনিস্টরা। চে'র বক্তব্য ছিল এই সমাজব্যবস্থায় বিপ্লবী বাহিনীর শহরকেন্দ্রিক আইনানুগ আন্দোলন আরো বেশী দমনপীড়ন ডেকে আনে এবং আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, পেছিয়ে দেয়। ঘটনাও তাই প্রমাণ করেছে। পরিবর্তে গোপন গেরিলা লড়াই শত্রুকে পর্যুদস্ত করে,

জনগণের বিপ্লবী অংশ শ্রমিক-কৃষক, ছাত্রযুবকদের সঙ্গে বিপ্লবের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হতে পারে। স্মরণীয় যে, তিনি কিন্তু কোথাও বিপ্লবের ভিন্ন পথের উপযুক্ততা সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেন নি। পরন্তু, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বলিভিয়ার ও গুয়াতেমালার বুর্জোয়া সংস্কারবাদী সরকার ও আন্দোলনকে তার সমর্থন ও প্রত্যক্ষ সহায়তা বিপ্লবের ভিন্ন ভিন্ন পথ সম্পর্কে তার সমর্থনকেই প্রকট করছে।

বিপ্লবের পূর্বে তো বটেই, পরে আরো বেশী করে তিনি শত্রু হয়ে উঠেছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। যতদিন কিউবায় ছিলেন অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তার সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে উঠেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। এবং মার্কিন সরকার ও 'বৃহৎ ব্যবসার' নিকট ফিদেল ক্যাস্ত্রোর পর তিনিই ছিলেন প্রধানতম শত্রু। আশ্চর্যের বিষয় হল তাঁকে বর্বরতম উপায়ে খুন করেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ভীতি থেকে মুক্ত হতে পারে নি। সে দেশেই ওঁকে নিয়ে লেখা, আলোচনা, সিনেমা, নাটক হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এর প্রায় সবগুলোই যেন একই সুতোয় গাঁথা নানা ফুলের একটা মালা। মালাটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার, কিন্তু সবরকম পরিপার্শ্ব ছাড়িয়ে ওঠা, অযৌক্তিক প্রশংসার। মালার সুতোটাই কিন্তু আসল। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে চে ছিল মূলত কমিউনিস্ট বিরোধী। যেখানে তাকে কমিউনিস্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে সেখানেও, প্রমাণ করা হয়েছে, সে ছিল কোনো রাজনৈতিক বা বিপ্লবী নেতা নয়, বরং এই বস্তুবাদী দুনিয়ার হতমান চেহারাটাকে পাল্টানোর ব্রতধারী এক খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ। সেও বলিভিয়ায় অসফল হয়েছে, হলেই বা, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ ও তো অসফল হয়েছে। আবার যারা তার সাফল্যকে অস্বীকার করতে পারে নি, তারা প্রমাণ করেছে চে ছিল কমিউনিস্ট, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যান্য বড় বড় সকল নেতা যেমন লেনিন, বার্নস্টাইন, রোজা লুক্সেমবুর্গ, মাও, টিটোর মতই এমন মার্কসবাদী নেতা যাঁরা তত্ত্বের থেকে তৎপরতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। এদের মতে লেনিন হচ্ছেন মার্কসবাদের প্রথম প্রতিভাশালী সংশোধনবাদী। চে' ও পরবর্তীকালে সেই ধারারই অনুসারী। এরা মনে করেন মার্কসবাদ যে মতান্ধতা নয়, বরং একটা ব্যবহারিক পথ এটা মাত্র ১৯৬০ পরবর্তী বিকাশ। এই পণ্ডিতেরা যেটা করতে চান তা খুব সরল। চে' কে প্রশংসা করতে গিয়ে

এরা বলতে চান মার্কসবাদই আসলে সঠিক নয়, অবস্থানুযায়ী যে কোন তত্ত্বই মার্কসবাদ বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

চে'র বিরুদ্ধবাদীরা কিউবার সাফল্যের পর তাঁর বলিভিয়ায় বিপ্লবী গেরিলা সংগ্রাম চালানোর চেষ্টার জন্য তাঁকে এক ধরনের 'চির-বিপ্লবী' বা 'আকাঁড়া বিপ্লবী' হিসেবে দেখাতে চেয়েছে। তারা দেখাতে চায় বিপ্লবের সাফল্য নয়, নয় তার দৃঢ়ীকরণ, বরং 'বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব'—চে'র ধারণা ছিল এইরকম। তা না হলে সে কেন কিউবা ছেড়ে বলিভিয়ায় যাবে।

কিউবার বিপ্লব সফল হয়েছিল ১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে, বাতিস্তার পতনের মধ্য দিয়ে। সেখান থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর দরজা খুব নিকট ছিল না। আর সে কাজে জীবনের আরো ছটা সবচেয়ে কর্মোদ্দীপ্ত বছর কাটিয়েছেন চে কিউবাতে প্রথমে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সভাপতি ও পরে শিল্পমন্ত্রী হিসেবে। তাঁর প্রতিটি কাজকে আলাদা করে দেখার সময় বা প্রয়োজন কোনোটাই নেই। কিন্তু যারা তাঁকে চিত্রিত করতে চান 'নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী' হিসেবে, তারা কিউবার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে তাঁর ভূমিকাকেই আড়াল রাখতে চান। এটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে কৃষি সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মার্কিন বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থা বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয়করণ, জাতীয় শিল্প 'চিনি'র পুনর্গঠন ইত্যাদি সবগুলোই চে'র প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও সক্রিয় তৎপরতার প্রমাণ। বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বা নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা এসব বুলি দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না। এদের তত্ত্ব যদি সঠিক হত তাহলে কিউবার বিপ্লব সফল হওয়া মাত্র চে'কে সে দেশ ছাড়তে হত।

আসলে এরা চে'কে বিপ্লবী হিসেবে যেমন খাটো করতে চায়, তেমনি কিউবার সমাজতান্ত্রিক অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎকেই অস্বীকার করতে চায়। চে'র দৃষ্টান্ত অনুসরণকারী অসংখ্য তরুণদের এরা বোঝাতে চায় বিপ্লব করো, ভালো কথা, কিন্তু সমাজতন্ত্র করে কোনো লাভ নেই। এদেরই প্রভুরা দিনে একটা করে 'বিপ্লব' সমাধা করত লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে।

এর আরেকটা দিকও রয়েছে। লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের ইতিহাসে অনধ্যয়ন এবং তার মেজাজকে জনতার সামনে থেকে আড়ালে রাখার প্রয়াস। আমরা আগেই দেখেছি যে চে কেমন করে সমগ্র মহাদেশটাকেই তার দেশ মনে

করত, মনে করত যে কিউবাই হোক বা বলিভিয়াই হোক, কোনো একটার সংগ্রাম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, গোটা মহাদেশের বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনের খণ্ড অংশ মাত্র। দ্বিতীয়ত, সাধারণ স্পেনীয় বংশোদ্ভূত লাতিন আমেরিকার সর্বত্রই এক দেশের সংগ্রামে আরেকের জনগণ ও বিপ্লবীরা পূর্বাপর অংশগ্রহণ করে এসেছে। সাইমন বলিভার ও হোসে মার্তির উত্তরাধিকার তাই। এই ইতিহাস ভুলে গেলেই বা ভুলিয়ে দিতে চাইলেই নানা নতুন অভিধায় বিপ্লবের সাফল্যকে ঢেকে রাখতে হয়।

চে'র ভক্তবৃন্দ ও বিরুদ্ধবাদীরা একই মন্ত্র জপ করে চলেছে বারে বারে; সে নাকি প্রবল সোভিয়েত-বিদ্বেষী ছিল। এরা যেটা জানে না তা হল চে মনে করত কিউবার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সোভিয়েতের সাহায্য ব্যতিরেকে কখনোই সম্ভব নয়। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কিউবার বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের চুক্তিগুলি তাঁরই করা। বিশেষ করে মার্কিনী তাঁবেদার ও মাওবাদীদের প্রচার এটা। চে'কে 'আঁকাড়া বিপ্লবী' প্রমাণ করার জন্য এরা উভয়েই 'সরকারী কমিউনিজম' বা 'সামাজিক-সাম্রাজ্য-বাদে'র বিরুদ্ধে চে'কে দাঁড় করাতে চায়। এদের সোভিয়েত-ভীতি ও অন্ধ সোভিয়েত-বিদ্বেষ একটা জায়গায় বেশ মিলেছে। এ ব্যাপারে চে কি বলছেন! "এটা হচ্ছে একটা সরল সত্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নে এলেই বোঝা যায় এখানে সমাজতন্ত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, এই হচ্ছে একটা ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থা।" আরোও বলছেন "আমাদের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রয়েছে অসীম উৎসাহ। এটা সম্ভবত সবচাইতে বেশী সোভিয়েত ইউনিয়নে। তাদের বিপ্লবের ৪৩ বছর কেটে গেছে এবং আজ সেখানকার জনগণের রয়েছে এক সুউন্নত রাজনৈতিক সচেতনতা।" "আমাদের ক্রমাগত যুদ্ধ করে যেতে হবে বিশ্বজুড়ে শান্তির জন্যে, আমাদের শান্তিকে রক্ষা করতে হবে···" (সোভিয়েত ভ্রমণ শেষে জাতির উদ্দেশ্যে হাভানা বেতার ও টেলিভিশন থেকে প্রচারিত বক্তৃতা-৬. ১. ১৯৬১)। 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' ও 'শান্তির নীতি ভ্রান্ত নীতি, সংশোধনী চিন্তা'র প্রবক্তাদের মুখের মতো জবাব।

আমাদের দেশের নয়া-বাম তরুণদের অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তথাকথিত শ্রেণীশত্রু নিধন করতে গিয়ে। মাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকেই চে'র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এদের তাত্ত্বিক নেতারা কিন্তু কখনোই চেকে বিপ্লবীর সম্মান দেয় নি। পরন্তু এ দেশের নকশালবাড়ী

আন্দোলনের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ অনুধাবন করলেই দেখা যায়, নিজেদের অসাফল্য ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস এরা করেছেন এক গোষ্ঠী কর্তৃক আরেক গোষ্ঠীর বক্তব্যকে চে গুয়েভারার তত্ত্ব বলে চালিয়ে দিতে। অথচ চে'র দ্বারা অনুপ্রাণিত কিশোর ও তরুণদের স্বপ্নকে এরা কাজে লাগিয়েছেন জনগণের সংগ্রামের স্রোতোধারা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। চে কিন্তু কখনও অর্ধ-পক্ক তত্ত্ব বা সার্বিক বিপ্লবী তত্ত্ব বা বাস্তব পরিস্থিতি-অনির্ভর সর্বত্র একই সঙ্গে বিপ্লব শুরু করার তত্ত্ব আবিষ্কারও করেন নি সমর্থনও করেন নি। ১৯৬৩ সালের ২রা আগস্ট 'রেভোলুশিওঁ' পত্রিকায় আমেরিকার ছাত্রদের সঙ্গে এক সংলাপে চে ট্রটস্কিপন্থীদের প্ররোচনার মুখোশ খুলে দেন। কিউবা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল নৌ-বাহিনী ও অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধের দ্বারা অবরুদ্ধ তখন এরা দাবী করছিল যে গুয়ান্তানামোর মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ করা হোক্। এদের আক্রমণ করে তিনি বললেন যে বাস্তবের সঙ্গে যোগশূন্য এই ট্রটস্কিপন্থীদের কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে কোনো যোগ নেই, এরা অলস ও গপ্পোবাজ এবং সরকার এদের নিজস্ব পত্রিকা বের করতে দেবে না কিছুতেই।

বলিভিয়ায় চে'র নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী সরাসরি মার্কিন বাহিনী ও সিয়া-চক্রের আক্রমণে পরাস্ত হয়। তাঁর অসাফল্য সমালোচকদের সুবিধে করে দিয়েছিল তাঁর বৈপ্লবিক চেতনাকে নানা উদ্ভট বুলির আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, লাতিন আমেরিকায় প্রগতির আন্দোলন যত অগ্রসর হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের প্রতি সেই মহাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম যত তীব্র হচ্ছে, সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বপ্রকার ঘৃণ্য প্রয়াসকে সবলে সরিয়ে দিয়ে কিউবার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ যত দৃঢ় হচ্ছে চে'র সংগ্রামী মূর্তিটি ততই দেদীপ্যমান হয়ে উঠছে।

নিজের জীবন দিয়ে আর্জেন্টিনার আর্নেস্টো গুয়েভারা, সমগ্র লাতিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্ত ও দেশজ প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার অনিবার্য প্রতীক হয়ে উঠেছেন কিউবার জনগণের আদরের ও বিশ্বের ভালোবাসার চে।

দেবব্রত বিশ্বাস

আজীবন মেরুদণ্ড ঋজু রেখেই অনন্য সঙ্গীতজ্ঞ দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনায়ন হল। আকস্মিক গরম বাজারে বাস্তবিকই রুদ্ধগতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতের প্রাণপুরুষ (এক হিসেবে স্বরাটও বটে) দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর বলিষ্ঠ, সুরেলা অথচ রসপরিপৃক্ত সঙ্গীতে সংস্কৃতিবান বাঙালীর মন ও মননকে বারংবার শ্মরিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর স্রষ্টা ও দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় আস্থা যে, বাংলার মানুষকে তাঁর গান একদিন গাইতে এবং শুনতে হবেই।

দেবব্রত তবু বৈঠকী কৃত্রিমতার সংকীর্ণ পরিসরে অথবা গজদন্তমিনারে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আবদ্ধ রাখেন নি, হয়ত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে তিরিশ ও চল্লিশ দশকের গণ-আন্দোলনে তাঁর অর্জিত শিক্ষার প্রসাদগুণের জন্যই। গণসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল গীতির পুষ্পিত উদ্যানে ছিল তার অনায়াস অথচ সৃজনশীল পদচারণা। তিনি তাঁর চঞ্চল বিপুল সুদূরপ্রয়াসী ব্যাকুল বাঁশরীকে যান্ত্রিক স্বরলিপির অ-সুরবিলাসে অপচিত হতে দেন নি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ও অনাদিকুমার ঘোষ দস্তিদারের মত দিকপালদের প্রিয় শিক্ষার্থী দেবব্রত বিশ্বাস ভারতীয় সঙ্গীতের গুরুপরম্পরাগত বৈশিষ্ট্যের দিকটি তাঁর যে গায়কীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠত, তা আনন্দবাজারী কলমচি সঙ্গীত-অজ্ঞদের বলহীন চীৎকারে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রসঙ্গীত মহলের কিছু কায়েমীস্বার্থবাদী (যারা দেবব্রতের রেকর্ডগুলির সর্বাধিক জনপ্রিয়তাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না) প্রকৃতপক্ষে পদদলন করতে উদ্যত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধের বক্তব্যসারকেই।

দেবব্রত বিশ্বাসের মূল্যায়ন স্মৃতিচারণার বিষয়বস্তু হতে পারে না, তবু কিছু কিছু প্রসঙ্গ অনিবার্য। তাঁর আত্মকথা 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখ্য সংযোজন। তাঁর গায়নরীতি নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছিল, তিনি সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। গণসংস্কৃতি আন্দোলনের অমূল্য অভিজ্ঞতায়

তিনি যেভাবে তাঁর কথা বলেছেন, উত্তরসূরীদের কাছে তা অনুসরণীয়। নিজেকে তিনি কোথাও অভ্রান্ত বলেন নি, কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন, যার সদুত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

যাদের হৃদয়াসনে তিনি ঈর্ষণীয় স্থান অধিকার করে আছেন, তাঁর মধ্যে কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট ভেদ নেই। শিল্পী হিসেবে তিনি যে মহৎ ছিলেন এর চেয়ে বড় অভিজ্ঞান আর কি হতে পারে ?

দার্শনিক লেনিন ঃ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২০ টাকা

দুনিয়াকে বদলানোই ছিল লেনিনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু তিনি জানতেন যে দুনিয়াকে না-বুঝে বা ভুল-বুঝে ঠিক পথে বদলানো সম্ভব নয়। তাই তাঁর দৃষ্টিতে বিপ্লবীর ভাবমূর্তি এবং দার্শনিকের ভাবমূর্তি মিশে যায়। এই গ্রন্থে লেনিনের দার্শনিক রচনাবলীর একটি সাধারণ পাঠ্য ও সহজবোধ্য ভূমিকা পাওয়া যাবে। বাংলা ভাষায় এধরণের পর্যালোচনা এই প্রথম। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রগতিশীলদের এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য।

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা ঃ

নরহরি কবিরাজ ২৫ টাকা

এই বইয়ের নতুন ক'রে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা পঠন-পাঠন করেন, কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা জানতে চান, বাঙলার ইতিহাসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কাছে বইখানি অপরিহার্য।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩

With best compliments from :

Rameswarpur Coldstorage Pvt. Ltd.

23/24 Radhabazar Street,
Calcutta-700001

Dial : 27-4876

Saradiya Greetings to all

Vartas Engineering Geschafte India

Makers of :

Batteries for all vehices & Specially for INVERTER

165A, Lower Circular Road, Calcutta-14

Phone : 24-2531 & 44-4442

To put bounce in his life, there's someone at work...

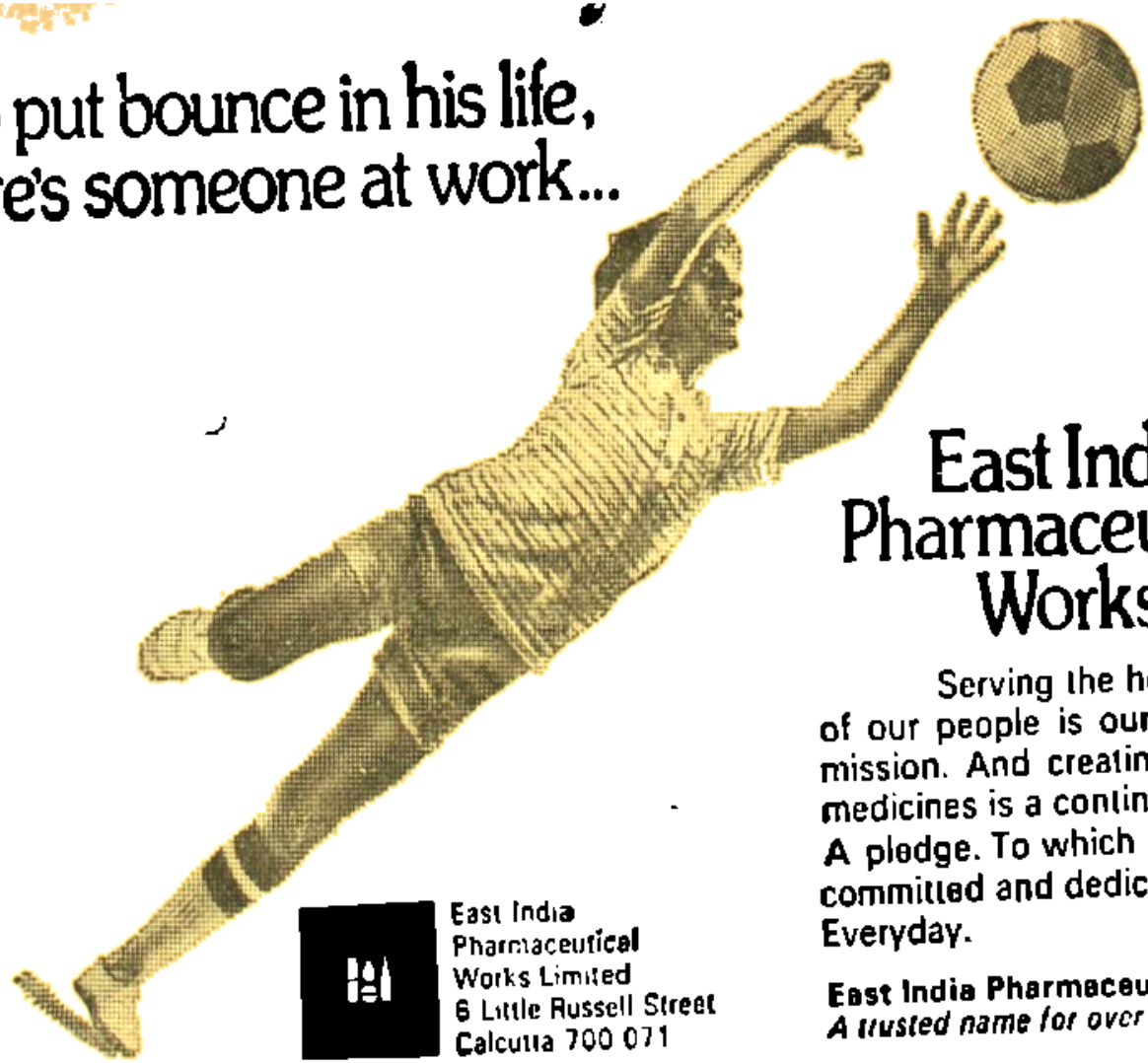

East India Pharmaceutical Works

Serving the health needs of our people is our constant mission. And creating quality medicines is a continuous pursuit. A pledge. To which we stand committed and dedicated. Everyday.

East India Pharmaceutical Works—
A trusted name for over four decades.

East India Pharmaceutical Works Limited
6 Little Russell Street
Calcutta 700 071

EIPW/PR/CAS-1/90

MULYAYAN Sharadiya
...mber 1980)
Regd. No. W.B. SC 16
R. N. 13785/65

আমরা মনে করি

- কোন রাজ্যের আন্দোলনকারীরা ঠিক করতে পারেন না বিদেশী নাগরিক কারা। ঠিক করবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিতে সর্বদলীয় মতামত নিয়ে।

- সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কেউ কোন কারণেই বিঘ্নিত করতে পারেন না। ভারতের নাগরিক হিসাবে যে কোন রাজ্যেই আমরা বসবাস করতে পারি। প্রত্যেকটি রাজ্যেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক।

- কোন একটি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই রাজ্যই দাবী করতে পারেন না। ভারতের যে কোন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সমগ্র ভারতবাসীর।

জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

...প্রি. ... ১০২৯/৮০

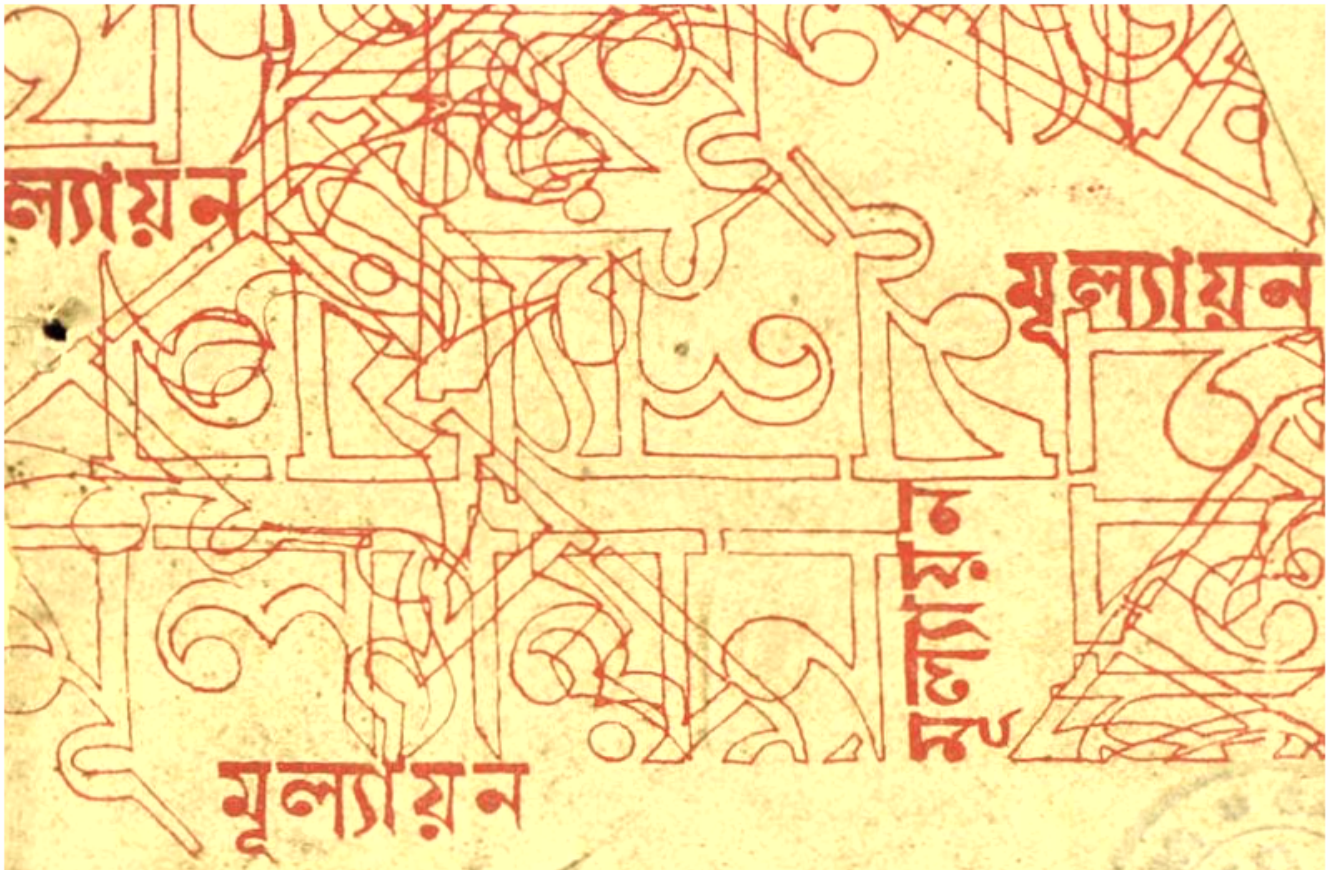

- মাস্টার-দা : মানুষ ও বিপ্লবী নায়ক
- আবুল কালাম আজাদ ও বিপ্লবী আন্দোলন
- কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার আর এক অধ্যায়
- একাশি পার্টির দলিল

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩

দাম : দুই টাকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই :

বৈশ্লেষিক রসায়ন	ডঃ অনিলকুমার দে, ডঃ অসিতকুমার সেন	১৭·০০
ভৌত রসায়ন	ডঃ নিত্যানন্দ কুণ্ডু	২২·০০
ইউরেনিয়ামের ওপারে	ডঃ অনিলকুমার দে	৯·০০
সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল	শ্রী বিমলেন্দু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী অনিমা ভট্টাচার্য	২৫·০০
ভারতের শিলাস্তর ও ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস	ডঃ তিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী	১৬·০০
কৃষ্টাল মূর্তিবিদ্যা ও আলোক্রান্ত		
মিনারল বিজ্ঞান	শ্রী সন্তোষ রায়	১৮·০০
গঠন সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা	ডঃ সুবীরকুমার ঘোষ	১১·৬০
পুরাজীববিদ্যা	ডঃ শুভেন্দুকুমার বক্সী	১১·০০
প্রযুক্তি সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা	শ্রী পর্তাকীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১২·০০
আধুনিক প্রস্তরবিদ্যা	ডঃ অনিরুদ্ধ দে	৯·০০
ভারতের খনিজ সম্পদ	শ্রী দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা	শ্রী সঙ্কর্ষণ রায়	১২·০০
দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতি	শ্রী অশোককুমার রায়	২·০০
গতিবিদ্যা	ডঃ প্রদীপ নিয়োগী	১২·০০
প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা	শ্রী অপূর্বকুমার চক্রবর্তী	১৫·০০
পদার্থের ধর্ম (২য় সংস্করণ)	ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
পরমাণু ও কেন্দ্রীন	ডঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২১·০০
পরমাণু ও কেন্দ্রক গঠন পরিচয়	ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	৩৩·০০
জ্যামিতীয় আলোকবিজ্ঞান	শ্রী অরবিন্দ নাগ	১১·০০
তাপগতিতত্ত্ব	শ্রী অশোককুমার ঘোষ	২৪·০০
পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা	ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
আলোকের সমবর্তন	শ্রী সুহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
গ্যাসের আণবিকতত্ত্ব	শ্রী প্রতীপকুমার চৌধুরী	১২·০০
নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান	ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী	১২·০০
ইলেকট্রনিক্স্	ডঃ অনাদিনাথ দাঁ	১৫·০০
ভৌত আলোকবিজ্ঞান	ডঃ বিজয়শংকর বসাক	
উচ্চতর স্বর্ণবিদ্যা	শ্রী যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়	২০·০০
সংখ্যাতত্ত্ব	ডঃ রাজকুমার সেন	২১·০০
ভূগর্ববিদ্যা	ডঃ কমলকুমার দাস	৯·০০
প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস ও পরিবেশ বিজ্ঞান	শ্রী সীমানন্দ অধিকারী	৭·০০
হেলমিনথিস্, এনিলিডা, মলাস্কা	শ্রী তারাপদ চট্টোপাধ্যায়	১৪·০০
আমফিবিয়া ও রেপটিলিয়া	শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র	১৬·০০

আরো অন্যান্য বইয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা :

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩ ।

কালান্তর

দৈনিক

ও

সাপ্তাহিক

পড়ুন ও পড়ান

M/s Rajasthan Auto Service

Waria,
Dist. Burdwan.

Dealer :

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

মূল্যায়ন

বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৩

১৩৮৭

সূচী

	পৃষ্ঠা
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন / সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	১
প্রসঙ্গ : মহাহিন্দু সমিতি / অমর দত্ত	৭
মাস্টারদা : মানুষ ও বিপ্লবী নায়ক / সহায়রাম দাস	১৪
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার আর এক অধ্যায় (২) / রণেন সেন	২৩
দক্ষিণ বাংলার সাঁওতালী সংস্কৃতির ধারা / শম্ভু মিত্র	৪০
সোভিয়েত–ভারত সম্পর্ক / ল. ই. ব্রেজনেভ	৬৯
একাশি পার্টির দলিল / শঙ্কর রায়	৫৫
পুস্তক পরিচিতি :	৬২

সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ

উপদেষ্টামণ্ডলী : সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, পরিমল চন্দ্র ঘোষ,
সুশীল জানা, নির্মাল্য বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ কাউন্সিল রোড, কলি:-১৭ হইতে মুদ্রিত ও ১০, বতেল রোড, কলি:-১৯ হইতে প্রকাশিত।

বিয়োগপঞ্জী

পি. সি. জোশী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে যাঁরা জাতীয় পার্টি হিসাবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কমরেড পি. সি. জোশী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিস্ট তথা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়।

কমরেড জোশী ছিলেন আমাদের শুভানুধ্যায়ী ও 'মূল্যায়ন' ও "প্রবলেম্‌স অব ন্যাশনাল লিবারেশন"-এর পৃষ্ঠপোষক।

কমরেড জোশীর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা জানাই আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি।

॥ মূল্যায়ন নিয়মাবলী ॥

গ্রাহক ঃ

পত্রিকা ত্রৈমাসিক।
বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
বার্ষিক চাঁদা ৮·০০ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ২·০০ টাকা
গ্রাহক হ'লে বর্দ্ধিত কলেবর শারদীয় সংখ্যার জন্য
অতিরিক্ত মূল্য লাগে না।

এজেন্ট ঃ

কমপক্ষে পাঁচ কপি নিতে হবে।
পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে।
ভি. পি. খরচ বহন করবে মূল্যায়ন।
কমিশন—শতকরা ২৫%।

চাঁদা পাঠাবার ও যোগাযোগের ঠিকানা :

মূল্যায়ন
১০, বণ্ডেল রোড,
কলকাতা-১৯

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
এবং
বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম আমাদের দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সামনে অন্যতম প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংগ্রাম নিছক নেতিবাচক নয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনগণকে উভয় ধরনের সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত করে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সচেতনভাবে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতন ব্যক্তিত্ব যে ভূমিকা পালন করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা হিন্দু ও মুসলিম দুই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবিচলভাবে লড়াই করেছেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব মানুষ তাঁদের অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল কালাম আজাদের স্থান প্রথম সারিতে। দুঃখের বিষয়, এই ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা এখন পর্যন্ত অনেকের কাছেই অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। কারণ অবশ্য একটা আছে। মোল্লাতন্ত্রের ধর্মান্ধতা এবং অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে তিনি তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিকভাবে যা কিছু লিখেছেন তার সবই উর্দু ভাষায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত 'আল হিলাল' পত্রিকার কথা অনেকেরই জানা আছে। দিল্লীর একটি উর্দু প্রকাশন সংস্থা 'আল হিলাল' পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলির কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন, সম্ভবত দুই দশক আগে। প্রথম খণ্ডটির নাম 'ইসলাম আউর জমহুরিয়ৎ' অর্থাৎ 'ইসলাম এবং গণতন্ত্র'। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন তাঁর সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার অভিযানে ইংলণ্ডের কয়েকজন খ্যাতনামা 'ইসলাম বিশেষজ্ঞ' অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ঐস্লামিক ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাসের নজীর তুলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইসলাম

ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না। তাঁদেরই প্রেরণায় এদেশের কিছু সংখ্যক মুসলিম পণ্ডিতও সুর মিলিয়েছিলেন। তাঁরা আর এক ধাপ এগিয়ে বলার চেষ্টা করেন যে ইসলামের শিক্ষা হল রাজভক্তি। মনে রাখা দরকার সেই সময়সীমাতে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন জোয়ার এসেছে এবং হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সাধারণ মানুষ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ঐসব প্রচারকদের যুক্তির বিরুদ্ধেই আবুল কালাম আজাদ তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী চালনা করেন। ঐস্লামিক ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়-বিস্তৃত। তিনি উদ্ধৃতি, নজীর এবং যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম ইসলামের শিক্ষার বিরোধী ত' নয়ই, বরং তারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অবশ্য উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করা নয়। এখানে মৌলানা আজাদের অ-সাম্প্রদায়িক এবং দেশপ্রেমিক কার্যকলাপের অন্য একটি প্রায় অজ্ঞাত দিকের উপর আলোকপাত করা হবে। সে কথা মনে রেখেই প্রবন্ধের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। শিরোনামটা অবশ্য কারো কারো কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। যদি হয় তবে তার কারণ দুটি। (১) আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে বহু তথ্য এখনও অজানা রয়ে গিয়েছে, (২) যাঁরা এই বিষয়ে কিছুটা খোঁজখবর নিচ্ছেন তাঁদের অনেকে এমন কতকগুলি পূর্বকল্পিত যান্ত্রিক ছকে বাঁধা ধারণা নিয়ে অগ্রসর হন, যেগুলির সঠিকতা সম্পর্কে নতুনভাবে যাচাই করে দেখা দরকার। ঐসব অতিসরলীকৃত ছক অনুসরণ করার ফলে বহু তথ্য হয় নজর এড়িয়ে যায় নতুবা সেগুলির সঠিক তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। ফলে তথ্যগত এবং পদ্ধতিগত, দুদিক থেকেই ভুল হতে বাধ্য।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। দীর্ঘদিন ধরে মার্কসীয় পণ্ডিতদের কারো কারো মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে জাতীয় আন্দোলনে, বিশেষত জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের উপর হিন্দু ধর্মীয় ধ্যানধারণার প্রভাব ছিল বলেই নাকি মুসলিম সম্প্রদায় তা থেকে দূরে থেকেছে। কেউ কেউ এমন মতও প্রকাশ করেন যে ঐ কারণেই নাকি 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মাথা তুলেছে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তাকে কাজে লাগাতে পেরেছে। এই প্রবন্ধে উক্ত ধারণার ভ্রান্তি সম্বন্ধে বিশদ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, খানিকটা অবান্তর হয়েও পড়বে। তবু প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলে নেওয়ার দরকার আছে।

প্রথমত ঐরূপ সিদ্ধান্ত তথ্যগতভাবে আদৌ ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত আসলে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র উৎপত্তি এবং ব্রিটিশের কূট কৌশলে তার শক্তিবৃদ্ধির পিছনে যে সব অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ আছে সেগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করে। আসল কথা, আমাদের দেশে জাতীয় চেতনার জাগরণে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধি-জীবীরা। মুসলমান সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষাকে বর্জন করে দূরে সরেছিলেন। স্বভাবতই ইংরাজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। নবচেতনার জাগরণে তাঁদের সামনে প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের মনকে সামন্তযুগীয় ধ্যানধারণা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা, অন্ধ গোঁড়ামির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। এদের মধ্যে অনেকগুলি ধারা ছিল। যে ধারাটি চরমপন্থী রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রকে মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত মানুষের মধ্যে সীমিত না রেখে আরো ব্যাপক করতে চেয়েছিলেন। সমাজের ব্যাপকতর মানুষদের মধ্যে যুক্তিবাদ, মানুষের মর্যাদা, সুস্থ সংস্কার, স্বাধিকার বোধ ইত্যাদি জাগ্রত করতে হলে সেদিন রুশো, ভলতেয়ার, মিল, বেনথাম প্রভৃতির উক্তির সাহায্যে তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগানো নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। সেইজন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ধর্মসংস্কার, ধর্মের নতুন যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়েছে। ইংরাজ-শাসনের অন্যতম ফল ছিল 'সাংস্কৃতিক বিজয়' (কালচারাল কনকোয়েস্ট)। ভারতবাসীর মনে হীনমন্যতাবোধকে পাকাপাকিভাবে গেঁথে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসকেরা নিরন্তর প্রচার চালাত যে ভারতের অতীত শুধুই অন্ধকারময়, তা নিয়ে গর্ব করার কিছুই নেই। এই অপকৌশলের বিরুদ্ধেই ভারতের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরে দেশের মানুষের আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানবোধ জাগাবার চেষ্টা হত। সমস্ত পরাধীন দেশেই জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখা যায়। জাতীয় নবজাগরণের যে পথিকৃতেরা ঐরূপ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের পুনরভ্যুত্থানবাদী বা অতীতমুখীন বলা চলে না। তাঁরা একই সঙ্গে ইওরোপের যুক্তিবাদ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক অবদানগুলিকেও গ্রহণ করেছিলেন। তবে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণের বদলে সেগুলিকে 'অ্যাসিমিলেট' বা নিজীকরণের প্রয়াসে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এঁদের চিন্তার আধার ধর্মীয় হলেও আধেয় ছিল নবযুগচেতনা। অবশ্য

এঁদের মধ্যে কারো কারো চিন্তায় হিন্দুয়ানির দিকে ঝোঁকটা বেশি ছিল। আবার এঁদেরই পাশাপাশি ইংরাজী শিক্ষিত মহলের এক অংশে রক্ষণশীলতা এবং পুনরভ্যুত্থানবাদী ঝোঁক ছিল। সেজন্য ঢালাওভাবে সবাইকে 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদী' আখ্যা দেওয়া আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

মুসলিম সম্প্রদায় বহুদিন পর্যন্ত সাধারণভাবে ইংরাজী শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকলেও সকলেই তা করেন নি। সংখ্যায় অল্প হলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিমদের মধ্য থেকেও ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে। একই রকম বিষয়গত কারণে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উপলব্ধি করেন যে নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মনকে সামন্তযুগীয় কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মান্ধতা ইত্যাদির শৃঙ্খল মুক্ত করাই প্রাথমিক কর্তব্য। তাঁরাও ইওরোপীয় যুক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোরাণ, হাদিস, ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষা প্রভৃতির যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামের গৌরবময় অতীতের স্মৃতি তুলে ধরেন। এঁদের বেলাতেও বলা চলে ধর্ম ছিল আধার, আধেয় ছিল নবযুগচেতনা। এইসব মানুষদেরও নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের বিরূপ সমালোচনা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কয়েকটি ধারা ছিল।

সেদিনের উভয় সম্প্রদায়েরই এই সব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট স্ব-বিরোধিতা ছিল। যাঁরা স্ব-বিরোধিতার পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তাঁরা অতীতের দিকে বেশি করে ঝুঁকেছেন। যাঁরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তাঁরা অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন। হিন্দুভারতের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরার মধ্যে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের সম্ভাবনা ছিল ঠিকই। যাঁরা পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তারা অ-সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবদাদী ভাবধারাকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁরা ছিলেন যুগপৎ ধর্মপ্রাণ (বহিরঙ্গ অর্থে নয়) এবং অ-সাম্প্রদায়িক। তেমনই ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরার মধ্যে 'প্যান ইসলাম' বা মুসলিম বিশ্বের প্রতি আনুগত্যের সম্ভাবনা ছিল। যাঁরা পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তাঁরা সেদিকে ঝুঁকেছেন। যারা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ ও শক্তিশালী

করেছেন। এঁরাও ছিলেন যুগপৎ ধর্মপ্রাণ এবং অ-সাম্প্রদায়িক। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা, জমিয়ত উল উলেমা-এ-হিন্দ ও 'দেওবন্দ' বিদ্যাপীঠের উলেমারা এই ধারার প্রতিনিধি।

ইংরাজী শিক্ষিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুটি ধারা ছিল। ধর্ম সেখানে মিলিত কার্যক্রমের পথে বাধা হয় নি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, মৌলভী লিয়াকত হোসেন, ফজলুল হক। তখন মিছিলে একই সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'আল্লাহো আকবর' আওয়াজ দেওয়া হত। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রথম দিকে শুধু মুসলিম কৃষকেরাই নয়, মুসলিম অভিজাতদেরও এক অংশ যোগ দিয়েছিল। পরে ব্রিটিশ শাসকের কূটচক্রে কিভাবে বিভেদ সৃষ্টি হয় সে ইতিহাস বিশদভাবে জানার ও বোঝার চেষ্টা প্রয়োজন। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্র তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয় আরও পরে। উভয় সম্প্রদায়ের ইংরাজী শিক্ষিতদের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ভাগবাঁটোয়ারা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত স্বার্থের সংঘাত ছিল সেই প্রক্রিয়ার পিছনে মূল কারণ। আজকার ভারতেও একই কারণে একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে যে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতার ব্যাধি এবং ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি মাথা তুলেছে তাও মূলত একই কারণে। সেই জটিল প্রক্রিয়ার মূল কারণগুলিকে বোঝার চেষ্টা না করে অতি সরলীকৃত যান্ত্রিক ছক সমস্যার সমাধানে আদৌ সাহায্য করে না।

এতক্ষণ যে সব কথা বলা হল তাকে কেউ কেউ হয়ত 'ধান ভানতে শিবের গীত' মনে করতে পারেন। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মৌলানা আজাদের সম্পর্কের বিষয়টি বুঝতে হলে ঐ পটভূমি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে (ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম) বর্ণনা করেছেন কিভাবে তিনি তখনকার দিনের অন্যতম প্রথম সারির বিপ্লবী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গেও তাঁর একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ক্রমে বিপ্লবী রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন এবং একটি গ্রুপে যোগদান করেন। সেই গ্রুপটির নাম

উল্লেখ করেন নি। এর কিছুদিন আগে ব্রিটিশের ষড়যন্ত্র ও উস্কানিতে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। ফলে বিপ্লবীদের অনেকে মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সন্দেহ যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মুসলিম সম্প্রদায়কে বিপ্লবী আন্দোলন দমনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। সুতরাং মৌলানা আজাদ বিপ্লবী দলে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁরা বিস্মিত হন এবং প্রথমটায় তাঁকে দলের অন্তরঙ্গ চক্রে প্রবেশ করতে দেন নি। আবুল কালাম আজাদ সহিষ্ণুভাবে যুক্তির সাহায্যে তাঁদের বোঝাতে সমর্থ হন যে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী মনে করাটা ভুল। কয়েকজন মুসলমান সরকারী কর্মচারীর দোষে গোটা সম্প্রদায়ের উপর দোষারোপ করাটা ঠিক নয়। বরং মুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রামে টেনে আনলে তা শক্তিশালী হবে। বিপ্লবী নেতাদের কয়েকজন তাঁর নিষ্ঠা এবং যুক্তির সত্যতায় নিঃসন্দেহ হন। মৌলানা আজাদ তখন মুসলিম তরুণদের মধ্যে কাজ শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে কয়েকজনকে বিপ্লবী আন্দোলনে টেনে এনে গোপন চক্র সংগঠিত করেন। তাঁর গোপন কার্যকলাপের পরিধি শুধু বাংলাপ্রদেশে সীমিত ছিল না। দুই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের কয়েকটি শহরে এবং বোম্বাইতে শাখা গড়ে তোলেন।

দুঃখের বিষয় মৌলানা আজাদ উক্ত গ্রন্থে বিশদ তথ্য পরিবেশন করেন নি। শুধু বলেছেন, এবিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানা গেলে তা খুবই আকর্ষণীয় হবে। সিডিশান কমিটি রিপোর্ট "একটি মুসলমান ধারা" (এ মহামেডান কারেণ্ট) শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে কিন্তু সেখানে মৌলানা আজাদের গোপন বিপ্লবীচক্রের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত তাঁরা সন্ত্রাসবাদী তথা সশস্ত্র কার্যকলাপে লিপ্ত হননি বলেই বাদ দেওয়া হয়েছে। যে সব গবেষক জাতীয় মহাফেজখানায় পুরাণো দলিলপত্র পরীক্ষা করে দেখছেন তাঁরা খোঁজখবর করলে হয়ত আলোকপাত করতে পারেন। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা আবদুর রেজ্জাক খানের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জেনেছি যে তাঁর সঙ্গে মৌলানা আজাদের যোগাযোগ ছিল এবং তিনি উক্ত গোপনচক্রের অস্তিত্বের কথা জানতেন।

পরিশেষে বলতে হয় প্রথম যুগে 'যুগান্তর' পত্রিকা বিপ্লবী চেতনার জাগরণে যে ভূমিকা পালন করেছিল, 'আল হিলাল' মুসলিম জনগণের মনে রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশপ্রেমের জাগরণে অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রসঙ্গ ঃ মহাহিন্দু সমিতি

অমর দত্ত

১

পারস্যদেশীয় ভাষা থেকে 'হিন্দু' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন বাঙলা ভাষায় এবং মধ্যযুগের গোড়ার দিকের বাঙলা ভাষায় 'হিন্দু' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না। বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' 'হিন্দু' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। (হিন্দুতে না দিবে ফুলপানি)। রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দী। উনিশ শতকে ইওরোপের জঙ্গম শক্তির আঘাতে আমাদের বস্তুগত ও ভাগবত জীবনে সীমাবদ্ধ নবজাগরণের সূচনা হলে 'হিন্দু' নামাঙ্কিত বহু প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'হিন্দু কলেজ', 'হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্‌স্টিটিউশন', 'হিন্দু ফ্রি স্কুল', 'হিন্দু ফিমেল স্কুল', 'হিন্দু বেনিভোলেন্ট স্কুল', 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ', 'হিন্দু থিয়েটার' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ডিরোজিওর শিষ্যদের তৃতীয় মুখপত্রের নাম 'হিন্দু পাইওনীয়ার'। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুসমাজের সংস্কার ও উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে 'হিন্দু' নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে সাতের দশকের শুরু থেকে 'হিন্দু' নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান, পুস্তক, বক্তৃতা প্রভৃতি জাতীয়তার দ্যোতনা বহন করতে থাকে। এর কারণ হল শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসনের যুগে, বিশেষ করে সাতের দশকে লগ্নী পুঁজির জয়যাত্রার সূত্রপাতে শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলময়তার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর আস্থা অনেকখানি কমে যায়। এই সময় মধ্যবিত্ত বা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর (যাঁরা মূলতঃ পেশাগত আয়ের উপর নির্ভরশীল) যে পরিমাণে কলেবর বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে না। পরাধীনতাকে দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হিসাবে অনুভব করে মধ্যবিত্তের একাংশ সচেতনভাবে হিন্দুজাতীয়তাবাদের উন্মেষে সচেষ্ট হন। পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা মোক্ষণের জন্য ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রশংসিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

'হিন্দু' ও 'আর্য্য' শব্দ দুইটিও সমার্থক হয়ে যায়। মধ্যযুগে প্রায় অব্যবহৃত 'হিন্দু' শব্দটি উনিশ শতকে কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের তিনের দশক থেকে ব্রাহ্মদের সঙ্গে সনাতনপন্থী হিন্দুদের ধর্মীয় বিরোধ থাকলেও ব্রাহ্মরা নিজেদের হিন্দুধর্মের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অধীনে উন্নতিশীল ব্রাহ্মরা 'নিউ-ডিস্‌পেনসেসন' বা সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনে বিশ্বধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হলে এবং ১৮৭২ খৃঃ কেশবচন্দ্রের অনুগামীরা সর্বত্রারি বিবাহ অনুমোদক আইন পাশ করালে আদি ব্রাহ্ম সমাজে এবং হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

থিয়োরীর দিক দিয়ে কেশবচন্দ্রের যুক্তির সারবত্তা ছিল—কেননা জাতি-বর্ণভেদহীন বিবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে রক্তের সঙ্গে রক্তের সংযোগে 'নেশন' গঠনের পথ সহজ হয়, কিন্তু বাস্তবে বিশ্বধর্মের প্রয়োগ খুব দুরূহ। কেশবচন্দ্রের বিশ্ব-ধর্মের প্রতিষেধকরূপে আদিব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে হিন্দুত্ব তথা জাতীয়তার চেতনা নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করলেন। রাজনারায়ণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে উল্লেখ করায় সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুরা খুশি হলেন কিন্তু বঙ্কিমের মত হিন্দুরা রাজনারায়ণের প্রশংসা করলেও বক্তৃতাটি একদেশ-দর্শী বলে অভিহিত করলেন—কেননা হিন্দুধর্মে সাকার ও নিরাকার দুই প্রকার সাধনার প্রচলন আছে। যাহোক, ব্রাহ্ম-নেতার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিন্দুত্ব তথা জাতীয়তাবাদকে নতুন রূপ দিল। ঐ সময় হতে হিন্দুর জাতীয়তাবাদী জাগরণের সূচনা বলে উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না।

২

রাজনারায়ণের জীবনে স্বাদেশিকতা ও ধর্মীয়তা সমার্থক হওয়ায় হিন্দুমেলার (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন মূল অনুপ্রেরণার উৎস। স্বাধীনতা লাভের চিন্তা তদানীন্তন যুগে কল্পনাতীত হওয়ায় হিন্দুমেলা দেশবাসীকে সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী করতে উদ্যোগী হয়েছিল। রাজনারায়ণ ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা-বাদী চিন্তাকে সবল করার জন্য একটি সংগঠন গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মদের হিন্দুধর্মের অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করে তিনি

'মহাহিন্দু সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন (ফাল্গুন, ১২৯৩)। রাজনারায়ণের প্রস্তাবনাটির উল্লেখ করা হচ্ছে :

১। কেবল হিন্দুরা মহাহিন্দু-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। যে কেহ হিন্দুকুলোদ্ভব ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মেতে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন তিনিই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। হিন্দুরা দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী।···

২। হিন্দুদিগের ধর্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুজাতির উন্নতিসাধন করা মহা হিন্দু সমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের ধর্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

৩। আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত উক্ত ঐক্য সাধন হইতে পারে না, যেহেতু তাঁহাদিগের ধর্ম আচার-ব্যবহার, পুরাকালীয় প্রবাদ, আমাদিগের ধর্ম, আচার-ব্যবহার পুরাকালীয় প্রবাদ হইতে বিভিন্ন। কিন্তু যখন আমরা একদেশবাসী ও এক রাজার অধীন, তখন তাঁহাদিগের সহিত অন্য ঐক্য না হউক, রাজনৈতিক ঐক্য অবশ্য সাধিত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ, সুরেন্দ্রবাবুর কারাগার গমন সময়ে মহারাজনৈতিক আন্দোলন এবং লর্ড রিপণের বিলাত গমন সময়ে তাঁহার অভিনন্দনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য।···

৪। মহাহিন্দু সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকিবে। তাহাতে "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। এ বাক্যের নিম্নে একটি পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি থাকিবে এবং তাহার নিম্নে "সনাতন ধর্মের জয়" এ বাক্যটি অঙ্কিত থাকিবে। পদ্মপুষ্প এদেশে ঈশ্বরের সৃজনশক্তি এবং দেবপূজার সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ গণিত হইয়া থাকে। ইহা হিন্দু দেবদেবীর পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সহিত সহস্র প্রকারে জড়িত রহিয়াছে।

৫। ···মহাহিন্দু সমিতির অধিবেশনে হিন্দুসমাজের সকল প্রকার উন্নতি অর্থাৎ হিন্দুদিগের ধর্ম, শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে।···সামাজিক বিষয় আদবে বিতর্কিত হইবে না। যেহেতু উহা হিন্দুসমাজের মধ্যে ঘোরতর বিবাদস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা আলোচনা করিতে গেলে সভাদিগের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। সমাজ সংস্কার কার্য্য স্বতন্ত্ররূপে সমাজসংস্কারকের হস্তে অর্পিত হওয়া কর্তব্য।

'মহাহিন্দু সমিতি' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কারণ উল্লেখ করে রাজনারায়ণ লেখেন—মুসলমানদিগের যেমন National Mahammedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারত প্রবাসী ইংরাজদিগের যেমন Anglo-Indian-Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদিগের Eurasian and Anglo-Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রযোজিত হইয়া, ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ প্রয়োজন হিন্দুদিগের অনেক আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধ সত্ত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।···

কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুঃখ নিবারণ জন্য এরূপ সমিতি সংস্থাপন করা যে আবশ্যক হইতেছে এমত নহে। দেববাণী সংস্কৃতের চর্চা ভারতবর্ষে এক প্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলে হয়। সরস্বতী দেবী এক্ষণে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া, রাইন নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের যুবকদিগের ক্রমশঃ শারীরিক অবনতি হইতেছে। আমাদিগের বিদ্যালয় সকলে ধর্ম্ম শিক্ষা না থাকা প্রযুক্ত যুবকদিগের নৈতিক অবনতি হইতেছে। তজ্জন্য এক্ষণকার লোকেরা ক্রমশঃ সংশয়বাদী, স্বার্থপর ও ইউরোপীয় বিলাসানুরাগী হইতেছে। আমাদিগের দেশের লোকে ক্রমশঃ পানাসক্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে দিন দিন দরিদ্রতার বৃদ্ধি পাইতেছে।···

যদি আমাদিগের স্বদেশীয় রাজা থাকিত, তবে এই দুরবস্থার প্রতিকার হইত। যখন তাহা নাই, তখন সাধারণবর্গের সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহা হওয়া কর্তব্য।···চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে কি এ কার্য্য কখন সাধিত হইতে পারে? গবর্ণমেণ্টের উপর সকল বিষয় এত নির্ভর করেন কেন? আপনারা কি এমন প্রত্যাশা করেন যে, যে অন্ন আপনারা ভক্ষণ করেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের মুখে তুলিয়া দিবেন? তাঁহারা বিদেশীয় লোক। আপনারা কি প্রত্যাশা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আপনাদিগেরই উপকার করিতে থাকবেন? এমন নিষ্কাম ধর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট হইতে কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।···

আমাদিগের সকলেরই এই কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্তব্য যে, আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।"

উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ক্রমবিকাশে হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবীরা মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে এই সময় ইংরাজী শিক্ষার প্রচার খুব কম হওয়ায় ইওরোপের জীবন দর্শন, গণতন্ত্র, স্বদেশ-প্রীতি প্রভৃতি আদর্শ মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এই কারণে উনবিংশ শতকের সাত, আট ও নয়ের দশকে হিন্দু স্বাদেশিকতার প্রসার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের ভারতের ইতি-হাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যমূলক মর্মার্থ বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন নি। ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে মোহ-ভঙ্গের কালে প্রাচীন ভারতের অনুশাসনগুলি সম্পর্কে স্বাদেশিকতার নামে নতুন মোহ সৃষ্টি হতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরা হিন্দু-বিধবার বৈধব্যের মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখলেন—জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন। তাঁরা অতীত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংকীর্ণ-তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে স্বাদেশিকতার সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করলেন। রাজনারায়ণ প্রমুখেরা অতীতমুখিনতার সাহায্যে স্বাদেশিকতার প্রচার করলেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে সযত্নে পরিহার করলেন। এইজন্য মহাহিন্দু সমিতির প্রস্তাবনায় শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মদের গ্রহণ করা হল। কিন্তু এক জায়গায় উদারপন্থী ও সংকীর্ণতাবাদী হিন্দুজাতীয়তা-বাদীদের খুব মিল ছিল—তাহল উভয়ই প্রাচীন ভারতের স্বার্থগন্ধহীন অধ্যাত্মবাদকে মাত্রাতিরিক্তভাবে গৌরবান্বিত করেছিলেন। এর ফল আমাদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ বলেছেন—"পাশ্চাত্য সভ্যতা মাত্রই বিষয়ানুবর্তিতা আর প্রাচ্য সভ্যতা মাত্রই স্বার্থগন্ধহীন অধ্যাত্মবাদ—এই ধরনের এক অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার হতে থাকল। এই তত্ত্বটি স্বাদেশিকতা প্রচারের কাজের দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকরী হলেও ভবিষ্যতে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।"

৩

মহাহিন্দু সমিতি নিছক ধর্মসভা নয়, রাষ্ট্রসভাও বটে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাধাকান্ত দেব প্রমুখদের ধর্মসভার লক্ষ্য ছিল সনাতন হিন্দুধর্মের

রক্ষা। উক্ত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত মহাহিন্দু সমিতির লক্ষ্য ছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে স্বাদেশিকতার উদ্বোধন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহাসভা প্রকৃতপক্ষে মহাহিন্দু সমিতির অধিকতর বিকশিত ও কার্যকরী সাংগঠনিক রূপের প্রকাশ। হিন্দু মহাসভা জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করেছে এবং ধর্মান্তরিতদের হিন্দুধর্মে পুনর্গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দুমহাসভার যে ভূমিকা তার বীজ অনেকাংশে মহাহিন্দু সমিতির মধ্যে নিহিত ছিল।

উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয় সেই প্রচেষ্টার নায়কেরা অনেকে হিন্দুর অতীত ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। রাজনারায়ণের দৌহিত্র অরবিন্দ একহাতে গীতা অন্যহাতে তরবারি নিয়ে বিপ্লবীদের দীক্ষা দিতেন। ঐযুগে ধর্ম ও রাজনীতিকে অভিন্নরূপে দেখার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার মূলে রাজনারায়ণের চিন্তার কিছু প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে রাজনারায়ণ অন্ততঃ কিছুসংখ্যক যুবকের মনে বিপ্লবের ভাববিলাস জাগরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—সুতরাং তাঁর প্রস্তাবিত মহাহিন্দু সমিতি যে হিন্দুত্ব ও স্বাদেশিকতাকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করার মানসিকতা গঠনে সহায়ক হয়েছিল একথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না।

উনিশ শতকের সাতের দশকে পেটিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী রায়তসভার মাধ্যমে কৃষকদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের শরিক হন—চা-বাগিচায় এবং অন্যত্র শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মধ্যবিত্তের যোগাযোগ গভীর হতে থাকে। সংবাদপত্র দলন, ইলবার্ট বিল প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিক্ষোভ ও গণ আন্দোলন, মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ন্যাশান্যাল কন্‌ফারেন্সের (১৮৮৪ ও ১৮৮৫) সাফল্য প্রভৃতিতে শাসক সম্প্রদায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় বিক্ষোভের মোকাবিলার জন্য তখন প্রায় সরকারী উদ্যোগেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। অন্যদিকে প্রশাসন গোপনে সাম্প্রদায়িক সংস্থা গড়ে তোলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। অর্থাৎ দুইটি পদ্ধতিতে আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা চলে। ধর্মকে কেন্দ্র করে স্বাদেশিকতার প্রচার সহজতর হওয়ায় উনিশ শতকের মনীষীরা সেই পথ গ্রহণ করেছেন—এতে প্রকারান্তে শাসকের সুবিধা হয়েছে এবং শাসক ইংরাজ মুসলমান সমাজকে জাতীয়তাবাদী

আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছে। এটাই হল মহাহিন্দু সমিতি বা অনুরূপ জাতীয় ধর্মভিত্তিক সংগঠনের অনাকাঙ্ক্ষিত ফল।

কিন্তু হিন্দুগন্ধী মনোভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত স্বাদেশিকতার আদর্শটির অজস্র সীমাবদ্ধতা থাকলেও তা বাঙলাদেশের জাতীয়তাবাদী তরঙ্গটিকে পুষ্ট করেছে—সেই দিক দিয়ে মহাহিন্দু সমিতির একটি ইতিবাচক দিক আছে। এই স্বাদেশিকতার আদর্শটিই ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রাজনারায়ণ বসু—বৃদ্ধ হিন্দুর আশা
২। সুকুমার সেন—Etymological Dictionary of Bengali
৩। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া
৪। নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা

মাষ্টারদা—মানুষ ও বিপ্লবী নায়ক।

সহায়রাম দাস

১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও অস্ত্রাগার দখলের সংগ্রামের মহানায়ক শহীদ সূর্য্য সেনের (মাষ্টারদা) সংস্পর্শে আসার সুযোগ যাঁদের হয়েছিল তাঁরা কেউ কেউ তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু মাষ্টারদার শিষ্য ও অনুগামী হয়েও নিরন্তর তাঁর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার খুব কমই ছিল। একমাত্র আমাদের দলের উচ্চতম নেতৃত্ব এবং পরবর্তীকালে মাষ্টারদা কর্তৃক আত্মগোপন অবস্থায় সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার সময়ে যে-সব কর্মী তদানীন্তন কাজের স্বার্থে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষেই মাষ্টারদাকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে মানুষ ও বিপ্লবী হিসাবে মাষ্টারদার চরিত্রের প্রকৃত মূল্যায়ন বিশদভাবে করা সম্ভবপর। তা' সত্বেও অতি স্বল্প সময়ের জন্য তাঁর সংস্পর্শে আসার যে সুযোগ আমি পেয়েছি এবং তাঁকে আমি যেরূপ দেখেছি ও বুঝেছি তাতে মানুষ ও বিপ্লবী হিসাবে মাষ্টারদার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গিয়েছে। সেজন্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ন জয়ন্তী বর্ষে স্বল্প পরিসরে হলেও তাঁর চরিত্রের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯২৭ সালের শেষদিকে পদস্থ সরকারী অফিসার হিসাবে আমার কাকা চট্টগ্রাম বিভাগে বদলি হলে আমিও লেখাপড়ার স্বার্থে আমার বাসস্থান রানাঘাট ছেড়ে তাঁর সঙ্গে সেখানে চলে যাই। সেখানে দু-তিন মাস কাজেম আলি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম নবমশ্রেণীতে। মাষ্টারদা যে একজন খ্যাতনামা বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতা সেখানে যাবার পর এরূপ কোন কথা প্রথমে আমার জানা ছিল না। পরে ঐ স্কুলেই আমার এক সহপাঠী, আমাদের প্রয়াত নেতা লোকনাথ বলের এক ভাই, শহীদ প্রভাস বলের নিকট প্রথম শুনি যে, সূর্য্য সেন বা মাষ্টারদা ওখানকার একটি স্কুলের শিক্ষক এবং জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী ও একজন খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা। পরে যখন মাষ্টারদাকে জানলাম তখন অবাক হয়ে গেলাম। দলের সভ্য হওয়ার পূর্বে বা পরে তাঁকে প্রায় রোজই আমার বাসার সম্মুখের রাস্তা দিয়ে তাঁর স্কুলে যেতে

দেখেছি। ছোটোখাট বেঁটে মানুষ, অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, অতি সাধারণ শ্যামবর্ণ চেহারা, স্বল্পভাষী, রাস্তা দিয়ে চলবার সময় নিঃশব্দে একেবারে প্রান্ত-দেশ দিয়া চলেন, নিজেকে জাহির করার জন্য যার বিন্দুমাত্র চেষ্টাই নেই—তিনি কিরূপে একজন বিরাট বিপ্লবী নেতা ও জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী হতে পারেন তা ভেবেই পেলাম না! কিন্তু দলের সভ্য হওয়ার পর আমার সেই ভুল ভাঙল মাষ্টারদার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়। সেই অবিস্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারের কথা সর্বশেষে লিখব।

মাষ্টারদার নাম বা খ্যাতি পূর্বে না শোনার কারণ হল যে, তিনি বর্তমান যুগের বহু নেতার মত নাম কিনবার জন্য আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না—আত্মপ্রচারও হামবড়া ভাব তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। আমি দলের সভ্য হবার পূর্বে বা পরে আমাদের বাসার নিকট যাত্রামোহন সেন হলে কংগ্রেস আহূত অনেক সভায় গিয়ে দেখেছি যে মাষ্টারদা সাধারণত কোন বক্তৃতাই দিতেন না, নিজেকে জাহির করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও দেখিনি, সর্বসমক্ষে সর্বাগ্রে এসে দাঁড়াতেন না, পিছনে থেকে প্রয়াত নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী বা অন্যদের বক্তৃতা প্রভৃতি দিতে এগিয়ে দিতেন—অথচ গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশ্নেই তিনি সকলের কাছে অত্যাবশ্যক ছিলেন। ক্ষমতালিপ্সাহীন ও নিরহংকারী এক নিরলস ও নীরব কর্মী হিসাবে মাষ্টারদাকে তখন দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। বাংলাদেশে তদানীন্তন বিপ্লবী দলের মধ্যে বিপ্লবী কর্মী বা নেতার গুণাগুণ সম্পর্কে একটা অত্যন্ত অবাস্তব ও বিমূর্ত (abstract) ধারণা প্রচলিত ছিল—যা ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুব সম্মেলনের সভাপতি রূপে একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা তাঁর অভিভাষণে প্রকাশ করেন। এর মূল কথা হল: একজন বিপ্লবীর যুক্তি, দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি কিছুই থাকবে না—তা তাঁর কাছে বিচার-বিবেচনার বিষয়ই নয়। তাঁর একমাত্র গুণ চিন্তা ও হবে বিপ্লবের পথে নির্মমভাবে এগিয়ে যাওয়া। রুশিয়ায়ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের এক পর্যায়ে নিকেইয়েভ প্রায় অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করায় লেনিন তাঁর এই অবাস্তব মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিবাদী চিন্তা ও বৃত্তিসমূহকে বাদ দিয়ে তাকে হৃদয়-হীন এক যন্ত্রের মত কল্পনা করা হাস্যকর ব্যাপার। অথচ ঐরূপ হাস্যকর বিপ্লবীয়ানাই বাংলাদেশে তখন আদর্শ হিসাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাষ্টারদাকে দেখেছি আদর্শ ও কর্তব্যের বৃহত্তর স্বার্থে সবকিছু ত্যাগস্বীকার

করতে প্রস্তুত থাকলেও মানবিক বৃত্তিসমূহ ও মুক্তিকে উপেক্ষা না করে তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়।

মাষ্টারদার সহধর্মিনী সাধারণ গৃহস্থ মেয়ে হিসাবে মাষ্টারদার মহত্তর আদর্শ ও কর্তব্যের কথা বুঝতেন না—স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন যাপনই তাঁর কাছে একমাত্র চিন্তা ছিল। মাষ্টারদা কোনরূপ বিপজ্জনক রাজনীতিতে যুক্ত থেকে বারবার জেলে যান বা তাঁর থেকে দূরে থাকেন এটা তাঁর একেবারেই কাম্য ছিল না। সেজন্য মাষ্টারদার বিবাহিত জীবন অত্যন্ত অশান্তিতে কেটেছে। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাজে নানারূপ বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন—এমনকি কোন কোন সময় আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু মাষ্টারদা তাঁর মানবিক অনুভূতির দিকটা ভুলে গিয়ে তথাকথিত নির্মম বিপ্লবী সেজে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁকে ত্যাগ করেন নি। কর্তব্যের আহ্বানে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হলেও বার বার তাঁকে বুঝিয়েছেন নিজের মহত্তর আদর্শ ও কর্তব্যের কথা এবং তা বিবেচনা করে স্ত্রীকে যথাসম্ভব তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে।

১৯২৮ সালে ছাত্রাবস্থায় আমার নিকট পার্টি সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাব এলে আমি একটি সর্তে তা গ্রহণ করতে রাজি বলে মাষ্টারদাকে জানাই : আমার কাকা পদস্থ সরকারী গেজেটেড অফিসার হওয়ায় আমি নিজ বাড়ীতে থেকে প্রকাশ্যে কোন পার্টি কাজ বা মেলামেশা করতে পারব না। আমাকে অত্যন্ত গোপনীয় পার্টি কাজে নিযুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনের সময়ে আমি চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হব না। প্রকাশ্য কাজের ফলে আমার কাকার চাকুরী গেলে আমাদের এক বিরাট যুক্ত পরিবার অনশনের সম্মুখীন হবে। তৎকালে সর্তাধীনে পার্টি সভ্যপদ দেওয়া হত না। কিন্তু মাষ্টারদা আমার এই সর্তকে মানসিক দুর্বলতা বা অবৈপ্লবিক মনে না করে একজন কর্মীর বাস্তব সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করেন এবং সাংগঠনিক স্বার্থে কেবলমাত্র আমার সদস্যপদই মঞ্জুর করেন নি—অন্য কোন পার্টি নেতার নির্দেশের ফলে কোন সময়ে ঐ গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তাঁর হস্তক্ষেপের স্বার্থে পূর্বাহ্নে আমাকে তা জানাতে বলেন।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পূর্বে আমি গৃহত্যাগ করে চলে গেলে নিরুদ্দেশ হয়েছি বলে কাকা পুলিশে ডায়েরী করেন। পরবর্তীকালে জালালালা বাদ

যুদ্ধের পর আমি প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ী ফিরে আসায় এবং চট্টগ্রামের তদানীন্তন ভয়াবহ পরিস্থিতি ও তুচ্ছ কারণে পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক নির্যাতনের অবস্থায় কাকা আতঙ্কিত হয়ে আমার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পুলিশকে দেওয়ার ফলে আমি গ্রেপ্তার হই—এতে কোন দুরভিসন্ধি বা প্রলোভন ছিল না, আতঙ্কই প্রধান কারণ। সরকারের উপর অনির্ভরশীল ও আত্মনির্ভর আর একজন অভিভাবকও অনুরূপ কারণে জালাল বাদ যুদ্ধ প্রত্যাগত তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে কোতোয়ালী থানায় নিয়ে এসে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু মাষ্টারদা সমগ্র ঘটনা সম্যকভাবে না জানায় কেবলমাত্র আমার কাকাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন এবং সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার পর চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে আমার মতামত জানতে চান। আমি সমগ্র ঘটনা তাঁকে জানিয়ে এই অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করি। মাষ্টারদা প্রকৃত অবস্থা জানার পর ঐ পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। এই ঘটনাও তার দ্বারা বোঝা যায় যে, মাষ্টারদা শুধুমাত্র আবেগ ও অতিবিপ্লবী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হতেন না—জীবনের বাস্তব ঘটনা ও সমস্যাকে উপেক্ষা না করে তার যথাযোগ্য মূল্য দিতেন।

আবার, জালালা বাদযুদ্ধের সময় একটা ঘটনায় মাষ্টারদাকে দেখলাম আর এক দৃষ্টিতে—কর্তব্যে অচঞ্চল ও বন্ধুবৎসল মানুষ মাষ্টারদাকে। জালালা-বাদ যুদ্ধের সময় অম্বিকাদা (চক্রবর্তী) আমার বাঁ পাশে মেসিনগানের গুলি খেয়ে সংজ্ঞা হারালে তাঁকে মৃত মনে করে আমি তাঁর পকেট থেকে কাগজপত্র, টাকা প্রভৃতি নিয়ে মাষ্টারদাকে দিয়ে জানালাম যে অম্বিকাদা মারা গিয়েছেন (সকলেই তাই জানত)। কিন্তু পরে জানা যায় যে, অম্বিকাদার কপালে যে গুলি লেগেছিল তা তাঁর মস্তিষ্ক ভেদ করে নি—বেশ কিছুটা ক্ষত করে পিছলে চলে যায় এবং প্রচুর রক্তস্রাব ও শক লেগে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পরে শেষরাত্রে জ্ঞান ফিরলে কোনক্রমে পাহাড় থেকে নেমে গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করেন। তখন মাষ্টারদার মধ্যে কোন চঞ্চলতা দেখি নি—নিজের কর্তব্য করে চলেছেন। আমার নিজস্থানে ফিরে এসে যখন পুনরায় গুলিবর্ষণ করে চলেছি তখন একটু পরেই দেখি মাষ্টারদা ধীরস্থিরভাবে আমার পাশেই অম্বিকাদার নিশ্চল দেহের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এলেন। অম্বিকাদা মাষ্টারদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ক্ষণকাল স্থিরভাবে তিনি অম্বিকাদার দিকে তাকিয়ে রইলেন—কয়েক ফোঁটা জল তাঁর গণ্ড বেয়ে

গড়িয়ে পড়ল। আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি মাষ্টারদাকে এই প্রথম দুঃখে চোখের জল ফেলতে দেখলাম। মাষ্টারদাকে কোন নিষ্প্রাণ বিপ্লবী-রূপে নয়—মানুষ ও বন্ধুবৎসল মাষ্টারদাকে এবার নতুন করে দেখলাম।

হলঘাটে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মাষ্টারদা, নির্মলদা (সেন) প্রভৃতিকে তাঁদের সাময়িক আশ্রয়স্থল ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টায় যে সশস্ত্র খণ্ডযুদ্ধ হয় সেখানেও দেখা যায় বিপ্লবী ও মানুষ মাষ্টারদার প্রকৃত রূপ। পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী যখন তাঁদের আশ্রয়স্থল প্রায় ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ করছে এবং নির্মলদা, মাষ্টারদা প্রভৃতি যখন পাল্টা গুলি চালাচ্ছেন সে সময়ে মাষ্টারদা ধরা না পড়ার স্বার্থে নির্মলদা বারবার মাষ্টারদাকে অনুরোধ করতে থাকেন প্রীতিদি ও অন্যান্যদের সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে, না হলে সৈন্যরা তাঁদের সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করবে—যা চট্টগ্রাম বিদ্রোহের স্বার্থে বিপর্যয়কর হবে। মানুষ মাষ্টারদা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নির্মলদাকে মৃত্যু-মুখে ফেলে রেখে যেতে অস্বীকার করেন। কিন্তু নির্মলদা যখন কঠোর নির্দেশের স্বরে তাঁকে বললেন যে বিপ্লবের স্বার্থেই তাঁর বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং সেজন্য তাঁকে যেতেই হবে—তখন বিপ্লবী মাষ্টারদা আর সে অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। প্রীতিদি প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিঃশব্দে সেই ব্যূহ ভেদ করে বাইরে চলে গেলেন।

চরম লক্ষ্য ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে মাষ্টারদা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও ক্ষমাহীন। ১৯৩০ সালের ১৭ই এপ্রিল (অস্ত্রাগার দখলের পূর্ব-দিন) আমি জেলা কংগ্রেস অফিসে থাকার সময় মাষ্টারদা খুব সকালে আমাকে একান্তে ডাকেন রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স অস্ত্রাগারে গিয়ে কতকগুলি গোপন খবর এনে তাঁকে জানাতে। একান্তে যখন তিনি আমাকে এই গোপন ব্যাপার সম্পর্কে বলছিলেন তখন অম্বিকাদা ঔৎসুক্যবশত সেখানে উপস্থিত হলে মাষ্টারদা তাঁকে কঠোর তিরস্কার করেন গোপন সংগঠনের রীতি-নীতি না মেনে চলার জন্য।

আবার, ১৯২৯ সালের শেষদিকে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের সময় আমাদের বিরোধীপক্ষ পরাজিত হয়ে সেই সম্মেলন ভেঙ্গে দেবার প্রচেষ্টায় আমার সহপাঠীবন্ধু ও হলের দ্বাররক্ষক স্বেচ্ছাসেবক সুখেন্দু দস্তকে ছোরা মেরে হত্যা করে এবং আমাদের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা নির্মলদার মাথা ফাটিয়ে দেয় ও বেদম প্রহার করে। এই ঘটনায় আমাদের দলের ছেলেরা

উত্তেজিত হয়ে প্রয়াত শহীদ নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য প্রভৃতির নেতৃত্বে মাষ্টারদার কাছে গিয়ে দাবী করেন সুখেন্দু ও নির্মলদাকে যারা মেরেছে বা অপমান করেছে তার প্রতিহিংসা গ্রহণের অনুমতি দিতে। আসন্ন বৃহত্তর আদর্শ ও বিদ্রোহের সাফল্যের স্বার্থে তাদের এই উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় এটা বারবার তিনি বুঝাবার চেষ্টা করলেও তাঁরা তা মেনে নিতে চায় নি। তখন মাষ্টারদা অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর কণ্ঠে তাদের বলেন যে, আসন্ন বৃহত্তর সংগ্রামকে ভুলে গিয়ে বিরোধীপক্ষের প্ররোচনায় পড়ে মহত্তর সংগ্রামকে যারা বিফল করে দিতে চায় তাদের বিপ্লবীপনাকে বরদাস্ত করতে তিনি রাজী নন—কোনরূপ গোলমাল করলে পার্টি তাদের কঠোর শাস্তি দেবে। তাঁর এই দৃঢ় ও কঠোর নির্দেশে সকলেই সম্বিৎ ফিরে পায় এবং তা মেনে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করে।

পরিশেষে, মাষ্টারদার সঙ্গে আমার প্রথম অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে।

১৯২৮ সাল···তখন সবেমাত্র আমি মাষ্টারদার দলের সদস্য হয়েছি। দলের কোন সদস্যই খুব তাড়াতাড়ি সরাসরি মাষ্টারদা তো দূরের কথা, অন্যান্য বড় নেতাদের সঙ্গে ও সহজে দেখা করতে পারতেন না। ছোট-মাঝারি অনেক নেতার অধীনে দীর্ঘদিন কাজ করার পর বড় নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হত। সেজন্য আমি যে শীঘ্র মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে পাব এ আশা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু তার কয়েকদিন পরে আমার সহপাঠি বন্ধু ও রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু সুখেন্দু দত্ত আমাকে জানাল মাষ্টারদা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। এ কথা শুনে আমি যুগপৎ অশেষ আনন্দিত ও আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—কারণ এ সুযোগ এত অল্প দিনের মধ্যে অনেকেরই হয় না।

সুখেন্দুর কথামত নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সন্ধ্যার পর অতি সন্তর্পণে দেওয়ান বাজারে জেলা কংগ্রেস অফিসে গিয়ে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর মধ্যে কোন বড় নেতার অহমিকা দেখলাম না—পরম স্নেহভরে আমাকে কাছে বসিয়ে কথা সুরু করলেন। প্রথমেই শুনলেন আমার পারিবারিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে—একমাত্র চাকুরী-সম্বল আমার কাকার দ্বারা আমাদের সমগ্র পরিবার প্রতিপালিত এবং বিরাট এক যুক্ত পরিবার তাঁর উপর নির্ভরশীল, পরিবারের কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্য আছে কিনা ইত্যাদি

এবং সেখানে কিভাবে চলতে হবে তারও কিছু পরামর্শ দিলেন। তারপর সুরু হল তাঁর রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা। শান্ত-শিষ্ট ও নিরীহ যে মাষ্টারদাকে পূর্বে দেখেছিলাম এখন দেখলাম সে মাষ্টারদা আর তা নেই। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতই তাঁকে পূর্বে দেখেছিলাম, এখন দেখলাম তাকে এক অগ্নিবর্ষী সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রূপে। পরাধীনতার যাতনা, বৃটিশ শাসনের অবিচার-অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিরোধ ও মুক্তিসংগ্রাম, তাকে দমন করার জন্য বৃটিশের নানা ধূর্ত প্রচেষ্টা ও ভূয়া শাসন সংস্কার, দেশের ব্যাপক দুঃখ-দুর্দশা, ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস করার জন্য তাদের অমানুষিক অত্যাচার এবং তাদের অর্থনৈতিক শোষণ ও স্বার্থের বাস্তব নগ্নরূপ প্রভৃতি যখন তিনি আমার কাছে বর্ণনা করছিলেন তখন যেন মনে হল এক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি থেকে জ্বলন্ত তরল লাভাস্রোত বেরিয়ে আসছে যা তার সম্মুখের সব কিছুকেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করবে। মাষ্টারদার মত একজন নিরীহ মানুষের মধ্যে যে এত তেজ, অত্যাচার-অবিচারের প্রতি এত ঘৃণা এবং দেশের মানুষের প্রতি যে এত ভালবাসা ও মমতা এবং সেই বৃটিশ শাসনের নরককুণ্ড থেকে তাদের মুক্তি দেবার যে এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তা কল্পনাই করতে পারি নি। অত্যাচারের বিভিন্ন উদাহরণ যখন তিনি দিতে লাগলেন তখন তা' শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি মেজর বি. ডি. বসুর লেখা "ভারতে খৃষ্টীয় শক্তির অভ্যুদয়" ("Rise of the Christian Powers in India") এবং "ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য-এর ধ্বংসসাধন" (Ruin of the Indian Trade and Industry") বই দুটির কথা উল্লেখ করেন, বারবার তা আমাকে পড়তে বলেন এবং বলেন যে ঐ দুটি বই না পড়লে ভারতে বৃটিশ শাসকদের রাজনৈতিক যথেচ্ছাচার ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রকৃত বাস্তব রূপ বোঝা যায় না। তখনকার দিনে রজনী-পাম দত্তের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা "আজিকার ভারত" বইটি ছিল না—যার মধ্যে বৃটিশের রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও অর্থনৈতিক শোষণের নগ্নচিত্র আছে। পরে মেজর বসুর ঐ বই দুটি পড়ে বুঝলাম যে বৃটিশ শাসন ও অর্থ-নৈতিক শোষণের চিত্র হিসাবে সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল তদানীন্তন যুগে—যদিও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা নয়।

কিন্তু মাষ্টারদার সঙ্গে কথা শেষ করে ফিরবার পূর্বমুহূর্তে মাষ্টারদা আমাকে যে সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন তা অবিস্মরণীয়—

এখনও মনে রেখেছি, ভবিষ্যতেও রাখব। তিনি বললেন: "সহায় রাম, একথা কখনও ভুলো না যে, দেশ' কথাটার অর্থ ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ ভারতের ভূমি বা মাটীকে বুঝায় না—দেশের 'স্বাধীনতা' বলতে এই ভূমিকে বৃটিশের হাত থেকে দখল করা বুঝায় না। 'দেশ'-এর অর্থ হচ্ছে তার বিপুল-সংখ্যক জনগণ, দেশের স্বাধীনতার অর্থ হ'ল তার এই বিপুলসংখ্যক জনগণের স্বাধীনতা —যাতে তারা নির্ভয়ে কথা বলতে পারে ও সকল রাজনৈতিক অধিকার পায়, মানুষের মত খেয়ে-পরে যাতে তারা বাঁচতে পারে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা পায় এবং মানুষের মত থাকবার কোন ঠাঁই পায়। আমরা এই স্বাধীনতার জন্যই লড়ছি।"

মাষ্টারদার উপরোক্ত কথাগুলি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তদানীন্তন যুগে বিপ্লবীদলের অনেক নেতাই বৃটিশ শাসন ও অত্যাচারের কথা বলতেন, তাও অনেক সময় ভাসা-ভাসাভাবে। কিন্তু মাষ্টারদার মত এরূপ বিশদ ও নগ্নরূপে বৃটিশ শাসনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপের কথা আর কারও কাছে শুনি নি। এমনকি স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়, তার বাস্তব রূপ কি তাও কারও কাছে শুনি নি—রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা শুনলেও অর্থনৈতিক দিকটা একেবারে অন্ধকারে ছিল। সেজন্যই মাষ্টারদার উপরোক্ত 'স্বাধীনতা"র সংজ্ঞা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—যার বিশ্লেষণ সুদূরপ্রসারী। আমার দীর্ঘ কারাবাসের সময়ে কেবলমাত্র গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ পূর্বেকার পথ ও আদর্শ সম্পর্কে আত্মসমীক্ষাই নয়, মাষ্টারদার উপরোক্ত কথাগুলিও আমাকে আমার পূর্বতন পন্থা ও আদর্শ সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ গ্রহণে সাহায্য করেছে।

মাষ্টারদার উপরোক্ত কথাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশের অগণিত দরিদ্র জনগণকে মোটা ভাত-কাপড়, আশ্রয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তা করা সম্ভব নয়। কারণ এই সমাজব্যবস্থার অগ্রগতি ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র ও নিঃস্ব করে তাদের অর্দ্ধাহার ও অনাহারের পথ প্রশস্ত করে। এমনকি ছোটো-খাটো উৎপাদক মালিককেও নিঃস্ব করে সর্ব্বহারায় পরিণত করে। সরল পণ্য উৎপাদন সমাজব্যবস্থায়ও—যেখানে উৎপাদক নিজেই মালিক—এটা করা সম্ভব নয়। কারণ মার্কসীয় অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে সরল পণ্য উৎপাদনব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবীরূপে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনব্যবস্থায় পরিণত হয় (simple co-

mmodity production inevitably develops into capitalist production)। অতএব মাষ্টারদা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা একমাত্র সফল হতে পারে জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মুক্তিতে—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। মাস্টারদার সময়ে ভারতে সমাজতন্ত্রের আদর্শের এত প্রসার লাভ ঘটেনি—মাষ্টারদা বা অন্য কোন নেতার মুখে সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা শুনি নি। কিন্তু মাষ্টারদা একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও আন্তরিকতাপূর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে যে স্বাধীনতা চেয়েছেন তার পূর্ণ পরিণতি হল সমাজতন্ত্রে।

জনগণের মোটা ভাত-কাপড়, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের আশায় যাঁরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন তাঁদের আজ বুঝতে হবে যে, তাঁদের স্বপ্ন একমাত্র সমাজতন্ত্রে সফল হ'তে পারে।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার আর এক অধ্যায় (২)

রণেন সেন

১৯৪২ এর সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত সভা হয়। সভ্য ছাড়াও বঙ্কিমবাবু, দিল্লির যাজ্ঞী দত্ত শর্মা (ওয়াই ডি), সাজ্জাদ জহীর (বান্নে ভাই) ও রাজেশ্বর রাও নিমন্ত্রিত হিসাবে হাজির থাকেন (বোধ হয় বিশ্বনাথও)। সভায় পার্টির জনযুদ্ধের নীতি ও কার্যক্রম অনুমোদিত হয় ও পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী, ব্যাপক, গভীর ও দৃঢ়তর করবার কার্যসূচী গৃহীত হয়। স্থির হয় যে ১৯৪৩ এর মে মাসে বোম্বাইতে পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সভায় অসুস্থ থাকায় অজয় ঘোষ অনুপস্থিত ছিলেন। তার পূর্বেই কমরেড ভরদ্বাজ গোপন অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জামশেদপুরে পার্টির বিস্তার

ছাড়া পাবার কিছুকাল পরেই আমাকে জামশেদপুরের পুরানো ছিন্নসূত্র বেঁধে পার্টিকে দাঁড় করার জন্য পাঠান হয়। কলকাতা থেকে বর্মা ফেরৎ কমরেড বারীন দত্ত অন্য কয়েকজনকে সেখানে পাঠান হয়। ধরনীদাকেও পাঠান হয়। সেখানে পার্টি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তখন জামশেদপুরে বাঙালীরা সংখ্যায় সর্বাধিক ছিল। পার্টি বাড়তেও থাকে তাদের মধ্যে প্রধানত। কোনও টি ইউ গঠন করা সম্ভব হয় না। কারণ আব্দুল বারী ও কংগ্রেসীরা সব শিল্পে টি ইউ গঠন করেছিল। এই জামশেদপুরের পার্টি ১৯৫৪ পর্যন্ত বাংলা পার্টির একটা জেলা হিসাবে চলেছিল। তার পরে বিহার পার্টির সাথে যুক্ত হয়, যদিও কলকাতার সঙ্গে তার আত্মিক ও আন্দোলনগত (টি ইউ) যোগাযোগ থেকেই যায় নানা কারণে অনেক কাল পর্যন্ত।

বস্তুত বাংলাদেশের পার্টিই সমগ্র পূর্ব ভারতে কমিউনিজমের ভাবধারা প্রচারে ও পার্টি গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

আসামের পার্টি

পূর্বে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে আসামে পার্টি গড়ে ওঠে বাংলার পার্টির চেষ্টায়। সুরমাভেলী কংগ্রেস (সিলেট) বাংলা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকায় সিলেট মারফৎ আসামে অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়। পার্টি থেকে (১৯৪০ এ) প্রশান্ত সান্যাল সেখানে কাজ করেন কিছু পরে বিশ্বনাথ আসামের ভারপ্রাপ্ত সি. সি. ও (কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক) হয়ে কাজ করেছেন (১৯৪২ থেকে কিছুকাল)।

বাংলাদেশে সব জেলায়, মহকুমা শহরে এমন কি বহু গ্রামে পার্টি গঠিত হয়। (১৯৪২।৪৩এ) দার্জিলিংএও সুশীল চ্যাটার্জির প্রচেষ্টায় ঐ সময়ই পার্টি গড়ে ওঠে। রতনলাল ব্রাহ্মণ তখনই পার্টিতে যোগ দেন (১৯৪৩)। সুদূর চট্টগ্রাম দিনাজপুর থেকে বাঁকুড়া বীরভূম পর্যন্ত পার্টি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

বিভিন্ন শিল্পে বিশেষত ইনজিনিয়ারিংএ, ট্রামে, বাসে বিড়ি ও ইবি রেলে টি ইউ সংগঠন বৃদ্ধি পায় ও ব্যাপকতর হয়ে দাঁড়ায়। তখন এই সব শিল্পে টি ইউ গড়ার কাজে, জনযুদ্ধের নীতি প্রচারে ও ফ্যাসীবাদ বিরোধী মনোভাব বিস্তারের জন্য প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় জনসভা ও পার্টি জিবির জন্য বিভিন্ন নেতাকে পাঠান হয়। এই রকম একটা ব্যাপারে রংপুরে আমি ও মনিকুন্তলা সেন যাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর জেলাশাসক ১৪৪ ধারা জারী করে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ করে। ঐ সময় ইবি রেল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন (প্রতিষ্ঠাতা লাহিড়ী—১৯৩১) ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ১৯৪৫ নাগাদ এই ইউনিয়ন ব্যাপকতম শ্রমিককে সংগঠিত করে, এবং জ্যোতি বসু ক্রমশই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন।

—বোধ হয় '৪২ এ বাংলায় লীগ মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যায় ও হক সাহেব ও শ্যামাপ্রসাদের মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীত্বর পিছনে কংগ্রেসের সমর্থন থাকে। কিন্তু দুটি প্রধান ঘটনা ঘটে—(১) ১৯৪৩এ মেদিনীপুর ও সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক ও ভয়াবহ ঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ফলে শত শত গ্রাম নষ্ট হয় ও সহস্র সহস্র নরনারী মারা যায়। বৃটিশ সরকার রিলিফের জন্য বিশেষ কিছুই করে না এবং জনসাধারণ দ্বারা গঠিত রিলিফ সমিতিগুলিকে সামরিক গোপনতার অজুহাতে কাজ করতে দেয় না। প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদবাবু পদত্যাগ করেন মন্ত্রীসভা থেকে।

(২) বিধান সভার কংগ্রেসী দলের নেতা শরৎ বসুকে সরকার গ্রেফতার করে, ফলে কংগ্রেস দল মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

উভয় কারণের ফলে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার পতন হয় ও আবার লীগ মন্ত্রী-সভা কায়েম হয়।

মুসলিম মহলে লীগ প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে প্রায় একচেটে ক্ষমতার অধিকারী হয়। জাতীয়তাবাদী বা কংগ্রেসী মুসলিমদের প্রায় কোনও প্রভাব মুসলমান সমাজে পরিলক্ষিত হয় না। ১৯৪০ এ লাহোরে লীগ সম্মেলনে হক্ সাহেবই পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যদিও পরবর্তী কালে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও ঐ সম্মেলনে গৃহীত পাকিস্তানের প্রস্তাবের শব্দার্থ ও ভাবার্থে গরমিল ছিল। এই গরমিলই পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা তাঁদের দাবীর ভিত্তি করেন। সে কথার এখানে উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট। ১৯৪০ এর পর থেকেই লীগের প্রভাব, সংগঠন ও ক্রিয়াকলাপ বাংলার গ্রাম ও শহরে উত্তো-রোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম জনগণ দ্বারা কংগ্রেস প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান দাবীর সাথে সাথে তীব্র হিন্দু ও কংগ্রেস বিদ্বেষ ও তার পাল্টা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বাংলার আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করে তোলে। যার বিষময় পরিণতি ১৯৪৬ এর দাঙ্গা।

প্রথম পার্টি কংগ্রেস

১৯৪৩ এর মে মাসে বোম্বাইতে পূর্বনির্ধারিত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার কয়েকজন প্রতিনিধির নাম উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমবাবু, কনক, মুজাফফর আহমদ. মোমিন, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ডাঃ সমর রায় চৌধুরী, সরোজ মুখার্জি, ধীরেন মজুমদার, খোকা রায়, মণি সিং, ইন্দ্রজিৎ, নেপাল নাগ, রসুল সাহেব, প্রমোদ দাশগুপ্ত, খাঁ সাহেব প্রমুখ। স্নেহাংশু, লতিকা, বেলা লাহিড়ী প্রমুখ আরও অনেকে নিমন্ত্রিত হিসাবে যোগ দেন। সকলের নাম মনে নেই।

পাঞ্জাব থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লিট্টো (পরে ঘোষ হন), পেরিন ভারুচা (পরে রমেশচন্দ্র হন)।

কংগ্রেসে নতুন সিসি নির্বাচিত হয় যা থেকে পুরোনো কয়েকজন সভ্য বাদ যান যথা হালিম, মিরাজফর, ডাঃ জেড এ আহমেদ। নতুন নির্বাচিত হন ভবানী সেন, বিশ্বনাথ, রাজেশ্বর রাও, সাজ্জাদ জহীর, সরদেশাই, ওয়াই ডি,

কৃষ্ণান, মোহনকুমারমঙ্গলম, রণদীভে, ডাঙ্গে। তখনও বাংলায় থাকলেন লাহিড়ী, ভবানী, বিশ্বনাথ, রণেন।

পি সি জোশী পার্টি সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন। জোশী, অধিকারী ও রনদীভে দ্বারা পলিটিক্যাল ব্যুরো গঠিত হয়। স্যুতাহাস্ট রোডের "রাজভবনে" (বাড়ীটার নাম) পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস রাখা হয়।

কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন

১৯৪৩ সালের কর্পোরেশন নির্বাচন সম্বন্ধে এখানেই লেখা দরকার।

কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদের বিশেষ দুটি সংরক্ষিত আসন ছিল। শহীদ সুহরাবর্দ্দী তখন হক্-নাজিম মন্ত্রীসভায় শ্রমমন্ত্রী, সুতরাং স্বভাবতই তাঁর হাতের শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিকের নামে মালিকদের সংগঠন নিয়ে তিনি আসরে নামলেন। তাঁর হাতে বিস্তর রিক্সা ভোট ছিল।

আমরা প্রথমত ট্রাম শ্রমিকদের ও পোর্ট শ্রমিকদের দরখাস্ত করিয়ে কয়েক সহস্র ভোটার করাই। ট্রাম ও পোর্টের কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করেন কারণ ঐ দুটি ইউনিয়নই শতকরা ৯০ জনের প্রতিনিধিত্ব করত ও আমাদের দ্বারা পরিচালিত ছিল আর রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড অভিযান চালাই। এই উভয় কাজে ক্ষিতি বর্মন (এখন সি পি এম), মাখন চ্যাটার্জি (পোর্টের নেতা), কেশবনারায়ণ মিশির ও জহীর, ধীরেন মজুমদার, গোপাল আচার্য্য প্রভৃতি ভীষণ পরিশ্রম করেন। সুহরাবর্দ্দীর দল ভেবেছিল যে শেষ পর্যন্ত জাল ভোটে তারা জিতবে। কিন্তু যেখানে সংগঠিত শ্রমিক প্রস্তুত সেখানে কোনও কারচুপী চলে না।

ঐ দুই শ্রমিক কেন্দ্রে লাহিড়ী ও ইসমাইল আমাদের প্রার্থী ছিলেন। তাঁরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হন। নির্বাচন উপলক্ষে দারুণ উত্তেজনা ও উৎসাহ শ্রমিক মহলে সৃষ্টি হয়। পার্টিরও প্রতিষ্ঠা শুধু শ্রমিক মহলে নয় জনসাধারণের অন্য অংশের মধ্যেও হয়।

ঐ সময় বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক শিল্পে—চটকলে, সুতাকলে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, ইবি রেলে, ট্রামে, পোর্টে, বাসট্যাক্সী, পটারী ও অন্যান্য শিল্পে পার্টির প্রচণ্ড প্রভাব ও সংগঠন। চট্টগ্রাম বন্দরে, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায়

সূতাকলে, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর সন্তাহারের রেল অঞ্চলে, বাঁকুড়ার বিড়ি শিল্পে আমাদের প্রায় একাধিপত্য।

এ আই টি ইউ সি সম্মেলন

১৯৪৩এ নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এন এম জোশী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে রিপোর্ট পেশ করেন। তার আগে ১৯৩৮ এ সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি যুক্ত হয় সেকথা আগেই লিখেছি। এই নাগপুর সম্মেলনে সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টি সুগঠিতভাবে যোগ দেয়। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি যায়। বাংলা থেকে যাঁরা যান তাঁদের নাম যা মনে পড়ে লিখছি—মোমিন, জলিকাউল, আমি, লাহিড়ী, নেপাল নাগ, বীরেন ব্যানার্জী, নীরোদ চক্রবর্তী, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি; বোম্বাই থেকে ডাঙ্গে, রুন্দীভে, মিরাজকর, পাটকর, তাম্বিটকর ইত্যাদি; পাঞ্জাব থেকে মহেন্দ্র সেন, ফজলে ইলাহি কোরবান, সোহ্নি খাঁ প্রভৃতি। সভায় মূল বিতর্ক পাকিস্তান দাবী ঠিক কিনা। দাবী সমর্থন করে আমি ও ছত্তর আলী বক্তৃতা দিই, বিরোধিতা করেন মৃণালকান্তি বোস ও অন্য একজন। যাই হোক ভোটাভুটি হয় না। সভাপতি নির্বাচিত হন এস এ ডাঙ্গে, সাধারণ সম্পাদক এন এম জোশী, সহ-সম্পাদক মিরাজকর ও শান্তাভালেরাও (পরে মুখার্জী)। কমিউনিস্টদের প্রভূত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও কমিটিতে আমরা সে সংখ্যা দাবী করি না। গিরি প্রভৃতি কিছু নেতারা অগস্ট আন্দোলনে জেলে ছিলেন।

আবার সংযুক্ত টি ইউ আন্দোলনের বিরাট সূচনা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশেও বি পি টি ইউ সি পুনর্গঠিত হয়। মৃণালবাবু সভাপতি নির্বাচিত হন। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও সি এস পি (শিবনাথ) সকলকে নিয়ে শক্তিশালী কাঠামো খাড়া হয়। আমাদের তরফ থেকে মোমিন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হন, অন্যজনের নাম সুধীন প্রামাণিক।

পার্টি ও মুসলীম লীগ

পার্টি বস্তুত লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে বিশেষ মৌলিক কোনও পার্থক্য করতো না, যদিও অনেক লীগ নেতাকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করতো। কিছু লীগ নেতা ও কর্মীকে প্রগতিশীল আখ্যা দিত যথা—বাংলার লীগ নেতা

আবুল হাশেম, হবিবুল্লা বাহার ও অন্যান্য কয়েক জনকে প্রগতিশীল মনে করতো। লীগের পাকিস্তানের দাবীও পার্টি মোটামুটি ন্যায্য মনে করতো। সে সময় পার্টির বক্তব্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে জাতির অস্তিত্ব সম্ভব বিশেষতঃ ভারতে সেই বিশেষ অবস্থাতে। লীগের পাকিস্তানের দাবীর পিছনে যে অগণিত মুসলিম জনসাধারণ জমায়েত হয়েছিল পার্টি মোটামুটি তাকে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচায়ক মনে করতো।

এই রাজনৈতিক মনোভাবের তথাকথিত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা দিয়ে পি বি সভ্য ডঃ অধিকারী একটা পুস্তিকা লেখেন—"পাকিস্তান ও ন্যাশন্যাল ইউনিটি" (পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য)। দেশ ভাগের প্রায় পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লীগ ও পাকিস্তান সম্পর্কে মনোভাব বা রাজনৈতিক বক্তব্য ঐ পুস্তিকা পড়লে পরিষ্কার হবে।

গান্ধী ও জিন্না, লীগ ও কংগ্রেসকে এক পর্যায়ে ফেলার ফলে কংগ্রেস ও লীগ ঐক্য, গান্ধী-জিন্না মোলাকাত প্রভৃতির উপর পার্টি বেশ জোর দিত। পরে ধীরে ধীরে কোনও এক সময়ে পার্টি এই মারাত্মক মনোভাব ত্যাগ করে (বোধহয় ১৯৪৭ সালের জুন মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায়—অর্থাৎ দেশ ভাগের প্রাক্কালে)।

আর পি ডি ও সি পি জি বি-র ভারতের পার্টিতে অবদান

আগেই এক জায়গায় লিখেছি আমার মত কয়েক সহস্র কমিউনিস্ট ভারতকে চিনতে শেখে রজনী পাম দত্তর বই পড়ে। রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক বা টি ইউ আন্দোলনে সাহায্যের জন্য সি পি জি বি (গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি) প্রায় প্রথম যুগ থেকেই লেখার মারফৎ, লোক পাঠিয়ে ও অন্যভাবে ভারতের পার্টিকে সাহায্য করেছে। ভারতের পার্টিকে সাহায্য করবার জন্য সি পি জি বি জর্জ এলিসন, স্প্র্যাট, ব্রাডলে প্রভৃতিকে এদেশে পাঠিয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত জোট গঠনের কাজে সি পি জি বি ও আর পি ডি নানাভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য শুধু আমাদের পার্টির কাছেই রেখেছেন তা নয়, (দত্ত-ব্রাডলে থীসিসের কথা পূর্বেই লিখেছি) শোনা যায় নেহরু যখন ১৯৩৬ এ লণ্ডনে যান তখন আর পি ডি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট, কংগ্রেসের মধ্যে গণসংগঠন সমূহের কালেকটিভ

এ্যাফিলিয়েশন প্রভৃতি ব্যাপারে আলোচনা করেন। যার প্রতিফলন নেহরুর লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুর কংগ্রেসের বক্তৃতার মধ্যে পাওয়া যায়।

যাইহোক এ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা আছে। এখানে আমি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। তদানীন্তন ইংলণ্ডে শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সি পি জি বির বিশেষ করে আর পি ডির কাজ অবিস্মরণীয়। বিলেতে ভারতীয় ছাত্রদের একটা সংগঠন "ফেড ইণ্ড" গড়ে ওঠে আর পি ডির চেষ্টায়। সমস্ত প্রগতিশীল ভারতীয় ছাত্র তার মধ্যে সংগঠিত হন। তার মধ্য থেকে বাছা বাছা কয়েকজন মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। সেই বাছা বাছা ছাত্ররাই ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ এর মধ্যে ভারতে ফিরে আসেন ও পার্টিতে যোগ দেন যথা—নিখিল চক্রবর্তী, রেনুদি, জ্যোতি বসু, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, এন কে কৃষ্ণাণ, ভূপেশ গুপ্ত, মোহনকুমারমঙ্গলম, মোহিত ব্যানার্জি, পার্বতী, স্নেহাংশু আচার্য প্রভৃতি। আজ ভারতের দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এঁরা অনেকে আছেন। এই যুগের আগে কিরণ বসাক, ডাঃ বীরেশ গুহ, ডাঃ জেড এ আহম্মদ, ডাঃ আশরফ, সজ্জাদ জহীর, মহম্মদ জাফর, হীরেন মুখার্জি প্রভৃতিও সি পি জি বির প্রভাবে ছিলেন।

আর পি ডি—সি পি জি বির আন্তর্জাতিক বিভাগের কর্তা ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দিলীপ বসুর কাছ থেকে জানতে পারি যে সে সময়ও আর পি ডির অন্যতম কাজ ছিল ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে মার্কসবাদের প্রচার করা। সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতের পার্টি বিশেষ করে তাঁর কথা স্মরণ করবে। তাঁর লেখা "ইণ্ডিয়া টু ডে" মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে ভারতের অবস্থা, ইতিহাস প্রভৃতি বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছে। তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে একজন অগ্রণী ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

কিসান সভা

আগস্ট আন্দোলনের ফলে কিসান সভা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। কিসান আন্দোলনে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও নির্দলীয় ব্যক্তিরা ছিলেন। আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেসীরা কারা অন্তরালে, কমিউনিস্টরা এবং কিছু নির্দলীয় ব্যক্তিরা যথা স্বামী সহজানন্দ, যদুনন্দন শর্মা বাইরে। হর্ষদেও মালব্য পার্টি-সদস্য ও কিসান সভার সভ্য বিমূঢ় অবস্থায় কলকাতায় আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। জনযুদ্ধের রাজনীতি শোনার পরও তিনি তা মানতে রাজী হন

না। ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের কথা মনে নেই। কিন্তু স্বামীজী আমাদের সঙ্গেই থাকেন। সারা ভারত কৃষক সভার সম্মেলন মনি সিং-এর নেতৃত্ব নেত্রকোণায় (মৈমনসিং জেলা) অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সম্মেলন কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে মুসলীম লীগ এর বিরোধিতা করে। কিন্তু তার আগেই পাঁজিয়া (যশোহর জেলা) সম্মেলনে সৈয়দ নৌশের আলী ও যশোহর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়ালিয়র রহমান আমাদের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন।

বস্তুত ১৯৪২ এর ধরপাকড়ের পর স্বামী সহজানন্দ ছাড়া কিসান সভায় আমাদের সঙ্গে আর কেউ থাকলেন না। বোম্বাইতে এর সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয়। বঙ্কিমবাবু প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হন। বোম্বাইয়ের দপ্তরে আবদুল্লা রসুল ভারপ্রাপ্ত নেতারূপে কাজ করতেন। কিসান সভার একটা ইতিহাস রসুল সাহেব লিখেছেন তাতে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে যদিও আমি সেটা শুধু পাতা উল্টানো ছাড়া পড়তে পাই নি।

বি. এম. আর. সি. সি

বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি মন্বন্তরোত্তর কালে আমাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে। ডাঃ বিজয় বোস, ডাঃ অমর নাগ (বর্মা), ডাঃ অমিয় ব্যানার্জি প্রভৃতি এতে কাজ করেন। কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপিত হয় ওয়েলিংটন স্ট্রীটে, ডাঃ বিধান রায় তার কর্ণধার হন। সহকারী হিসাবে ডাঃ বোস, ডাঃ নীরদ মুখার্জী ও সুনীল সেন কাজ করতেন। মন্বন্তরোত্তর মেডিকেল রিলিফের কাজ এই কমিটি করতো। এই বি এম আর সি সির পাশেই সহযোগী হিসাবে গড়ে ওঠে পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পি আর সি) সম্পূর্ণ পার্টির নেতৃত্বে। পূর্বোক্ত সংগঠন অবলুপ্ত হলেও পি আর সি আজও বর্তমান এবং সি পি এম পরিচালিত।

ছাত্র ফেডারেশন

বি পি এস এফ কমিউনিস্ট ছাত্রদের দ্বারাই পরিচালিত হত। এর একটা সম্মেলন ও প্রকাশ্য সভা ১৯৪৪ সালে মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বনাথ মুখার্জি, রমেন ব্যানার্জি,

অবনী লাহিড়ী, প্রভাত দাশগুপ্ত, নন্দ বোস, গীতা মুখার্জি, প্রশান্ত সান্যাল, অন্নদা ভট্টাচার্য্য, অলকা মজুমদার (চট্টোপাধ্যায়) ও সাধন গুপ্ত প্রমুখ পার্টির সভ্যরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও পার্টি

পার্টির সভ্য ও দরদীদের উদ্যোগে বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়। সেই সময় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (আই. পি. টি. এ) ভারতব্যাপী গঠিত হয়। বাংলায়ও তার শাখা স্থাপিত হয়। এতে যোগ দেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী, সুধী প্রধান, হেমন্ত মুখার্জি, পঙ্কজ মল্লিক, চারু ঘোষ, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ। বিনয় রায় অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এঁরা গান, নাটক, কথিকা প্রভৃতির দ্বারা শুধু যে পার্টির রাজনীতির প্রচারই করেছেন তাই নয়, সাংস্কৃতিক জগতেও এক নূতন ভাবধারা প্রবর্তন করেন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই পার্টির সভ্য ছিলেন। আজও এরা সাংস্কৃতিক জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে বিরাজিত। এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে পার্টির তরফ থেকে সুধী প্রধান, বিনয় রায় ও চিন্মোহন সেহানবীশ ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এরাই বাংলায় নবনাট্য আন্দোলন, গণ সংস্কৃতির অভ্যুত্থান ও গণ সঙ্গীতের পথিকৃৎ। এদের অবদান আজও সর্বজনস্বীকৃত।

বাংলার বাইরে কায়ফী আজমি ও আলী সরদার জাফরি প্রমুখের নাম সুপরিচিত।

এ আই টি ইউ সি ও ডব্লু এফ টি ইউ

এ আই টি ইউ সিতে ডাঃ আবদুল মালেক (১৯৭১ এ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর) ও আপ্তাব আলী ১৯৪৫ সালে যোগ দেন। দুজনেরই জাহাজীদের মধ্যে পৃথক সংগঠন ছিল, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। কিন্তু এ আই টি ইউ সি দুজনকেই সঙ্গে রাখতে পেরেছিল।

১৯৪৫ সালে বিশ্ব শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ও ভারত থেকে এর সম্মেলনে যোগ দিতে লণ্ডনে যান ডাঙ্গে, এন এম জোশী ও সুধীন প্রামাণিক। সেই সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন স্যার ওয়াল্টার সাইট্রিন (বৃটিশ টি ইউ সি), সাধারণ সম্পাদক লুঁই সাঁইয়া (ফরাসী সি জি টে) ও ডাঙ্গে কমিটির সভ্য

নির্বাচিত হন। ডব্লু এফ টি ইউ-এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয় প্যারিস শহরে। লণ্ডন সম্মেলনই প্রথম ও শেষ যুক্ত সম্মেলন। ১৯৪৯ সালে আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার (এ এফ এল) ও সেনট্রাল ইণ্ডাসট্রিয়াল অর্গানিজেশন (সি আই ও) আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে দালাল হিসাবে এই সংগঠনে বিভেদ সৃষ্টি করে। ফলে বৃটিশ টি ইউ সি ও পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি টি ইউ সরে যায়। বর্তমান বিশ্বে প্রধানতঃ তিনটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন আছে। অন্য দুইটির নাম আই সি এফ টি ইউ ও ডব্লু সি এল।

মাদ্রাজে এ আই টি ইউ সির অধিবেশন

১৯৪৫ সালে জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজ শহরে এ আই টি ইউ সির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে এ আই টি ইউ সির নাগপুর অধিবেশনে পার্টির টি ইউ কর্মীরা ভাল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তখন সবে-মাত্র পার্টি আইনীভাবে কাজ করা শুরু করেছিল। প্রতিনিধি তালিকায় তাই পার্টির সভ্য ও সমর্থকদের ও পার্টি পরিচালিত টি ইউ প্রতিনিধিদের সংখ্যা বেশী ছিল। কংগ্রেসী ও সোশালিস্ট টি ইউ নেতা ও কর্মীরা অনেকে আগস্ট আন্দোলনের জন্য জেলে বন্দী ছিলেন। তাই তাদের তরফের প্রতিনিধির সংখ্যা কমই ছিল। কিন্তু মাদ্রাজ অধিবেশনের প্রাক্কালে অনেক সোশালিস্ট ও কংগ্রেস কর্মীরা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ায় তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা ভাল ছিল। ভি ভি গিরি সদ্য কারামুক্ত হয়ে হাজির ছিলেন। হুমায়ুন কবির যদিও কখনও জেলে যান নি মৈত্রেয়ী বসু প্রভৃতিকে নিয়ে সম্মেলনে এসেছিলেন যাতে কমিউনিস্টরা এ আই টি ইউ সিকে দখল করে না বসতে পারে। সব প্রদেশ থেকে পার্টির সংশ্লিষ্ট টি ইউ প্রতিনিধি ভাল সংখ্যায় উপস্থিত হয়। আমরা কলকাতা থেকে একটা পুরো বগী রিজার্ভ করে মৃণালবাবুকে আমাদের কামরায় সঙ্গে নিয়ে যাই। আগেই স্থির হয়েছিল যে তিনি সেবার সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

স্টেশনের চতুর্দিকে টি ইউ সি মার্কা লাল পতাকা (সেটা এ আই টি ইউ সির নিজস্ব পতাকা ছিল)। মৃণালবাবুর তো চক্ষুস্থির। তিনি হেসে বলেন মাদ্রাজের টি ইউ সি তো কমিউনিস্টদের কবলে কিন্তু দেখছি যে কাস্তে হাতুড়ি লাঞ্ছিত ও লাল পতাকার পরিবর্তে শুধুই টি ইউ সির নিশান।

আমি উত্তরে বল্লাম যে এটা তো এ আই টি ইউ সির সম্মেলন তাই তার পতাকা ছাড়া আর অন্য কিছুই থাকবে না। মৃণালবাবু এন এম জোশী ও রণদীভেকে প্রশংসার সঙ্গে ঐরকম কথাই বলেন—রণদীভেও আমার মত জবাব দেন। কবীর সাহেবও এই বক্তব্যে খুশী হলেন বলে মনে হল।

এ সম্মেলনে আমরা সংখ্যায় পঁচাত্তর শতাংশ থাকলেও পঞ্চান্ন শতাংশ আসন নিই। অর্থাৎ দখলের মনোভাব নিয়ে চলি নাই।

ডাঙ্গে লণ্ডনে থাকায় ফজলে এলাহি কোরবাণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৃণালবাবু সভাপতি ও জোশী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এই সম্মেলনের ঢেউ বাংলাদেশেও পড়ে। এর পরেই সংযুক্ত বি. পি. টি ইউ সি গঠিত হয়, মৃণালবাবু সভাপতি, মোমিন সাধারণ সম্পাদক ও অন্যতম সহ-সম্পাদক হলেন নন্দ বসু।

লালফৌজের বার্লিন জয়

স্টালিনগ্রাদে হিটলার বাহিনীর পরাজয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে গুণাত্মক পরিবর্তন হল তার ফলে লালফৌজ দুর্বার গতিতে জার্মানী অভিমুখে অগ্রসর হয় ও নাৎসী বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় সূচিত হয়। দ্বিতীয় ফ্রন্ট ১৯৪৪-এ খোলা হলেও লড়াই প্রধানত লালফৌজই করে এবং জয়ের পথে অগ্রসর হয়। সে সময় লালফৌজের অগ্রগতিকে সংবর্ধনা জানিয়ে আমাদের শ্রমিক কমরেডরা গান লেখেন "জয় জয় লালফৌজ, তেরা হ্যায় তুফানী মৌজ, তুনে পায়া হ্যায় এওজ এ দুনিয়াকে সামনে···" এবং ইরশাদের নেতৃত্বে প্রধানত বিড়ি শ্রমিকরা বস্তিতে বস্তিতে ও জনসভায় এই গান করতেন। গানটা সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল।

এই সময় কবি হারীন চট্টোপাধ্যায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে আমাদের একটি জনসভায় স্টালিনগ্রাদের উপর তাঁর একটা ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি করেন।

১৯৪৫-এর মার্চ নাগাদ আমরা দিন গুণতে লাগলাম কবে লালফৌজ বার্লিন দখল করবে, লালঝাণ্ডা রাইখস্টাগের উপর উড়াবে। সে আর এক উৎকণ্ঠা। শত শত শ্রমিকসভা করে আমরা যুদ্ধ জয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করি ও বলি যে সকালের কাগজে বা রেডিওতে যখনই শুনবেন যে বার্লিনে লালঝাণ্ডা উড়েছে

তখনই কাজ বন্ধ করে মিছিল নিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েত হবেন ও সেখান থেকে ব্যাণ্ড সহযোগে কলকাতা পরিক্রমণ করা হবে।

হলও তাই। ৮ই মে রাত্রে বার্লিন দখলের খবর এল। সারারাত আমরা শ্রমিক মহল্লায় খবর পৌঁছে দিই। পরের দিন ৯ই সকাল ১১টা নাগাদ ওয়েলিংটনে হাজার হাজার শ্রমিক লালপতাকা হাতে নিজেদের ইউনিয়নের পয়সায় ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে হাজির। সেদিনের সে আনন্দোৎসবে অংশীদার হয়ে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করি। তারপর শহর পরিক্রমা। রাস্তার ধারে হাজার হাজার মানুষ। সেদিন পার্টির জয় জয়কার কলকাতা ও আশেপাশের মানুষের কাছে। লালফৌজের সাথে বাংলার শ্রমিক একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। লালফৌজের বার্লিন অধিকার ও নাৎসী রাজত্বের অবসানে বাংলার অন্যান্য কয়েকটা জেলার সদরেও কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি বিজয়োৎসব উদ্‌যাপিত করেন যথা ঢাকা, মৈমনসিং ও খুলনা। কিন্তু এগুলির সঠিক সংবাদ এখন সুস্পষ্ট মনে নেই।

১৯৪৫ সাল—পট-পরিবর্তন শুরু

১৯০৪ সাল থেকেই বিশেষত ৪৫-এ নাৎসি কবলিত ইউরোপ মুক্ত হয়। পূর্ব ইউরোপে দ্রুত শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হতে থাকে। একের পর একটা দেশ জনগণতন্ত্রের পথে আগুয়ান হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামও অগ্রসর হতে থাকে—বর্মায় ও ইন্দোচীনে। আফ্রিকায়ও ঐ ধাক্কা লাগে।

ভারতবর্ষেও নূতন চিন্তা-ভাবনা জাগে। পার্টির মধ্যেও অজান্তে প্রতিফলন দেখা দিতে থাকে। যদিও তখনও আমরা জনযুদ্ধের আওয়াজ দিচ্ছি তবুও সংগ্রামের মহড়াও দিতে আরম্ভ করেছি নিজের অজ্ঞাতেই বলা চলে। মহারাষ্ট্রে অস্বি-চিমুর এলাকায় বৃটিশ সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরতালের ডাকে আমাদের পার্টিও অংশীদার হয়। শ্রমিক অঞ্চলে বিক্ষোভ শুরু হয়। আমরা তার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকি।

এই সময়ই ট্রামের ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু হয়। ট্রাম শ্রমিকের সাথে সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন করতে প্রত্যেক শিল্পের শ্রমিক এগিয়ে আসেন। বিলাতী মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই যেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ দাঁড়িয়ে গেল। অবশেষে তাদের দাবী ট্রাইবুনালে গেল কয়েকদিন ধর্মঘটের পর।

এই রকম ষ্ট্রাইক কেশোরাম সূতাকলে, বেঙ্গল পটারী ও অন্যত্র শুরু হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর এই জন-জাগরণের তলায় তলায় লীগ সাম্প্রদায়িক বিষ বপন করে চলল। কিছুটা কোন কোন কংগ্রেসী নেতারাও।

প্রচণ্ড গণ-জাগরণ, হরতাল, ধর্মঘট একদিকে, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলল। বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লবের সহ-অবস্থান বা প্রতিযোগিতা শুরু হল।

এখানে '৪৫ ও '৪৬-এর ঘটনাগুলি পরপর লিখে যাব। '৪৬-এর শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে কলকাতায়। অনেক অফিসেই সংগঠনে পার্টি সভ্যরাই নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৬-এর ২৬শে জুলাই দেশব্যাপী ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘট হয়। ভূপেন ঘোষ প্রভৃতি কর্মীরাই এটা সংগঠিত করেন যদিও ধর্মঘট পরিচালনার জন্য যে কর্ম-পরিষদ (কাউন্সিল অব এ্যাকশন) গঠিত হয় তার সভাপতি হন মৃণালবাবু। ডাক-তার কর্মচারীদের সমর্থনে কলকাতা ও আশেপাশে হরতালও সংগঠিত হয়। ভারতের অন্যত্র শুধু ডাক ও তার কর্মচারীদের ধর্মঘট হয়। ডাক-তার কর্মচারী ইউনিয়ন এ. আই. টি. ইউ. সি-তে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভূপেনবাবু বি. পি. টি. ইউ. সি-র কার্যকরী সমিতির সভ্য হন।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত

১৯৪৬-এর মে মাসে মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় সম্মেলনে বৃটিশ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে। বৃটিশের পুরাতন খয়ের খাঁরা যথা স্যার নাজিমুদ্দিন প্রভৃতি সম্মেলনে বৃটিশের দেওয়া খেতাব ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় ১৬ই আগস্ট সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হবে সভা শোভাযাত্রা মারফৎ।

১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ সালের সেই শোভাযাত্রাগুলির কথা আমার মনে আছে। ডেকার্স লেনের পার্টি অফিস থেকে আমরা কয়েকজন বেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছি নানাদিক থেকে মিছিল আসছে। কয়েকটা মিছিলে আমাদের ছোট হালিম, সিরাজ, মারুফ প্রভৃতির হাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফেস্টুন। মিছিলগুলো জমায়েত হতে না হতে আশপাশের হিন্দুর দোকান লুট হতে লাগল ও আক্রান্ত হল নিরীহ হিন্দু পথচারী। আমার মেটেবুরুজের কথা মনে হল। গাড়ী নিয়ে মেটেবুরুজের পার্টি অফিসে গিয়ে শুনি যে

দাঙ্গা শুরু হয় নি তবে বাজার খুব গরম। গাড়ী নিয়ে স্থানীয় লীগের নেতা ডঃ খলীর (আবদুল্লার পিতা) সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনিও বিচলিত এবং দাঙ্গা চান না। পার্টি অফিসে কবি গোলাম কুদ্দুস এসে পড়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে গাড়ী চালালাম ভবানীপুর হয়ে ডেকার্স লেনের দিকে। পথে খিদিরপুর এড়িয়ে কালীঘাটের কাছে এসে দেখি হিন্দুরা মুসলমানের দোকান লুট শুরু করেছে। আমাদের গাড়ী আটকাল, তবে আমরা দুজনেই ধুতি পরিধানকারী দেখে ছেড়ে দিল। শুরু হয়ে গেল ভ্রাতৃহত্যা ব্যাপক হারে যার ভয়াবহতা তুলনাহীন।

এই দাঙ্গার পর নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয় ও তার পাল্টা হয় বিহারে। নিজে দেখি নি তবে শুনেছি যে নোয়াখালিতে খুন-জখম কম হয়েছিল। নারী হরণ ও হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়। বিহারে খুনের মাত্রা বেশি ছিল। কিন্তু কলকাতা ও এর সন্নিহিত অঞ্চলে খুন, অগ্নিকাণ্ড, লুট প্রচণ্ড-ভাবে হয়। সে ভয়াবহ দিনগুলির কথা এখনও মনে পড়ে। বোধহয় কমিউনিস্ট কর্মীরা ছাড়া দেশের প্রায় সব মানুষই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল।

আমাদের কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় অন্য সম্প্রদায়ের নরনারীদের আশ্রয় দেওয়া ও নিরাপদ অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজে ব্রতী ছিলেন। নোয়াখালি দাঙ্গার পর নোয়াখালির পার্টি ও কলকাতা থেকে পার্টি সভ্যরা (লতিকা সেন তাদের অন্যতম) সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করেন। এই দাঙ্গার মধ্যেও পোর্টে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ধর্মঘট চলছিল। প্রত্যেকদিন একটা সময় আমরা ২৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে বি. পি. টি. ইউ. সি অফিসে শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হতাম ও ধর্মঘটের পরিস্থিতি আলোচনা করতাম।

মেটেবুরুজে দাঙ্গা শুরু হলে মুসলমান শ্রমিকরা ফারুকী, কৃষ্ণপদ ঘোষ ও মাধব মুন্সীকে নিজেদের মহল্লায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। মেটেবুরুজে আমাদের শক্ত ঘাটি ছিল। সেখানে এই দাঙ্গার আগে কেশোরাম সুতাকলে আট হাজার শ্রমিকের দেড় মাস যাবৎ ধর্মঘট চলে আমাদের নেতৃত্বে। হাড়ভাঙ্গা (জি. আর. ডব্লু) কলে মিলিত স্ট্রাইক চলছিল দাঙ্গার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু দাঙ্গায় কিছু নোয়াখালির মুসলমান শ্রমিক অংশ গ্রহণ করায়, ঐক্য ভেঙ্গে যায়। ফলে মাথা নীচু করে দাঙ্গার পরে তারাই কাজে ফিরে যায়।

এইভাবে দাঙ্গার ফলে প্রায় সর্বত্রই শ্রমিক ঐক্য ও সংগঠন ভেঙ্গে পরে ও টি. ইউ গুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ট্রাম প্রভৃতি কয়েকটা শিল্প ছিল এর ব্যতিক্রম।

আর. পি. ডির ভারত সফর

১৯৪৬ এর মাঝামাঝি আর. পি. ডি ভারত সফরে আসেন। দিল্লীতে কয়েকদিন থাকেন এবং পরে বোম্বাই যান। সেখানে স্বভাবতই তিনি পার্টির অতি সম্মানীয় অতিথি হিসাবে থাকেন। তখন সি-সি মিটিং চলছিল, সেখানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে কয়েকটা কথা বলেন। তাঁর সম্মানে ও সম্বর্ধনার জন্য এক রাত্রে পার্টি দফ্‌তরে ভোজ দেওয়া হয়। সেখানে পার্টির ঘনিষ্ঠ সমর্থক প্রফেসর ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন।

বোম্বাই থেকে প্লেনে আর. পি. ডি কলকাতায় আসেন। আমরা দমদমে বড় মিছিল নিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাই। তিনি স্নেহাংশুর বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। কলকাতায় তাঁর প্রোগ্রামের উপর প্রোগ্রামে সময় ঠাসা থাকতো।

আর পি ডির সম্বর্ধনার জন্য মহম্মদ আলী পার্কে পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের সভা ডাকা হয়, কিন্তু সে সভা একটা বিরাট জনসভার আকার ধারণ করে। কারণ পার্টির বাইরের এমনকি পার্টির সমালোচকদেরও অনেকে তাঁর বক্তব্য শুনতে ও তাঁকে দেখতে আসেন। ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে তাঁর অবদান শত্রুমিত্র সকলেই মানত। সেই সভায় তাঁর বক্তৃতার প্রথম কয়েকটি কথা আজও আমার মনে পড়ে—"অবশেষে ত্রিশ বৎসরের প্রচেষ্টার পর আমি কলকাতায় আসতে পেরেছি। কলকাতা আমার পিতা ও পূর্বপুরুষের জন্মস্থান। এখানেই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি জন্মলাভ করে……"। কথাগুলি তিনি এমন ভাবালুতার সঙ্গে বললেন যে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েন। তার পর তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য শুরু করেন। এই সভার পরই শ্রমিক পার্টি সদস্য ও সমর্থকদের সভায় (ঐখানেই সে সভা হয়) বক্তৃতা করেন। কলকাতায় দিলীপ বোস তার বিখ্যাত গাড়ী আর. পি. ডির ব্যবহারের জন্য রেখেছিল। দিলীপ গাড়ী চালাত আর আমি তাঁর সর্বক্ষণের সাথী ছিলাম। তিনি কলকাতায় আসবার পূর্বে তাঁর আত্মীয় রামবাগানের দত্ত পরিবারদের তাঁর আসার সংবাদ জানান ও তাঁদের সঙ্গে দেখা করার বাসনা প্রকাশ করেন। বাংলা সরকারের আই. সি. এস অফিসার আর. সি. দত্ত তাঁর ভাইপো। তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর. পি. ডির সঙ্গে

তাঁদের প্রোগ্রাম জানান। তখন দত্ত-পরিবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। রামবাগানের লোকেরা খৃস্টান, ব্রাহ্মরা আলাদা আর হিন্দুরা বীচি রোডে আলাদা বসবাস করতেন। সুতরাং প্রত্যেক বাড়ীতে আলাদা তাঁর যেতে হবে এবং পরে সব জ্ঞাতি মিলে তাঁকে এক স্থানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন। মোটের উপর এইরকম প্রোগ্রাম ছিল। আর. পি. ডি সানন্দে তাঁর সম্মতি আমাদের জানাতে বলেন।

মহম্মদ আলী পার্কে সভা শেষ হবার আগে আমি দিলীপকে বলে অন্যত্র কাজে যাই। এবং রাত ৮টা নাগাদ স্নেহাংশুর বাড়ীতে যেয়ে দেখি তিনি ফেরেন নি যদিও ফেরবার কথা সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে। সকলে চিন্তিত হয়ে সর্বত্র টেলিফোনে সংবাদ নেবার চেষ্টা করে। রাত প্রায় ৯টার সময় দিলীপ তাঁকে নিয়ে ফিরল। কি ব্যাপার! পার্কের মিটিং-এর পর আর. পি. ডি দিলীপকে বলেন যে সময় তো রয়েছে তাঁকে রামবাগানের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হোক্ তাঁর মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। অগত্যা দিলীপ সেখানে খোঁজা-খুঁজি করে নিয়ে যায়। সেখানে তো তাঁর সেদিন যাবার কথা নয় আর বাড়ীর কেউ তাকে চেনেন না। তাই দিলীপেরই তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। তখন তো মহা হৈ-চৈ খবরাখবর সর্বত্র চলে গেল। যে যেখানে ছিলেন এসে উপস্থিত আর খানা তৈরী হতে লাগল। ঘটনা বিবৃত হবার পর আর. পি. ডি বললেন যে এটা কিন্তু তাঁর প্রোগ্রামের বাইরে অর্থাৎ পারিবারিক প্রোগ্রাম ঠিকই থাকছে। তাঁর পরিবারের প্রতি টান ছিল যে কত, তা দেখাবার জন্যই ঘটনাটা উল্লেখ করলাম।

বি. পি. টি. ইউ. সির তরফ থেকে মে-দিবস উদ্‌যাপিত হবে। আর. পি. ডি সভায় কিছু বলতে চান। শিবনাথবাবুর ঘোর আপত্তি তবে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সভাপতি মৃণালবাবুর মত মতোই হবে। আমার নিয়ে যাবার কথা। হঠাৎ দেখি আমার বাসায় দিলীপ তাঁকে নিয়ে এসে হাজির। আমি লুঙ্গী পরে বসে, আর ডাঃ বিজয় বোস হাফ প্যান্ট পরে ব্যায়ামাভ্যাস করছেন। লতিকা ও ইন্দিরা (বিজয় বোসের স্ত্রী) তো হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। আর. পি. ডি বাড়ীটা ভালভাবে দেখলেন এমনকি রান্নাঘর সমেত।

মৃণালবাবু তাঁর সঙ্গে কথা বলে মহাখুসী এবং তাঁকে মে-দিবসের সভায় আমন্ত্রণ জানালেন। সভায় বক্তৃতার পর তাঁকে মেটেবুরুজে নির্ধারিত

মে দিবসের সভায় নিয়ে চললাম। পথে কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। দিলীপ তো পাগলের মত গাড়ী চালাচ্ছে। আমি রেগে বললাম ইডিয়েট এ্যাক্সিডেন্ট করবে? দিলীপ মহাবিজ্ঞের মত ঘাড় ফিরিয়ে বলল "রণেনদা গালাগালিটা বাংলায় দেবেন নইলে উনি বুঝতে পারবেন।" মেটেবুরুজে পৌঁছুবার আগেই প্রচণ্ড বৃষ্টি। বিরাট জমায়েত হয়েছিল, আশপাশের মিলের অফিসাররাও উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সব ফস্কে গেল। আর. পি. ডির ভেজাই সার হল। পরের দিন ঐ মেটেবুরুজেই ক্লাইভ, কেশোরাম ও হাড্ডিকলের গেটে মাইক নিয়ে আর. পি. ডি বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি বক্তৃতা চার পাঁচ মিনিটের বেশি নয় এবং শেষ করলেন "হিন্দুস্তানকা মজদুর জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে। অজয় দাশগুপ্ত মাইকের ও গাড়ীর ব্যবস্থা করে।

আর পি ডিকে কাছাকাছি কোন একটা গ্রামেও নেওয়া হয়। আমি সেদিন যাই নি।

'৪৭-এর সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের পার্টি অফিসে দিলীপ আমাকে নিয়ে যায়। সেখানে গেলে তিনি শুধু আমাকে চিনলেনই না এমনকি কলকাতার ঘটনাবলীও বিবৃত করলেন। লণ্ডনে ভূপেশবাবুর ভাই সন্দেশের (ভাল নামটা মনে পড়ছে না) অতিথি হয়ে ৪।৫ দিনই হয় দিলীপের সঙ্গে নয় রমেশ সংগভীর (পরে রিংসের সাংবাদিক) সঙ্গে আর পি ডির কাছে যেতাম। দুপুরে অফিসেই তিনি খেতেন রুটি, আলুসিদ্ধ ও এক টুকরা মাছ বা মাংস—এই কৃচ্ছ্রসাধনা ত'ার কমিউনিস্ট জীবনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। অথচ তাঁকেই দেখেছি স্নেহাংশুর বাড়ীতে দেশী-বিলেতী সব খানা আগ্রহের সঙ্গে খেতে। ডুক্লোর কাছে লেখা আর পি ডির চিঠি নিয়ে আমি প্যারীতে ফরাসী পার্টির দফ্‌তরে যাই।

আর পি ডি আমাদের "রেড এড কিওর হোম" (রডন ষ্ট্রীটে) দেখে খুব খুসী হয়েছিলেন। ওখানেই রোগী সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কিওর হোমটা একটা ছোট নার্সিং হোমের মত করে পার্টি গড়ে তোলে অসুস্থ পার্টি সভ্যদের চিকিৎসার জন্য। আর পি ডির স্ত্রীকে আমরা একখানা ঢাকাই জামদানী শাড়ী উপহার দিই। নেপাল নাগকে বিশেষভাবে শাড়ী কিনতে ঢাকায় পাঠান হয়েছিল।

আর পি ডি এর পর অস্ট্রে যান। কিন্তু ভারত সফরের অর্ধেকের বেশী সময় কলকাতায় দেন। ভারত ভ্রমণের এক মনোজ্ঞ কাহিনী ঐ সময় 'লেবার মান্থলী'তে তিনি লেখেন।

সীমান্ত বাংলার সাঁওতালী সংস্কৃতির ধারা

শম্ভু মিত্র

ভারতে তিন কোটিরও বেশি আদিবাসীর বাস। কয়েক শো গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে এঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারা বহন করে চলেছেন। আদিবাসীদের মধ্যে গোণ্ড (মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ—জনসংখ্যা ৩০ লক্ষের ওপর), ভিল (রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ—জনসংখ্যা ৩০ লক্ষের ওপর) ও সাঁওতালরাই (বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ—জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ) প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশ।

নৃতত্ত্বের বিচারে পশ্চিমবাংলার আদিবাসীদের দুভাগে ভাগ করা যায় (১) সমতল বঙ্গের আদিবাসী (২) উত্তরবঙ্গের আদিবাসী। সমতল বাংলায় থাকেন মুখ্যত: সাঁওতাল, ওরাওঁ মুণ্ডা, ভূমিজ, লোধা, বীরহোড় ইত্যাদি। উত্তরবাংলার আদিবাসী হলেন: ভুটিয়া, লেপচা, মেচ, গারো, রাভা, টোটো ইত্যাদি। সমতল বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে পিতৃ-শাসিত সমাজেরই প্রাধান্য। কিন্তু উত্তর বাংলার আদিবাসী সমাজের কিছু অংশে মাতৃপ্রাধান্য এখনও দেখা যায়। পশ্চিমবাংলার আদিবাসীদের অর্ধেকেরও বেশি সাঁওতাল। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুরেই এদের সংখ্যা বেশি। শারীরিক গঠনপ্রণালীর ধারা অনুসারে এরা প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠিভুক্ত। সাঁওতালী ভাষা অষ্ট্রিক পরিবারের মুণ্ডারী গোষ্ঠীর অন্তর্গত। পশ্চিমবাংলার সাঁওতালীরা সাঁওতালী ছাড়াও বাংলা ভাষা বেশ ভালই বলতে পারেন। রঘুনাথ মুর্মু প্রবর্তিত 'অল' হরফ কোথাও কোথাও চালু হচ্ছে। দেবনাগরী, বাংলা ও রোমান হরফে বেশ কিছু সাঁওতালী বই প্রকাশিত হয়েছে। বেনাগড়িয়া মিশন অতীতে নানাধরনের পুস্তক প্রকাশ করেছেন। হোর কো-রেন মারে হাপরাম-কো রেয়াক' কথা (হোর বা সাঁওতালীদের পূর্বসূরীদের সংস্কৃতির আলেখ্য) বেনাগড়িয়া মিশনেরই অক্ষয় কীর্তি। এই গ্রন্থে সাঁওতালী গল্প ও কিংবদন্তির

আদিমতম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। ঘাটশীলার রামদাস মাঝি উড়ু বাংলা হরফে খেরওয়াল-বংশ ধরম পুঁথি (খেরওয়াল সাঁওতাল ও কোলদের প্রাচীন নাম) নামে সাঁওতালী ট্র্যাডিশান, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় সম্বলিত একটি পুঁথি প্রকাশ করেছিলেন। পাদ্রী বোডিং সাঁওতালী গল্পের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ রোমান হরফে বের করেছিলেন। ডেভিড নাট সাঁওতালী গল্পের ভাল ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। হাল আমলে হিন্দু পুরাণ, উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ বেরিয়েছে। এডেন (আলো) ও হরিয়ার সকম (সবুজ পাতা) যথাক্রমে দুটি বিশিষ্ট ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ও সাপ্তাহিকী সম্প্রতি যাঁরা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন তাদের ভিতর নায়েকে মঙ্গলচন্দ্র সোরেন। সারদাপ্রসাদ কিসকু, বালকিশোর বাস্কে, আদিত্য মিত্র সাঁওতালী বাবুলাল মুর্মু, ভাগবত মুর্মু, তাড়ে সুতম, রঘুনাথ মুর্মু, রূপনারায়ণ হেমব্রম, শ্রীধর কুমার মুর্মু, গোমস্তাপ্রসাদ সোরেন, চন্দ্রনাথ মুর্মু কালিরাম সারেন (এঁর সিধু কানু নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়েছে), মুগলদাস মাণ্ডি, রামচন্দ্র মুর্মু, মণ্ডল হেমব্রম, দুর্গাচরণ হেমব্রম, হোপোনচন্দ্র বাস্কে, বির হেমব্রম, রবিলাল মাণ্ডি, স্টিফেন মুর্মু ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দেওঘরের সাঁওতাল পাহাড়িয়া সেবা মণ্ডল সাঁওতালী ভাষার প্রচারে ও প্রসারে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন।

সাঁওতালরা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম আদিবাসীগোষ্ঠী হলেও এঁদের মাত্র ছয় শতাংশ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। তুলনায় ওরাওরা কিছুটা এগিয়ে আছেন (আট শতাংশ)। বেশিরভাগ আদিবাসীর মতো এঁদেরও জীবিকা চাষ। চা বাগানে ও বিভিন্ন কল-কারখানায় এঁরা শ্রমিকের কাজও করে থাকেন। নানা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও এঁদের কাজ করতে দেখা যায়। সেনা-বাহিনীর দক্ষ কর্মী হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছেন এঁরা। সাঁওতালরা বারোটি গোত্রে বিভক্ত—হেমব্রম, কিসকু, মুর্মু, সরেন, বেসরা, মাণ্ডি ইত্যাদি। গোত্রকেই এঁরা হালে পদবী হিসাবে ব্যবহার করছেন। একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই ধরনের বিবাহের শাস্তি—সমাজচ্যুতি। বিবাহের আগে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাঁওতাল যুবকরা সমাজের সভ্যপদ লাভ করেন। এর দ্বারা পূজা-পার্বণের অধিকারও জন্মায়। এই অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে বিয়ে-শাদী (বাপ্‌লা) হয় না। মৃত্যুর পরে মৃতদেহ দাহ করা হয় না। অনুষ্ঠানটির নাম চাচো চাতিয়ার। বাল্যবিবাহ খুবই কম। বহু বিবাহের তেমন প্রচলন [illegible]

নিজ গোষ্ঠীতেই বিবাহ করা রীতি। আগে বহু ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল বর্তমানে দুই ধরনের বিবাহ হয়: (১) রাইবার বা ঘটকের মাধ্যমে (২) নিজ পছন্দ অনুযায়ী। পাত্রপাত্রী উভয়ের মতেরই বিশেষ মূল্য আছে। আগে কন্যাপক্ষকে যথেষ্ট পণ দিতে হত। বর্তমানে ১৫ থেকে ২৫ টাকা কন্যাপণ দিতে হয়। পাত্র পণ দিতে অক্ষম হলে তাকে কিছুদিন শ্বশুর বাড়িতে বেগার খাটতে হয়। অপুত্রক পিতা ঘারদিজাওয়া (ঘর জামাই) রাখেন কখনও কখনও। অন্যান্য আদিবাসীদিগের মত সাঁওতালদের মধ্যেও ডিভোর্স সামাজিক রীতির অন্যতম অঙ্গ। স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, পাগল বা ডাইনি প্রমাণিত হলে পঞ্চায়েতের সাহায্যে স্বামী বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারেন। স্ত্রীরও এ বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। শালপাতা দুটুকরো করে এক ঘটি জল উল্টে রেখে পঞ্চায়েতের সামনে সিংবোঙা (সূর্য) কে সাক্ষী রেখে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরাই সম্পত্তির মালিক হন-সম্পত্তি সমানভাগে ভাগ হয়। ছেলের অবর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা সম্পত্তি পান—ছেলে থাকলে কিছুতেই নয়। ছেলে বা মেয়ে না থাকলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি পান বটে কিন্তু স্ত্রী এই সম্পত্তি বিক্রি করতে বা যাকে খুশি তাকে দিতে পারেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি স্বামীর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়। স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করলে সম্পত্তির দাবি হারান। তবে বিবাহকালীন পিতৃদত্ত বস্ত্র অলংকারাদি স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এইসব জিনিষ পুত্রবধূ ও অবিবাহিত কন্যা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। বিয়ের আগে কন্যার ভরনপোষণের দায়িত্ব বাবার। বাবার অবর্তমানে ভাইয়ের। মৃত্যু যে অপদেবতায় ক্রোধজাত, এ ধারণা এদের মনে বদ্ধমূল। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ঝাড়-ফুঁকের ব্যবস্থাও আছে। মৃতদেহ সাধারণতঃ দাহ করা হয়। শিশু মারা গেলে বা কেউ কলেরা বসন্তে মারা গেলে তাকে কবর দেওয়া হয়। প্রচলিত লোক বিশ্বাস এই যে, পূর্বপুরুষ নানা বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত করেন। তাই যে কোন পূজার আগে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। প্রতি ঘরেই পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে বাসস্থান নির্দিষ্ট করা থাকে। সেখানে মুরগী বলি দিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ চাওয়া হয়। মৃত্যুর পর ১০ থেকে ৩০ দিন অশৌচ থাকে। অশৌচ চলাকালে পরিবারের কেউ গ্রামের উৎসবে যোগ দিতে পারেন না। গ্রামের অন্যরাও অশৌচ পালনকারীর বাড়ীতে কোন খাদ্য

গ্রহণ করেন না। আগে সমাজে পঞ্চায়েতের গগনবিস্তারী প্রাধান্য ছিল—সামাজিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক, সর্বস্তরে। বর্তমানে উৎসব ও বিয়ে-শাদী ছাড়া পঞ্চায়েতের বিশেষ করনীয় কিছু নেই। গ্রামপ্রধানকে মাঝি বা মাহাতো বলে। মাহাতোর ডেপুটি হলেন যোগ পরানিক। পুরোহিতকে বলা হয় নাইকি। এঁরা ছাড়া কিছু প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীও থাকেন পঞ্চায়েতে।

পশ্চিমবাংলার আদিবাসীরা যেসব ধর্মে বিশ্বাসী সেগুলি হল: হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্ট, জৈন, মুসলমান, শিখ, সারি, টাঁদো বোগা, মারাংবুরু, পাহাড়িয়া, সাঁওতাল এবং তিরকিয়া। সীমান্ত বাংলার আদিবাসীদের অধিকাংশই হিন্দুধর্মাবলম্বী। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বেশ কিছুসংখ্যক সারিধর্মে (সত্য-ভিত্তিক ধর্ম) বিশ্বাসী সাঁওতাল আছেন। বাকুড়ার সাঁওতালদের মধ্যে মারাংবুরু ধর্মাবলম্বীও আছেন। সাঁওতাল ধর্মে 'ঠাকুর' হলেন একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা। এছাড়া এঁদের আরও অনেক দেবদেবী (বোঙা) আছেন —যেমন মারাংবুরু, জাহের-এর', গোসাই এরা, পরগণা-বোঙা, বড়ামবুড়ি, জাহের-বুড়ি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সীমান্ত বাংলায় স্ত্রী দেবতারই পর্যাপ্ত প্রাধান্য বিদ্যমান, পুরুষ দেবতা খুবই কম। তা ছাড়া সব স্ত্রী দেবতাই বৃদ্ধা। তরুণী বা যুবতী দেবীর নাম শোনাই যায় না। সাঁওতাল সমাজে পূজা ও উৎসব একই সাথে জড়িত। প্রধান প্রধান উপজীবিকাকে ভিত্তি করেই সীমান্ত বাংলার নানা পূজা ও উৎসবের উৎপত্তি। কৃষিপ্রধান উপজীবিকা হওয়ায় অধিকাংশ উৎসবই কৃষিভিত্তিক (সহরাই বা বাঁধনা, করম, এরোকসিম, সাঁকরাত ইত্যাদি)। এ ছাড়া শিকারভিত্তিক পূজা ও উৎসবও আছে। সমাজ, গ্রাম, পরিবারকেন্দ্রিক পূজা ও উৎসবও আছে কিছু কিছু। সহরাই বা বাঁধনা সব থেকে বড় উৎসব। পাঁচদিন ধরে এই পরব চলে। সাধারণত কালীপূজার সময় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত গরু-মহিষের ভালোমন্দের অধিকর্তা হলেন গোরেয়া ভূত। জঙ্গলে সাঁওতালদের গো-মহিষ চরে বেড়ায়—ঝোপে-ঝাড়ে থাকে সাপ, বাঘ। এদের রুক্ষচক্ষু থেকে বাঁচতে হলে একমাত্র ভরসা গোরেয়া ভূত। তাই গোরেয়া ভূতের পূজা দেওয়া হয় এই সময়ে। গরু-মহিষকে পেট ভরে খেতে দেওয়া হয় এবং গবাদি পশুকে ঘিরে নৃত্যবাদ্যের অনুষ্ঠান হয়। সারহুল বা বাহা (বসন্ত বা পুষ্প) উৎসব এদের দ্বিতীয় মুখ্য উৎসব। সাধারণত

ফাল্গুন-চৈত্রে দুদিন ধরে এই উৎসব চলে। শালগাছ যখন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় তখনই এই উৎসব হয়। বড়ামবুড়ির পায়ে মহুয়া ফুল দিয়ে পূজো করে যাতে বেশি ফসল পাওয়া যায়। গ্রাম ও সমাজের কল্যাণ হয় ও রোগশোকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তারই প্রার্থনা করা হয়। নৃত্যগীতের ফোয়ারা বয়ে যায় দিগ্ দিগন্তে। ভাদ্র-আশ্বিনে দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় করম। করম উৎসবে দুটি করম গাছকে পাশাপাশি পুঁতে একসঙ্গে বাঁধা হয়। এই মিলনকে আগামী ফসলের প্রাচুর্যের প্রতীকরূপে গণ্য করা হয়। পূজাশেষে করম ঠাকুরকে বিসর্জন দেওয়া হয় নিকটেরই কোনো পুকুর, খাল বা নদীতে। করম নৃত্য সাঁওতালদের একটি বিশিষ্ট নৃত্য। এরোকসিম উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ়ে ধান পোঁতার সময়। এই উপলক্ষে পূজা হয়—গ্রামদেবীকে মুর্গী উৎসর্গ করা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয় সাঁকরাত (সংক্রান্তি)। সাঁকরাত মকর বা টুসুর সাঁওতালী সংস্করণ। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে শস্য-ভাবনা ছাড়াও জড়িয়ে আছে পরিবার ও পূর্বপুরুষের কল্যাণ কামনা। ভালো শিকার পাওয়ার প্রার্থনাও করা হয়। মাসের শেষে অনুষ্ঠিত হয় মাঘসিম পরব। এই উৎসবের মাধ্যমে সাঁওতালরা প্রাচীন বৎসরকে বিদায় জানান। এই সময়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। গ্রামদেবতার উদ্দেশে হাঁস বলি হয়। কাড়গ্রাম অঞ্চলে সাঁওতালরা ইঁদ নৃত্যোৎসবে যোগ দিয়ে থাকেন। ইঁদকে এঁরা বলেন ছাতা বোঙা বা ছাতোম পরব। এই পরবে শালগাছের বিরাট খুঁটি পুঁতে তার ওপরে পুষ্পসজ্জিত প্রকাণ্ড ছত্র ধরা হয়। দুপুরে ভূ-স্বামীরা আসেন। সকলে একত্রিত হয়ে ছত্রধ্বজকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে শাল গাছকে পূজা করেন। পূজা শেষে শুরু হয় যৌথ নৃত্যগীত। ঘাটশীলায় রংকিনী দেবীর মন্দির প্রাংগণে অনুষ্ঠিত বিধা পরবে অংশ নেন স্থানীয় সাঁওতালরা। পূর্বে অত্যন্ত নৃশংস ছিল এই অনুষ্ঠান। বর্তমানে মাত্র দুটি মহিষ বলি হয়। সাঁওতালরা সেই বলির প্রসাদ খান। বলাবাহুল্য বিধা শিকারউৎসব ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রামকে অপদেবতার রোষমুক্ত রাখবার জন্য এঁরা গ্রামপূজা বা গ্রাম বাঁধা পূজা করেন। প্রতি ৫ বছর অন্তর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সমাজ ও পরিবারকে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষার জন্য মা মরে উৎসব পালিত হয়।

সাঁওতালদের গানে কুড়িটিরও বেশি সুর পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ধাতু, পূজা পার্বণ উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যগীতের ব্যবস্থা আছে। নৃত্যভিত্তিক

কয়েকটি গানের নাম :—লাগরে সেরেঞ, পাতা সেরেঞ, দোন সেরেঞ, সোহরাই সেরেঞ, দাহর সেরেঞ, বাহা সেরেঞ, করম সেরেঞ, দাশাই সেরেঞ, বীর সেরেঞ ইত্যাদি। লাগরে সেরেঞ নৃত্যগীত যে কোনো সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। চৈত্র সংক্রান্তি বা শিবের গাজনে অনুষ্ঠিত পাতা নৃত্যগীতের মহড়া চলে। দোন সেরেঞ বিবাহ ও চাতিয়ার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। এই গানের কয়েকটি ভাগ আছে :—সোহরাই, ডাঙ্গুয়া, বুধি, এবং ঝিকা। সোহরাই সেরেঞ সোহরাই উৎসবে গীত ধর্মসঙ্গীত। এই সময়ে সাঁওতালজাতির উৎপত্তি বিষয়ক ইতিহাস দাহর সেরেঞ নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। বসন্ত (বাহা) উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় বাহা সেরেঞ। বাংলা শব্দবহুল করম সেরেঞ করম পরবে সারারাত ধরে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার সময়ে সাঁওতালরা দাশাই (দেশমী) উৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষে দাশাই সেরেঞ গাওয়া হয়। এই গানে সমাজের মঙ্গলকামনার উদ্দেশে অতীতের ওঝাদের আহ্বান করা হয়। বীর সেরেঞ এককথায় শিকার-উৎসবের গান। নাচ ছাড়াই যেসব গান গাওয়া হয় তাদের নাম বাপলা সেরেঞ, বিন্‌তি সেরেঞ, গ্রম সেরেঞ, হোরো রোহো সেরেঞ, কারনি সেরেঞ, মন্তর সেরেঞ, মরুয়া সেরেঞ ইত্যাদি। বাপ্‌লা সেরেঞ বিয়ের গান, বিন্‌তি সেরেঞ দেবতা-প্রার্থনা গান। কারনি ও মন্তর সেরেঞ হল কুনজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার গান। হোরো রোহো ধান বোনার গান। মরুয়া বা রক সেরেঞ শোক সংগীত। আরো কিছু গান হল গোলওয়ারি, দটওতা, মটওয়ার, গনজর, হুম্‌দি। সাঁওতালী গানে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সুরের সমাহার দেখা যায়। সুরের নাম সাধারণতঃ ধাতুর নামেই হয়। সাঁওতালী সঙ্গীতকে ঋতু সঙ্গীত না বলে ঋতুসুরের সঙ্গীত বলাই সঙ্গত। ঋতুভেদে গানের ভাষা ঋতুর সঙ্গে জড়িত নাও হতে পারে কিন্তু সুর বহুক্ষেত্রেই ঋতুর অনুগামী হয়। রাড় সহরায় অর্থ সুর হৈমন্তী—এটি কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের সুর। আশ্বিনের সুর রাড় দশাঞ (সুর দশমী)। গ্রী কালের সুর রাড় বির (বেন)। আষাঢ় শ্রাবণের সুর হল রাড় হেড়হেৎ (ক্ষেতের আগাছা উপড়ে ফেলা)। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সাধারণতঃ মাদল, ধুমসা, নাগরা বাঁশি, শিঙা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালী গান খুবই শ্রুতি সুখকর। নিচে কিছু গানের নমুনা দেওয়া গেল :

লিকি দে লিকি দেনা রাঙ্গি/পোনডে ঘর, ছা দম্‌দঃ না রাঙ্গি গেমেঞে

গেমেঞে না রাঙ্গি পিয়রে ঘুরি/দিয়ার আয়তাম ঘু'ঘু'রা না রাঙ্গি পিয়রে ঘুরি (ভাবার্থ : অগ্নি বরণ লাল সাদায় মেশা চর্মধারী ওহে ছাগ শিশু। অনুরোধ করছি, খাবার খেয়ে নাও। তোমার মন কি আকাশের ঘুড়ির মত চঞ্চল হয়ে উড়ছে ? তোমাকে গলার গয়না দেব পায়ে দেব ঘুঙুর। তাহলে খুশি তো ? নাও, খেয়ে নাও)। মা মরে উৎসবে পাঁচটি ছাগল বলি দেওয়া হয়, তাদের পাতা খেতে দেওয়া হয়—কিন্তু না খেয়ে বদ্ধ অবস্থায় চিৎকার করে তারা, তাদেরই উদ্দেশে গান গায় মেয়েরা)।

রাড় ল'াগড়েতে সতীনের ভাবনা : হাড়াং হাড়াং নিম হাড়াং/হাড়াং/ হড়াং হিরম হাড়াং/ নিম হাড়াং সাহাংয়া/হিরম হাড়াং বাং সাহাংয়া (নিম তিতো সতীন তিতো ; নিমের তিতো সইতে পারি, সতীনের তিতো কিছুতেই নয়)।

রাড় বিয়ের গানে কিশোর-কিশোরীর প্রেমসিক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি খুবই উপভোগ্য : বুর বুরুলাং পাংমকেদা গেনবার বুরুলাং পারমকেদা/উকুর মাইরি চেংএম চিকালেং/হড়ম মাইরি জালি গেতাম কড়মতাই নালি গেতাম/ বাংযানদবুরু পদামরে সবরনখা। দাঃ লেকালাং সকচলেনা (নায়িকা বলছে কত বন তো পার হলাম—কম করেও তো বারটি কিন্তু কই তুমি তো কিছু বললে না। নায়ক বলছে বলবই বা কি আর করবই বা কি ? তোমার কচি শরীর, তায় বুকের কু'ড়ি দুটো এখনো ফোটে নি। নচেৎ বন থেকে বনান্তরে যেতে যেতে সবর্ণরেখা নদীর জলের মতো তোমাকেই শুধু পান করতাম)। এখানে নায়িকার যৌবনের সঙ্গে চিরউদ্দাম যৌবনবতী সুবর্ণরেখার উপমাটি অশিক্ষিত (বা অর্ধ শিক্ষিত) গ্রাম্যকবির কল্পনাশক্তি ও কাব্যিক ব্যঞ্জনাধর্মী ক্ষমতার অভ্রান্ত পরিচয় বহন করছে। এই উপমা সর্বতোভাবে প্রশংসাযোগ্য।

দং সেরেঞ (বিবাহগীতি) এর নমুনা : জানাম আয়োম জানাম লিদিঞ / সারজম সাকাম লেকা, বিলা মনোদঃ। হিসিদ জিঞি, রিলিদ হড়মঃ / চঁছলতা গিডিলেকা এটাঃ অড়ারেঃ (অন্বয়ার্থঃ মা, তুমি বাতাসে দোলায়মান লিকলিকে পরিষ্কার শাল পাতার মত সুন্দর শরীর দিয়ে আমাকে জন্ম দিয়েছ ; সেই তুমি আজ আমাকে ফেলে দিচ্ছ তেমনিভাবে যেমনভাবে কাজ শেষে অনাবশ্যক বোধে লোকে ছেঁড়া ন্যাকড়া ছুঁড়ে ফেলে)। এখানেও শালপাতার সঙ্গে শরীরের, বিবাহ শেষে মেয়েকে স্বামিগৃহে পাঠানোর সঙ্গে ছেঁড়া ন্যাকড়ার তুলনা লক্ষণীয়। প্রথম উপমাটি সত্যই সুন্দর।

বাতাসে দোলায়মান লিকলিকে পরিষ্কার শাল পাতার মতই উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীর দেহটি। যৌবনভারে চঞ্চলা কিশোরীকে দেখে মনে হয় বাতাসে পাতা যেমন অহরহ দোলে, ঠিক তেমন দুলছে বা ছটফট করছে সে। কিশোরীরা সর্বদাই ফিটফাট পরিষ্কার থাকতে চায়। আর লিকলিকে বা slim চেহারাই তো সবার পছন্দ। দ্বিতীয় উপমায় কিশোরী জায়ের প্রতি একটু বেশি কঠোর হয়ে পড়েছে যেন। মা কি কখনও মেয়েকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ফেলে দেন? যাই হোক, উপমাটি একটু কঠোর হলেও মনে রাখতে হবে গ্রাম্য কবি অলঙ্কারগত ব্যাকরণের তেমন ধার ধারেন না। সবচেয়ে প্রশংসনীয় হল উপমাগুলির সার্থক ব্যবহার। উপমার এমন প্রায়-সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই গ্রাম্য কবি বহু শিক্ষিত শহুরে কবিকেই হার মানাবেন।

গান সাঁওতাল জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। সেই সংগে নাচও। ওপরে নানা নাচ গানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নাচগান যে অফুরন্ত। ডুনগার নাচ অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় শ্রাবণে বীজ বোনার সময়। আষাঢ় মাসে বিকা গান গাওয়া হয়। আশ্বিনে ভুয়াং বাঁশি সহ দশাঞ ভুয়াং নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সোহরাই উৎসবে চলে মটওয়ার গন্‌জর নাচ। আরেকটি বিশিষ্ট নৃত্যের নাম লবয়। নাচে পুরুষের বাঁশি, মাদল টিকারা বাজায়, মেয়েরা পরস্পরের কোমর ধরে অর্ধবৃত্তাকারে নাচে। নৃত্যের সময় মেয়েরা এগোয়, কখনো পেছোয়। হাতে থাকে চুড়ি, পায়ে মল, আউঠা, গলায় হাঁসুলি, কানে ও খোঁপায় বুনো ফুল।

সাঁওতালী চিত্রকলাও যথেষ্ট বৈচিত্র্যবাহী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এঁরা বাড়ীর দরজায় ও দেয়ালে নানা জীবজন্তুর ছবি আঁকেন—এতে এঁদের শিকারপ্রিয়তার কথাই প্রমাণিত হয়। যেহেতু নৃত্য সাঁওতালী সমাজ-জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত, তাই নানা সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের পূর্বে নিজেদের বাড়ির দেয়ালে এঁরা নানা নাচের দৃশ্য আঁকেন। এমনকি বাদ্যযন্ত্রের গায়েও নাচের নানা অঙ্গভঙ্গি খোদাই করা থাকে। সাঁওতালী মেয়েদের কাছে ফুল খুবই প্রিয়। মুরগীর লড়াই এদের সকলেরই কাছে অবসর বিনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বাড়ির দেয়ালে নানা চিত্রের মাধ্যমে এবম্বিধ অনুরাগ ফুটে ওঠে। এইসব দেয়াল-চিত্র শিল্পী হলেন মুখ্যতঃ মেয়েরাই। এঁরা রং হিসেবে ব্যবহার করেন

ঘরের আশেপাশের লাল ও হলুদ মাটি, সঙ্গে মেশানো হয় কয়লার গুঁড়ো।

সহায়ক গ্রন্থ :

(১) 'Adivasi' Literatures of India—Dr. Suniti Kumar Chatterjee-an article published in 'Indian Literature', Vol. XIV, No. 3, New Delhi.

(২) সীমান্ত বাংলার লোকযান : ডঃ সুধীর করণ

(৩) বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য—শ্রীমণি বর্ধন (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

[৪] পশ্চিমবাংলার লোকসংস্কৃতি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এ ছাড়া সেই সব সাঁওতালী বন্ধুরও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য যাঁরা লেখককে নানা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

সোভিয়েত-ভারত সম্পর্ক

ল. ই. ব্রেঝনেভ

১৯৬১ সালে ল. ই. ব্রেঝনেভের প্রথম ভারত সফরের পর থেকে, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত-ভারত সম্পর্ক, ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং ভারতের আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়ে আসছেন। এখানে আমরা তাঁর অত্যন্ত স্মরণীয় কিছু কথা উদ্ধৃত করছি যেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

"সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী হল, সর্বোপরি, দুটি শান্তিকামী রাষ্ট্রের, তাদের কোটি কোটি নাগরিকের মধ্যে মৈত্রী, যাঁরা শান্তির পক্ষে, সকল জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। আমাদের সুসম্পর্কের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি এরই মধ্যে নিহিত। আমাদের দুই দেশের পক্ষেই শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পক্ষেও এগুলির অপরিসীম তাৎপর্য এরই মধ্যে নিহিত।"

ডিসেম্বর ১৯৬১। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে ভারত সফরকালে।

"আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত শান্তিকামী, স্বাধীন কর্মপন্থা, এবং চিরাচরিত মৈত্রীর মনোভাব যা দুই দেশের জনগণকে যুক্ত করেছে—এসবই সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে।"

মার্চ ১৯৭১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্ট থেকে।

"সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমাদের গ্রহের অন্যতম বৃহত্তম শান্তিকামী দেশ—ভারতের মধ্যে মৈত্রী সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর

শক্তিশালী সদর্থক প্রভাব বিস্তার করছে। এখন পর্যন্ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত ফলপ্রসূ সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আজ, যখন আমাদের সম্পর্ক শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আমরা মনে করি এই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।"

১৯৭২। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক জাতিসংঘের ৫০তম বার্ষিকী সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট থেকে।

"একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অস্তিত্বের গোটা কালপর্ব জুড়েই তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিকাশ কখনো থেমে থাকে নি। সম্পর্কের এই বিকাশের মধ্যে দিয়েই জন্ম নিয়েছে সোভিয়েত-ভারত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি।"

মার্চ ১৯৭২। সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের পঞ্চদশ কংগ্রেসে তাঁর ভাষণ থেকে।

"এশিয়ার ভবিতব্য নির্ধারণে ভারত নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ওই দেশের সঙ্গে আমাদের শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি রয়েছে। আমরা একে দীর্ঘমেয়াদী, ভালো ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এক নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বলে মনে করি। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত অনেক মূল্যবান অবদান রেখেছে এবং আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় রয়েছে যে, এই ভূমিকা আরো বাড়বে। সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী প্রতি বছরই শক্তিশালী হয়ে চলেছে এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের দুই দেশের জনগণের অতীব কল্যাণ ও বিশ্বশান্তির জন্যে এই লক্ষ্যে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। উজবেকিস্তানকে জনগণের মৈত্রী অর্ডার প্রদান উপলক্ষে তাসখন্দে তাঁর ভাষণ থেকে।

"শান্তির অবিচল নীতির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর গণতান্ত্রিক সমাধানের মিলন ঘটানোর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে ভারত প্রজাতন্ত্র। বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দাবী জোরের সঙ্গে উপস্থিত করে সে তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী সমাধানের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ক্রমান্বয়ে সমাধান করে, ভারতের জনগণ

তাঁদের শান্তিকামী পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী করেছেন।"

২৬ অক্টোবর, ১৯৭৩। শান্তির শক্তিসমূহের বিশ্ব কংগ্রেসে তাঁর ভাষণ থেকে।

"...সোভিয়েত-ভারত সম্পর্কের অভিজ্ঞতার...এক নীতিনিষ্ঠ গুরুত্ব... রয়েছে। এটা দেখায় যে ঘনিষ্ঠ, বহুমুখী মৈত্রী-সম্পর্ক কেমন করে ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা বিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে যখন রাষ্ট্রগুলির নীতি শান্তি ও জাতিসমূহের নিরাপত্তার জন্যে, আগ্রাসন ও সকল ধরনের উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়।"

২৬ নভেম্বর, ১৯৭৩। নয়াদিল্লীর ভোজসভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"সোভিয়েত-ভারত সম্পর্ক এখন স্থায়িত্ব ও পারস্পরিক বিশ্বাসের এরূপ এক মাত্রায় পৌঁছেছে যে আমাদের সামনে আগামী বহু বছর পর্যন্ত নেত্রপাত করার এবং আমাদের সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণে এই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রচনা করার সুযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে।"

"২৬ নভেম্বর, ১৯৭৩। নয়া দিল্লীর ভোজসভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"ভিলাইয়ের ব্লাস্ট ফার্নেসের শিখায় পোড়খাওয়া আমাদের বন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের যুক্ত প্রয়াসের ফলে এক নতুন আবেগ লাভ করেছে। শান্তি, ন্যায়বিচার ও জাতিসমূহের মুক্তির বিজয় এই যুক্ত প্রয়াসের লক্ষ্য। এই বন্ধুত্ব ভবিষ্যতের সঙ্গে নতুন সেতুবন্ধন গড়েছে।"

২৭ নভেম্বর, ১৯৭৩। দিল্লীর নাগরিক সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"আমাদের দুই মহান দেশের জাতিগুলির মধ্যে যোগাযোগকারী শুভেচ্ছার সম্পর্কের দৃঢ়তা তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিষ্কার আবহাওয়ার ও ঝড়ের পরিস্থিতিতে পরীক্ষার মধ্যে পড়েছিল। এবং আজকে, আমি মনে করি, আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারি: আমাদের বন্ধুত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এ বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে আমাদের

দুই জাতির পক্ষে, আমাদের অভিন্ন স্বার্থ ও আমাদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার পক্ষে এই বন্ধুত্ব কত মূল্যবান। এ আরও প্রমাণ করেছে বিশ্বশান্তির আদর্শের পক্ষে এই বন্ধুত্ব কত মূল্যবান।"

২৭ নভেম্বর, ১৯৭৩। দিল্লীর নাগরিক সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"আমাদের সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনজাত দুনিয়ার মধ্যে মহান মৈত্রীর সবচেয়ে প্রত্যয়জনক অভিব্যক্তি।"

২৭ নভেম্বর, ১৯৮৩। দিল্লীর নাগরিক সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"প্রিয় ভারতীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, এই সমুচ্চ মঞ্চ থেকে আপনাদের আমি সোভিয়েত জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও সংহতির মনোভাব, মহান মুক্ত ও স্বাধীন ভারতের সুখ ও সমৃদ্ধির আন্তরিক কামনা জ্ঞাপন করছি।"

২৭ নভেম্বর, ১৯৭৩। দিল্লীর নাগরিক সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র-নীতির অঙ্গাঙ্গী অংশ। ভারত যখন উপনিবেশবাদের জোয়ালে বাঁধা ছিল আমরা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। যখন নতুন ভারতীয় রাষ্ট্রসত্তার আবির্ভাব ঘটছিল সে-সময় আমরা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। ভারতের পক্ষে কঠিন ও পরীক্ষার দিনগুলিতে আমরা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। যে-ভারত তার অতি জরুরী স্বার্থসমূহকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে সেই ভারতের উপর যখন বাইরের বিভিন্ন শক্তি চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছিল সে-সময় আমরা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম।

"আনন্দের দিনে, দুঃখ-কষ্টের দিনে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব।"

২৭ নভেম্বর, ১৯৭৩। দিল্লীর নাগরিক সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"আমাদের বন্ধুত্বের বিকাশকে পর্বত চূড়ায় আরোহণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যত উঁচুতে আমরা আরোহণ করি আমাদের সামনে খুলে যায় ততই বিস্তৃত এক দিগন্ত। আর আমরা উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠতে

চাই যাতে আরও নতুন, আকর্ষক সম্ভাবনার দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়।"

২৭ নভেম্বর, ১৯৭৩। নয়া দিল্লীর নাগরিক সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"সোভিয়েত ইউনিয়নে, শহর ও গ্রামের যৌথ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি যৌথ সদস্য হিসেবে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী সমিতিতে যোগ দেয়। সমগ্র সোভিয়েত জনগণই আপনাদের বন্ধু, আপনাদের বিশ্বস্ত, নিঃস্বার্থ ও নির্ভর-যোগ্য বন্ধু।"

২৮ নভেম্বর, ১৯৭৩। নয়া দিল্লীতে 'ইসকাস'এর সংবর্ধনা সভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

"আমাদের দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রগাঢ় শান্তিকামী প্রকৃতিও উভয় দেশকে নিকটতর করার কারণ। আজকে সোভিয়েত-ভারত বন্ধুত্বের শক্তিবৃদ্ধি দুই দেশের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এই গ্রহজুড়ে শান্তির সংহতিসাধন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতিসাধনের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ তাৎপর্য পরিগ্রহ করছে।"

২৯ নভেম্বর, ১৯৭৩। ভারতীয় সংসদের যুক্ত অধিবেশনে তাঁর ভাষণ থেকে।

"ভারত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আমাদের চিরায়ত কর্মনীতি। সোভিয়েত জনগণ ভারতের শান্তিকামী পররাষ্ট্রনীতির এবং তার কঠিন সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান-কল্পে ভারতের প্রগতিকামী শক্তিগুলির সাহসিক প্রচেষ্টার মর্মাবধারণ করেন এবং, উপরন্তু, এই কর্মনীতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। আমরা ভারতীয় জনগণের ও সরকারের এই প্রয়াসের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।"

১৯৭৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট থেকে।

"সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী এবং বিশ্ব পরিসরে ঘনিষ্ঠ কিংবা অনুরূপ

অবস্থানসহ কর্মতৎপরতা থেকে শুরু করে শ্রম-শিল্পপ্রকল্প নির্মাণ ও মহাকাশ-গবেষণা পর্যন্ত নানাবিধ ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের সফল সহযোগিতা আমাদের দুই জাতির ও রাষ্ট্রের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।"

৬ এপ্রিল, ১৯৭৯। 'ভারতীয় পাঠকের প্রতি'।

"...সোভিয়েত-ভারত বন্ধুত্ব নিছক আমাদের দুই দেশের জাতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার ফল নয়। এই বন্ধুত্ব সহজ-সম্পর্কের জন্যে, নিরস্ত্রীকরণের জন্যে, এবং বিশ্বশান্তি ও প্রগতির জন্যে সংগ্রামে অভিন্ন স্বার্থগুলির দ্বারাও সুদৃঢ় হয়েছে।"

৬ এপ্রিল, ১৯৭৯। 'ভারতীয় পাঠকের প্রতি'।

"আমরা চাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা নতুন ও সমৃদ্ধতর আধেয় অর্জন করুক, এবং আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং যারা আগুন নিয়ে খেলছে ও একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে চাইছে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের যৌথ প্রয়াসের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।"

৬ এপ্রিল, ১৯৭৯। 'ভারতীয় পাঠকের প্রতি'।

"এমন কোনো পররাষ্ট্রনীতি আজ হতেই পারে না যেটা শান্তি, সহজ-সম্পর্ক ও অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে প্রতিহত করার নীতির চেয়ে—এই শব্দটির অর্থের দিক থেকে—বেশি নৈতিকতাপূর্ণ, বেশি নীতিবোধসম্পন্ন আর জাতিসমূহের হৃদয়-মনের নিকটতর। এবং এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের প্রয়াসে আমরা যে ভারতের সঙ্গে একত্রে পা ফেলে এগিয়ে চলেছি সে জন্যে আমরা আনন্দিত।"

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯। মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত ডোজসভায় তাঁর ভাষণ থেকে।

(সোভিয়েত সমীক্ষা বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৫৩, ১৯৮০ থেকে গৃহীত)

একাশি পার্টির দলিল

শঙ্কর রায়

১৯৬০ সালের ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির মহাসম্মেলন বিশ্ব বিপ্লবের ইতিহাসে বৃহত্তম কমিউনিস্ট সভা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐ সম্মেলনে সপ্তাহাধিক কাল আলাপ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, তাকেই আমরা বলে থাকি ৮১ পার্টির দলিল। ভারতে কমিউনিস্ট-দের কাছে ৮১ পার্টির দলিলের সজীবতা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দুই দশক পরে। বাস্তবিকই, সেই ঐতিহাসিক দলিলের মর্মবস্তু স্মরণ ও উপলব্ধি (যা একদিক থেকে কমিউনিস্টসুলভ আত্মবীক্ষা) আজ জরুরী।

স্মরণ থাকতে পারে যে, ৮১ পার্টি দলিলের একটি বিকলঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদ পর্বের প্রথম অধ্যায়ে। সেই দলিল হল ঐ বছর ১৪ জুন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. সি) কেন্দ্রীয় কমিটির লিখিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. এস. ইউ) কেন্দ্রীয় কমিটিকে চিঠি, যাতে ২৫ দফা বিকল্প উপস্থিত করা হয়েছিল। সি পি আই (এম)-এর মতাদর্শগত ভিত্তি এই ২৫ দফা। ট্রটস্কিপন্থী চতুর্থ আন্তর্জাতিক ঐ বিকল্পকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিল : "ওরা যাকে বলে ২৫ দফা, আমরা তাকে বলি ট্রটস্কিবাদ।"

১৯৭৮ সালে জলন্ধরে পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তীকালে সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ ২৫ দফার কথা বেশী বলছেন না, বরং ৮১ পার্টির দলিল এবং ১৯৫৭ সালে ১২ পার্টির দলিলের উপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন।

২৫ দফা এ নিবন্ধের মূল বিষয় নয়, কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট ঐক্যের বিষয়গত প্রেক্ষাপটে এ আলোচনা, ২৫ দফার প্রসঙ্গ বারবার এসে পড়া স্বাভাবিক। তবু ৮১ পার্টির দলিলের সারবস্তু স্মরণ কালোপযোগী হয়ে উঠেছে। তার তাৎপর্য এমনই ভীষণ ও তীব্র যে, কমিউনিস্ট ভাবধারাপুষ্ট সকলকেই ঐ দলিলের কথা বলতে হচ্ছে। সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ যেমন বলছেন, তেমনই দলছুট ইন্দিরা মোহাবিষ্ট এ. আই. সি. পিও ৮১

পার্টির দলিলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছে। সে দলিলের মূলকথাগুলির পুনরুচ্চারণ এবং বর্তমান বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে তার ফলিত রূপায়ণ চিন্তা এ কারণে জরুরী কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রশ্নে ৮১ পার্টির বক্তব্য ছিল : "শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও সমাজবিকাশের সমগ্র ধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপুল সর্বজয়ী শক্তি ও ক্ষমতার নতুন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে, আধুনিক সংশোধনবাদী 'তত্ত্ব'-গুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়েছে। কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ণতর বিকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, যা এখন প্রধান বিপদ, এবং সংকীর্ণতাবাদ ও গোঁড়ামির দুই ফ্রন্টে স্থিরসংকল্প সংগ্রাম চালাতে হবে।"

"তত্ত্বে ও প্রয়োগে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিফলনস্বরূপ সংশোধনবাদ ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ বিকৃত করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, তার বৈপ্লবিক সারবত্তা শুষে নেয় এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের স্বার্থে সংগ্রামরত শ্রমিকসমাজ ও মেহনতী মানুষকে নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

"নির্দয়ভাবে মোকাবিলা না করতে পারলে তত্ত্বে ও প্রয়োগে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাবাদও কোনো কোনো পার্টির বিকাশের কোন স্তরে প্রধান হয়ে উঠতে পারে। তারা বিপ্লবী পার্টিগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণভিত্তিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিকাশক্ষমতা অপহরণ করে, কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করে মেহনতী জনগণের ব্যাপক জনতা থেকে, বৈপ্লবিক আন্দোলনে, নিষ্ক্রিয় প্রত্যাশা অথবা বামপন্থী হঠকারী কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দেয়; শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয় অর্জনে সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করে পরিবর্তমান পরিস্থিতি ও নতুন অভিজ্ঞতার সঠিক ও সময়োচিত অনুমানে বাধা দেয়, এবং এভাবে জনগণকে ন্যায়সংগত সংগ্রামে বিজয়লাভে বাধা দেয়।"

ভারতের নিজস্ব অভিজ্ঞতা (অন্য দেশের কথা ছেড়েই দিলাম) আহরণ করে আমরা বলতে পারি যে, দুই দশক আগেকার এই সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ কত বাস্তবসম্মত। সংশোধনবাদের প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ বড় রকমের ভুল করেছিল—একথা ভাতিণ্ডা কংগ্রেসে স্বীকৃত হয়েছে। এ অশনিসংকেত যে এখনো আছে তার প্রমাণ এ-আই-সি-পি নামক ছদ্ম-

কমিউনিস্ট দলের আত্মপ্রকাশ যাদের রাজনৈতিক শিক্ষকের মতে ইন্দিরা সরকার পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (যার মাধ্যম অপুঁজিতন্ত্র) কর্তব্য সমাধান করতে পারে। এরা আবার ৮১ পার্টির দলিলের প্রতি অনুগত বলে দাবী করে থাকে। লেনিন বলেছিলেন ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা এমনই যে মার্কসবাদের বিজয়ের ফলে মার্কসবাদ-বিরোধীরাও ছদ্ম মার্কসবাদী হয়ে ওঠে। ৮১ পার্টির দলিলে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছিল : "সামাজিক সংঘাত যত বিকাশলাভ করবে জাতীয় বুর্জোয়ারা তত বেশী করে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের দিকে ঝুঁকে পড়ে।" আর এ-আই-সি-পি ও তার পৃষ্ঠপোষকেরা বলছে জাতীয় বুর্জোয়াদের ইন্দিরা-পন্থীরা পুঁজিতন্ত্রকেই আঘাত করবে। একে ছদ্ম মার্কসবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি ?

সংশোধনবাদীরা বলে বেড়ায় যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের যৌথ নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার কথা ৮১ পার্টির দলিলে বলা হয়েছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতির প্রমাণ করে যে, এটা মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকন্তু ঐ দলিলে বলা হয়েছে : "জনগণ অবশ্য বুঝতে শুরু করেছে যে যুগযুগান্তের পশ্চাৎপদতা অবসৃপ্তি ও তাদের জীবনধারণমান উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ পথ অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ। **কেবল এভাবেই জনগণ মুক্ত হতে পারে শোষণ, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা হতে। মেহনতী জনগণ ও ব্যাপক কৃষক জনতাকে এই মৌলিক সামাজিক সমস্যা সমাধানে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা নিতে হবে।"** (বড় হরফ সংযোজিত)।

বলা বাহুল্য নেতৃত্বদানকরী শ্রেণীগুলির মধ্যে একচেটিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী চিহ্নিত হয়নি। কারণ অ-একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীও শোষণকারী (দ্রষ্টব্য : সি পি আই এর কর্মসূচী, অষ্টম অধ্যায়)। সি পি আই এর সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা সি পি আই পোষণ করেনা (Problems of National Liberation, Vol II, No. I)। অত্যন্ত পরিতাপকর এই যে, শ্রীরাও একথা বলার পরেও এক নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক (মোহিত সেন) লিখেছিলেন যে, যৌথ নেতৃত্বের ধারণা সি পি আই এর উল্লেখ্য অবদান। দ্রষ্টব্য : (Euro-Communism or Scientific Socialism. PPH, 1979, পৃঃ ২২)।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ৮১ পার্টির দলিলের মর্মবস্তু বাস্তবিকই

স্মরণযোগ্য। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাম্প্রতিক দশকগুলিতে তো বটেই। ঐ দলিলে তৃতীয় দুনিয়ায় স্বাধীন বিকাশের পথ হিসাবে ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছিল—জাতীয় গণতন্ত্রের কথা, অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথের কথা। জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা যে গৌণ হতে গৌণতর হচ্ছে, সেকথা আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে ৭৫ পার্টির মহাসম্মেলনে: "সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে সামাজিক বিভাজন বিকশিত হচ্ছে। একদিকে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও পাতিবুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশসহ গণতান্ত্রিক শক্তি সমাবেশ ও অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ক্রমবর্ধিত আপসকামী দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি, জাতীয় বুর্জোয়াদের অংশের মধ্যে, তীব্র সংঘাত দেখা দিচ্ছে।" লক্ষ্য করার বিষয়, সামাজিক বিভাজন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শ্রমিক, কৃষক ও পাতিবুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশের ভূমিকার কথা কথা হয়েছে এবং অন্যদিকে জাতীয় বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান আপস প্রবণতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ দলিল বাম সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে যে হুঁশিয়ারী জানিয়েছিল, তার সত্যতা যে কত সুদূরপ্রসারী ছিল, ভারতে নকশালবাড়ী আন্দোলনের ধূমকেতুপ্রতিম উত্থান ও পতনের প্রক্রিয়ার দিকে তাকালেই তা অনুধাবন করা যায়। আজকে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নকশালপন্থীদের মতো ছত্রভঙ্গ ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন আর কারা আছে? ইতিহাসে ট্রটস্কিপন্থী ও তাদের সমগোত্রীয়দের যা পরিণতি হয়েছে, ভারতে নকশাল-পন্থীদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং এত বড় ভাঙ্গন তৃতীয় দুনিয়ার বামপন্থী আন্দোলনে বিরল।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ও দুই দশকের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত অভিজ্ঞতায় সি পি আই (এম) সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য এসে পড়ে। প্রসঙ্গতঃ, লেনিনের ১১০তম বার্ষিকী উপলক্ষে সি পি আই (এম) এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'পীপলস ডেমক্র্যাসি'তে (২০।৪।৮০) তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা বি টি রণদিভের প্রবন্ধ 'হোল্ড দ্য ব্যানার অফ প্রলেটারিয়ান ইন্টারন্যাশনালিজম' বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তা থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে উদ্ধৃত করছি: "প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে বিচ্যুতি এখন পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। এই সব পার্টির ক্ষেত্রে সংশোধনবাদের উৎস সেই লেনিনের সময়েরই, সংসদীয় সুবিধাবাদ।

"প্রথম শিকার হল প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি পার্টিজান মনোভাব।···কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতার নামে শুরু হল এ দুইয়ের মাঝে দোলাচল খেলা এবং পরে কিছু কিছু পার্টি প্রকাশ্যে অতলান্তিক জোটকে সমর্থন জানালো। সুবিধাবাদের মুক্তির শেষ নেই। আপনাকে তা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপক্ষে নিয়ে যাবে যদি আপনি অগ্রাহ্য করেন একালের মূল দ্বন্দ্ব—সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ শিবিরের দ্বন্দ্ব।

"ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও, বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলন সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং দুই শিবিরের মধ্যেকার সংগ্রামে মনোনিবেশ করেছে। শান্তি আন্দোলনে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা নিয়েছে ও সাম্রাজ্যবাদীদের কোণঠাসা করেছে। আবার মুক্তি সংগ্রামগুলিতে সুদৃঢ় সমর্থন দিয়েছে। সবার উপরে রয়েছে ভিয়েতনামী জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অভূতপূর্ব ও চমকপ্রদ সংহতি ও সমর্থন। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তির জন্য সংগ্রামের সাথে সাথে সামরিক শক্তি সঞ্চয়কে অবহেলা করে নি। এজন্য সমাজতান্ত্রিক শিবির ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্মান অতীতের যে-কোন সময় থেকে উঁচুতে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামী দেশগুলির ঐক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিহাস রয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষে।" কমরেড রণদিভের এই বিশ্লেষণ সাধারণভাবে অভিনন্দনযোগ্য। এর মধ্যে অন্তত মস্কো ও পিকিং থেকে সমদূরত্বের আত্মপ্রতারণা নেই, আছে বাস্তবিক সত্যকে গ্রহণ করার সৎসাহস। (একই সংখ্যায় তাঁদেরই নেতা বাসবপুন্নিয়া অবশ্য সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপকে সমগোত্রীয়জ্ঞান করে সমদূরত্বের মহড়া দিয়েছেন।)

এগারো বছর আগে সি পি আই (এম) এর নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বক্তব্য: "বিষয়গতভাবে বলতে গেলে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের এ প্রশ্ন সম্পর্কে মনোভাব এক নিশ্চয়তাহীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য ও তার আর্থিক রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ও সার্বিক বিকাশ এবং সমস্ত ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের চেয়ে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের যোগসাজসই শান্তিরক্ষার বড় নিশ্চয়তা" (Stand on Ideological Issues, 1969, পৃ ১৮)। ঐ মতাদর্শগত দলিল সি. পি. আই (এম) এখনও প্রত্যাহার করে নি। কমরেড রণদিভের উদ্ধৃত প্রবন্ধাংশই প্রমাণ করে যে, এই বক্তব্য বাস্তবানুগ ছিল না।

একাশি পার্টির দলিলের মর্মবস্তু আজ কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করলে চলবে না। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নানা সমস্যা সত্ত্বেও বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগমন অব্যাহত রয়েছে। তার কারণ এ যুগের সমাজবিকাশে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নিয়ামক, একথা সেই দলিলে বিবৃত হয়েছিল। সে দলিলের মূলসূত্রগুলির পুনরুচ্চারণ প্রয়োজন।

"সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের মিত্র শক্তি।"...

"রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মানে সংশোধনবাদীদের ব্যাখ্যানুযায়ী শ্রেণীসংগ্রাম অস্বীকার করা নয়। বিসদৃশ সমাজব্যবস্থাগুলির মধ্যে সহাবস্থান সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণীসংগ্রামের এবং ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে জনগণের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যগুলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে প্রসারিত করে।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যখন শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আন্দোলন চালিয়েছে, একই সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম ও লাওসের জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামে বৈষয়িক, আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েছে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করেছে। মতাদর্শগত সংগ্রামে শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেয় নি।

সামগ্রিক বিবেচনায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিসরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের দিক আজ অনেক অনুকূল, বিভেদের শক্তিগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও তার বিকাশ সম্ভাবনা ক্রম অবরুদ্ধ, কারণ সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ গণআন্দোলনে ও জনমানসে প্রভাবপাত করার ক্ষমতা ক্রমশই হারিয়েছে। কারণ শ্রম ও পুঁজির সংঘাত যত বাড়ছে, সংস্কারবাদ ও সংশোধনবাদ তত শক্তিহীন হচ্ছে, তত শ্রমজীবী মানুষ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ত্রৎস্কিবাদ থেকে মাওবাদের বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত অতিবামপন্থা বিচ্ছিন্ন, হতাশ ও প্রায়শ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গী। ৮১ পার্টির দলিলের বস্তুসার আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট ঐক্যের উদ্ভাসিত সম্ভাবনায়। কিন্তু দলিল স্থাবর নয় জঙ্গম, তার নিরবচ্ছিন্নতায় রচিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ৭৫ পার্টির দলিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য সুদৃঢ় করার মানসিকতা নিয়ে সেই দলিলে বলা হয়েছিল :

"কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক যুক্তফ্রন্ট উপস্থাপনার প্রতিজ্ঞা পুনর্ঘোষণা করছে।

উদ্ভূত কিছু কিছু মতভেদ মতবিনিময় মাধ্যমে দূর হতে পারে অথবা ঘটনা-প্রবাহের বিকাশে পুরানো সমস্যাগুলির সারাংশ অভিব্যক্ত করলে দূর হতে পারে।...ঐক্য শক্তিশালী হতে পারে মূর্ত বাস্তবের যৌথ বিশ্লেষণে।"

প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টির, এমন কি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূলপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন দলগুলির আজ একথাগুলি ভাবা উচিত। ইতিহাস আজ কমিউনিস্টদের পাশে, যাদের জয় করার জন্য আছে গোটা দুনিয়া।

পরিশেষে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এবং সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্যে ঐক্য আরো মজবুত করতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ আরও বাড়াতে এবং বিশ্ব শান্তি জাতীয় মুক্তি গণতন্ত্র আর মুক্তি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য দেশে দেশে মহতী সংগ্রামে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে ঐ সভায় রচিত দলিল দুখানি যে বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন, তাতে আমাদের গভীর প্রত্যয় আছে।" ৮১ পার্টির দলিলকে "জয়ের পতাকা, ঐক্যের পতাকা" শিরোনামে চীনের 'পীপলস ডেইলী' যে সম্পাদকীয় লিখেছিল, এটি তারই অংশ। এ দুই দশকের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যারা এসেছেন, তাদের কাছে এ উদ্ধৃতি আকস্মিকতা বহন করে নিয়ে আসবে। সত্য সততই গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর।

নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত :
প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান সিণ্ডিকেট।
পরিবেশক—নির্মল সাহিত্য মন্দির,
৫৬১ বি, রবীন্দ্র সরণি। কলকাতা-
৭০০০০৬। দাম ৩০ টাকা।

৪১৪ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থখানি নানাদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রচয়িতা স্বয়ং নাট্যকার—এবং এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা সূত্রের ধারা শুধু এ দেশীয় নাট্য আন্দোলনই নয়—বিদেশের নাট্য আন্দোলনের ধারার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে নাটক রচনা ও পরিবেশনাকে কেন্দ্র করে তিনি নাট্যশিল্প সম্পর্কে শিল্পজিজ্ঞাসার নানা বিষয়কে উত্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, নাট্যশিল্পকে কেবলমাত্র শিল্পজিজ্ঞাসার কেতাবী সংকীর্ণ সীমার মধ্যে না রেখে তাকে দেশ, কাল, সমাজ ও চলিষ্ণু জীবন তথা বিশ্বপ্রবাহের পটভূমিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সুচিন্তিত দিক্‌নির্দেশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি।

এ নির্দেশ তাঁর সাজেও। একথা উল্লেখ করা বাহুল্য যে দিগিনবাবু বাংলা দেশের নব নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে এবং সাধারণভাবে শিল্প সংস্কৃতির প্রগতি-শীল চিন্তাধারার সঙ্গে প্রায় আজীবন সম্পর্কিত। বিশেষভাবে চল্লিশের দশকে যখন গণনাট্য সংঘ তাদের বিচিত্র ও অভিনব মঞ্চগত উপস্থাপনে, অভিনয়ে এবং অভিনেয় বক্তব্যে ভারতবর্ষের বিশাল জনসমাজের মনকে আকর্ষণ করেছিল এবং শুধু আকর্ষণই করে নি—তাদের দৃষ্টিকে নূতন আশায় ও উদ্দীপনায় প্রসারিত করেছিল—তেমন আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। প্রত্যক্ষ এই সম্পর্কের ফলে তিনি গণনাট্য সংঘের ভেতরকার সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিতে পেরেছেন। গণনাট্য সংঘ গঠনের ইতিবৃত্ত, তার সম্প্রসারণের ইতিহাস, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এই সংঘের যে-সব অভিনয়-সফল নাটক ও নাট্যকার নাট্য-আন্দোলনের নূতন দিগন্তকে

সেদিন উন্মোচিত করেছিল—তাদের কথা এমন সুষ্ঠু বিন্যাসে আর কেউ বলেছেন বলে জানি না। সেদিক থেকে একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে এ বইয়ের মর্যাদা অনস্বীকার্য।

'শিল্পের জন্যই শিল্প'—ব্রাসভ-সহিষ্ণু এ পৌরাণিক বক্তব্যের তিনি সমর্থক নন বর্তমান বিপ্লব-উন্মুখ বিশ্বে ও কালে। শিল্পকে তিনি মানুষের অপরূপ এক আবিষ্কার বলে মনে করেন—তাই মানুষের কল্যাণ, সুন্দর, সত্য ও সম্পূর্ণতার লক্ষ্যেই তাকে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত তিনি ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের গোড়াকার নিবন্ধগুলির বক্তব্য কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্ত হলেও, খুবই সুচিন্তিত রচনা। নাট্যরচনা, নাট্যালোচনা ও তার প্রয়োগ শিল্পের ক্ষেত্রে নবীন শিল্পকর্মীদের পক্ষে তা প্রেরণাদায়ক।

তেমনি বেদনাদায়ক একেবারে সাম্প্রতিক বাংলা নাট্য আন্দোলনের নানা দিগভ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুর্বলতা। এ শুধু স্বয়ং দিগিনবাবুর পক্ষেই নয়—সমগ্র দেশ ও সমাজের পক্ষেই। প্রগতিশীল শিবিরে বর্তমানে পরিচিত এক খ্যাতিমান অভিনেতা ও 'এ্যাবসার্ড' নাট্যরচয়িতাকে প্রগতি লেখক শিল্পীর এক সম্মেলনে বলতে শুনেছি—'বাজারে টিকে থাকা দায় হয়েছে··· পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না'···ইত্যাদি। প্রগতি শিবিরে তাঁর আরও বহু প্রগতি-বিরোধী কথা শুনেছি। কিন্তু তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য তাঁর জীবিকার ধান্ধার কথা হতে পারে, ব্যক্তিগত নাম যশ কুড়োবার সমস্যার কথা হতে পারে—নব-নাট্য আন্দোলনের সমস্যার বা সংগ্রামের কথা এ নয়। অবশ্যই একথা মিথ্যা নয় যে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলো এ আন্দোলনের শরিক আজও নয়—আগেও ছিল না। সেখানে সাধারণ দর্শকসমাজকে সহজে আকর্ষণ করে বেশ কিছু লাভের কড়ি গুছোতে পারে এমন নাটকই মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। সজ্ঞায়, বক্তব্যে কলায় সেখানে এক-একটা নারীমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলছে। দুর্লভ জীবন-যজ্ঞের সে এক ভাঁড়ামি। এ বিষয়ে সুবিখ্যাত হেরেসিম লেবেডেফ সাহেবের একটা মন্তব্য মনে পড়ছে। প্রথম নাটক রচয়িতা এবং প্রয়োগ শিল্পী হিসেবে সাহেব আমাদের সহর কলকাতার সমাজের মানুষগুলিকে একভাবে চিনে-ছিলেন। আমাদের তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষার আড়ালে যে একটা কেন্দ্রবিচ্যুত অত্যন্ত তরল চারিত্রিক দুর্বলতা আছে তা বিদেশীর সন্ধানী চোখে বোধ করি সহজেই ধরা পড়েছিল। সাহেব মন্তব্য করেছিলেন :

"I translated two English dramatic pieces namely, 'The Disguise'. and Love is the Best Doctor' having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense. however purely expressed."

এই mimicry আর drollery—ভাঁচাসি আর ভাঁড়ামি, জীবন নয়—জীবনের প্যারডি-প্রহসন, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আজও তার অব্যাহত গতি। যোগ্য নাটক রচনা যেমন সমস্যা তেমন আমাদের রুচি দৈন্যও একটা সমস্যা।

বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই। কারণ বিশাল এর পরিধি। গবেষণালব্ধ গ্রন্থ হিসেবে এটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন—ইওরোপের নবনাট্য চিন্তা, ইংল্যাণ্ডের নাট্য আন্দোলন, মার্কিন নাটোর নবযুগ, পিরানদেল্লোর শিল্পচেতনা (ইতালি), আইরিশ নাট্য আন্দোলন, রুশ থিয়েটারেরর পাস্তর (শেখভ থেকে সমাজতান্ত্রিক নাট্যচেতনা), সার্ত্র, লরকা, ব্রেখট—এ সবই তাঁর আলোচনার পরিধির মধ্যে এসে পড়েছে। দীর্ঘ চার দশকের সমাহৃত চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও তুলনামূলক বিচারের ফসল তাঁর এই গ্রন্থ—মূল্যবান এক গবেষণা। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

সুশীল জানা

MULYAYAN
(October December—1980)
Regd. No. W.B./CS 16
R. N 13785/65

17 MAR 1981

আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায় ?

17 MAR 1981

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্তত নিশ্চিন্ত। টানাপোড়েন সরকারেরও। টাকা নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে। এই কারণেই যাতে অল্প বিত্তবান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হোন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি—১৯৩১৪, '৮০

মূল্যায়ন ১২০ বেন্টিঙ্ক রোড, কলিকাতা-১ দাম : দুই-টাকা

- আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে একগুচ্ছ প্রবন্ধ
- কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের আর এক অধ্যায়
- কিউবা বিপ্লবের তাৎপর্য
- বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির সপক্ষে

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪

দাম : দুই টাকা

মূল্যায়ন

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪

১৩৮৭

সূচী

	পৃষ্ঠা
সাহিত্য সমালোচক আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ / সুশীল জানা	১
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে / তুষার চট্টোপাধ্যায়	১৯
কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের আর এক অধ্যায় (৩) / রণেন সেন	২৯
আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে (স্মৃতিচারণ) / নরহরি কবিরাজ	৪২
কিউবা বিপ্লবের তাৎপর্য / ভানুদেব দত্ত	৫০
বিপ্লব সাধনায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে যা পেয়েছি / সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৬৩
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৬তম কংগ্রেস—	
সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক / ল. ই. ব্রেজনেভ	৬৯
পুস্তক পরিচয় / শঙ্কর রায়	৭৫
সম্পাদকীয়—	৮০
বিয়োগপঞ্জী—	৮৩

সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ

উপদেষ্টামণ্ডলী : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, সুশীল জানা,
নির্মাল্য বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিঃ-১৭ হইতে মুদ্রিত ও ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩ হইতে প্রকাশিত।

সাহিত্য সমালোচক আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ

সুশীল জানা

পাণ্ডিত্য, সংবেদনশীলতা আর কর্মনিষ্ঠা একাধারে পাওয়া—সে বড় বিরল। তবু মাঝে মাঝে অশ্রান্ত প্রবহমান আমাদের সাধারণের এই সমাজে এক-একজন এমন অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁদের মধ্যে আমরা ওই তিনটি গুণের একত্র বিরল সমাবেশ লক্ষ্য করি। যে-কালে সে মানুষেরা বিরাজ করেন তাঁদের অনন্য পাণ্ডিত্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত যতই অনধিগম্য, সুদূর ও স্পর্শের অতীত বলে মনে হোক, জ্যোতিষ্কের আলোর মতই তাঁদের সংবেদনশীলতা ও কর্মনিষ্ঠার স্পর্শে আমরা ধন্য হই, জীবন্ত এক উষ্ণতায় আমাদের মুহ্যমান হিমশীতলতার অবসান ঘটে। সৌভাগ্যের কথা, আমাদের যৌবনকালে অতি সাধারণ আমরা তেমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম আচার্য ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে—যাঁর উদার, উজ্জীবনী সাহচর্যে আমরা অভিষিক্ত হয়েছি। আজ তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবের মধ্যে সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর সেই অমূল্য সাহচর্যের কথা স্মরণ করি।

পীড়ন, শোষণ ও ভণ্ডামীর সহস্র নিগড়ে বাঁধা দেশের যে মুহ্যমান জনজীবন—সেখানে ছিল তাঁর নূতন জীবনের সাধনা, সমস্ত নিগড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে নূতন এক জীবনের প্রবাহকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার সাধনা। এ ক্ষেত্রে অক্লান্ত কর্মী তিনি, বহু বিপ্লবীর দীক্ষাগুরু তিনি। তাঁর সংবেদনশীলতা তাঁকে অতি সহজে টেনে নিয়ে গেছে আমাদের দরিদ্রতম কৃষক বা শ্রমিকের জীর্ণতম কুঁড়েটির পাশেও। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর ক্রোধ ও নির্যাতন এসে পড়েছে তাঁর ওপরে। স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন—বলা-বাহুল্য, সেকালের লক্ষ্মীর বরপুত্রদের মত নয়, বরং লক্ষ্মীছাড়ার মতই। কিন্তু লৌহদৃঢ় তাঁর চরিত্র কোন কিছুতেই বিচলিত হয়নি। বরং নানা দেশ ও জাতির জীবনপ্রবাহ থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ জ্ঞানের উপকরণ—নবজীবনবোধের উপকরণসমূহ, যা তাঁর অভিজ্ঞতাকে করেছে ঐশ্বর্যময়, দৃষ্টিকে করেছে সর্বসংস্কারমুক্ত—অনাবিল। এবং তার সব উত্তরাধিকারটুকু তিনি আমাদের দান করে গেছেন তাঁর মণীষার ক্ষেত্রে। বলতে দ্বিধা নেই—সে দানের পরিমাণ যে কতখানি, সে সম্পর্কে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এক কালে প্রায় নীরবেই থেকেছেন। এবং যদিবা সরব হয়েছেন—হয়েছেন বিরোধিতায়; সেদিন উন্মেষমান একটা নতুন কালের প্রথম ভেরীধ্বনিকে অনেকে বোঝেননি—অথবা ভুল বুঝেছিলেন। এমনিই হয়—বহুদিন আচরিত সংস্কার ও বিশ্বাস সহসা পরিত্যাগ করা সুকঠিন।

তাঁর যৌবন ও জীবনচর্যা সেদিন আমাদের কাছে মনে হত এক উপাখ্যানের মত। এ যুগের এক ভুবনখ্যাত সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ ও ধর্মসংঘের নেতা তাঁর অগ্রজ—কিন্তু তিনি সন্ন্যাস থেকে বহুদূরে—চিরকুমার, গৃহী এবং দরিদ্র সাধারণ গৃহীর সার্বিক মুক্তির চিন্তায় সমর্পিতপ্রাণ বিপ্লবী। দার্শনিক তিনি—কিন্তু ভাবুক পণ্ডিত মাত্র নন, বরং অন্যান্য দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অভিসন্ধি নির্দেশ ক'রে যে দর্শনে দুনিয়ার নিপীড়িত শোষিত মানুষের সামগ্রিক মুক্তির পথ নির্দেশিত—সেই দর্শনকে করেছিলেন তাঁর জীবনবেদ, কর্মে কথায় ও রচনায়। সে দর্শন মার্ক্সবাদ। বস্তুত, আমাদের দেশের মার্ক্সবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। এই দর্শনের আলোকে তিনি কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় সংগ্রামের তাৎপর্য বা দেশীয় শ্রেণীস্বার্থের স্বরূপই বিশ্লেষণ করে নিজের কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করেন নি, অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রটাই একমাত্র ক্ষেত্র বলে তাঁর মনে হয়নি। দৃষ্টি তাঁর আকর্ষিত হয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। কারণ তিনি জানতেন—সংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটা প্রাচীন জাতির সৃষ্টি ও চিন্তার বিপুল ভাণ্ডার অবহেলার বস্তু নয়, সংস্কৃতি-গর্বিত জাতির জীবনে তার প্রভাব অপরিসীম। সে সব ক্ষেত্রে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানের মূল্য ও ফলশ্রুতি অপরিমীম। ধর্মশাস্ত্র বল, সমাজতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব বল, জাতিতত্ত্ব বল, সাহিত্য বল—অর্থাৎ বিরাট একটা জাতির সামগ্রিক সংস্কৃতির সর্ব অংশে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। শুধু বিচরণ এবং উদ্‌গীরণ মাত্র নয়—ছিল বাস্তবিক বস্তুবিচারের আলোয় বিশ্লেষণ ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন একটা ভূখণ্ডের বিশাল ও বিচিত্র জনসমষ্টির সুদীর্ঘ ইতিহাসে বহুকাল

ঘরে জমেছিল অনেক জঞ্জাল, স্বার্থান্ধ উচ্চ কোটির নানা কৌশলী মিথ্যার মায়াজাল, বর্ণাশ্রমের প্রবল পীড়ন ও ঘৃণ্য ভেদপন্থা, ধর্মের ভণ্ডামী, জনগণের ইতিহাস সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা অথবা অবহেলা অথবা অজ্ঞতা। আর সেটাই ছিল মামুলি কেতাবী পণ্ডিত মহলে চর্বিতচর্বণের বস্তু এবং আমাদের নবীন পড়ুয়া মহলে ছিল জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে বন্দনীয়। কিন্তু তিনি এ সত্য মর্মে মর্মে বুঝে ছিলেন—এ রকম একটা গলদে ও ফাঁকিতে ভরা ঐতিহ্য জাতিকে শক্তিমান করে না, ঐক্যবদ্ধ করে না, উন্নত একটা সমাজ সৃষ্টির পথে অগ্রসর করে দিতে পারে না—শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা দূরে থাক। তাই অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন তিনি সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায়। এ কথা ঠিক—এ কাজ তাঁর সম্পূর্ণ হয়নি। বহুক্ষেত্রে তা সূত্রাকারে দিক্‌নির্দেশক মাত্র। তবু সবিস্ময়ে তাঁর পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন—আমাদের খণ্ডিত, অর্ধোচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত, বিক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তটাকে বাস্তবিক বিচারের মাপকাঠিতে কি অপরিসীম অধ্যবসায়ে একটা অবিচ্ছিন্ন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। এদিক থেকে তাঁকে মনে হয় ১২শ শতাব্দীর উত্তরসাধক, বোধ করি শেষ সত্যসন্ধানী।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমাজ-ইতিহাসগত শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রবন্ধাকারে কতগুলি রচনার সূত্রপাত করেন—সে ১৯৩২-৩৩ সালের কথা। সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সেই প্রথম সূত্রপাত। বহু সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন এ দেশের স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা বুদ্ধিজীবী মহলে এবং সাহিত্যের বৈঠকগুলোতে একটা বিরূপ সোরগোল পড়ে যায়। ইওরোপে তখন ধীরে ধীরে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের—তথা ফ্যাসীবাদের দৈত্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এর বছর চারেকের মধ্যে বাংলায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' স্থাপিত হয় এবং ডঃ দত্ত হলেন তাঁর এক কর্ণধার—তাত্ত্বিক, পথপ্রদর্শক। সনাতনী মহলে সোরগোলটা তাতে আরও বেড়ে যায়। এ বিরোধী সোরগোল সাহিত্যের সামগ্রিক রসাস্বাদ নিয়ে। সেদিন পর্যন্ত সাহিত্য আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র রূপ, রস ও রীতি নিয়ে। আমাদের সামন্ত যুগের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রসগত ঐতিহ্যই ছিল তার মেরুদণ্ড, রূপ বা form-এর দিক থেকে সংযোজিত হয়েছিল মাত্র ইওরোপাগত ধনবাদী দুনিয়ার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য। এ দুয়ের মিশ্রণে আমাদের সাহিত্য ভারি বিচিত্র। অবশ্যই, এর পেছনে একটা অপ্রতিরোধ্য

ঐতিহাসিক কারণ আছে। ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ফলে সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশের ওপর এসে পড়ে ইংরোপীয় বুর্জোয়া নন্দন-তত্ত্বের প্রভাব। অন্যদিকে দুর্মর ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব—যাতে আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের কেতাবী সমালোচক, সাহিত্যস্রষ্টা, শিল্পী ও রসবাদীরা এ দুয়ের মিশ্রন ও সামঞ্জস্য করতে বসলেন। এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ শুধু নামোল্লেখ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের [দ্রষ্টব্য : বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী] কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয় আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ছোট বই—রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' এবং অতুল চন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য জিজ্ঞাসা।' সামন্ত যুগ এবং বুর্জোয়া যুগ—গোরুতে এবং বাঘে সেখানে অবলীলায় একঘাটে জল খায়। এ কতখানি ভারতীয় সংস্কৃতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য 'শোষক শক্তি' অথবা পরাধীন ভারতীয়ের নিরুপায় ক্লৈব্য—অথবা ইংরেজের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সামন্ত বুর্জোয়া মিত্র নীতি সঞ্জাত—তা বিচার্য। আমাদের আলোচ্য রসবাদের ক্ষেত্রে ভারতের নবোদ্ভূত সহযোগী ধনবাদের (Comprador Bourgeois) মতো সে এক সংমিশ্রিত রসবাদ। বোধ করি এ জন্যই ভূপেন্দ্রনাথ এক জায়গায় সঙ্কোচে মন্তব্য করেছেন—'আমাদের সত্যকারের বুর্জোয়া সাহিত্যের অভাব।' রূপ ও রসের অগাধ সাগরে আমরা হাবুডুবু খেয়েছি—নতুন পাকা বন্দরের আমরা নিশানা ঠিক পাইনি এবং নতুন যুগের নতুন বন্দরের সাংগঠনিক চরিত্র, বিরোধ ও বৈচিত্র বোধ করি জানতে চাইও নি। ভিন্ন দুই যুগের যে মৌলিক একটা বিরোধ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে—সে চেতনার অভাব ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। এখানে স্মরণযোগ্য, একদা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' অথবা নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' নিয়ে তথাকথিত সনাতনী সমালোচক ও বুদ্ধিজীবী মহলে কম আলোচনার ঝড় বয়ে যায় নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' তাঁর এক মহৎ উপন্যাস সন্দেহ নেই কিন্তু তার সমাপ্তি কী? শরৎচন্দ্রের একটা রসিকতার কথা মনে পড়ে—তা কতকটা এই রকম : শেষ পর্যন্ত একটা গাইনোকোলজিস্ট এসে এত সহজে ব্যাপারটার সমাধান করে দিলে!

কিন্তু কাল-গতি বড় নির্মম, তার বিবর্তন ও পরিণাম বড় অনিবার্য। সমস্ত রচনার পেছনে যে একটা সমাজ-মন আছে, কখনো প্রগতির মুখে—কখনো প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে, এ সব ছিল সনাতনী সমালোচনার বহির্ভূত। সঙ্কোচে এক জায়গায় ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন—

'ইহারা বলেন, রূপ ও রস লইয়াই সাহিত্য, তাহাতে প্রগতি অপ্রগতি আবার কী !'

অন্যত্র বলছেন—

'কেবল কতগুলি ভাব দ্বারাই সমাজ ও তাহার সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। রূপ ও রস যুগে যুগে এবং জাতিতে জাতিতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী [Historical Materialism] সমাজপটে যে প্রকারের পরিবর্তন দেখা যায় সাহিত্যেও তাহার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। আর যে আদর্শ সমাজকে আরও অগ্রগমনশীলতার দিকে নির্দেশ করে তাহাকে "প্রগতিশীল" বলা হয়। প্রগতি আপেক্ষিক বস্তু। সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা হইতে বুর্জোয়া সভ্যতা আপেক্ষিক ভাবে অগ্রসর বলিয়া এই সভ্যতাকে "প্রগতিশীল" বলা হয়। আবার যাহারা সমাজতন্ত্রবাদকে মানবের পক্ষে আরও প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন তাহারা প্রোলেটারীয় সভ্যতা ও সাহিত্যকে অগ্রসরশীল বলিয়া মনে করেন।'

ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার উপরোক্ত মানদণ্ডে তিনি শুধু ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যই নয়, আমাদের উর্দু এবং হিন্দী সাহিত্য এবং বিশ্বের তাবৎ উন্নত দেশের সাহিত্যও আলোচনা করেছেন এবং যুগ সমূহের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। শূদ্রযুগ, ক্লাসিক্যাল যুগ, সামন্ত যুগ, বুর্জোয়া যুগ, উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক যুগ—সেই সঙ্গে সমাজ মানস ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা এবং যুগধর্মানুযায়ী এ সব দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিরূপ একদিন আমাদের যৌবনকালে চোখের সামনে একটা নতুন অর্থবহ জগত ও জীবনকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল। বলতে দ্বিধা নেই—মায়া রচিত বহুদিনের একটা মানস-লোককে আমরা হারিয়েছিলাম এবং পেয়েছিলাম নবোদ্ভিন্ন এক যুক্তিনির্ভর যৌবনলোক। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আমাদের রূপ রস ও রীতি সর্বস্ব একটা স্বপ্নলোক।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সেদিন আমাদের কাছে নূতন ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্য: ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ-মালার মত। আপাত তাই মনে হয় বটে।

সত্যিই তো—কোথায় কোন্ কালে সেই মহেঞ্জোদাড়ো-হারাপ্পা আর কোথায় উজ্জয়িনী। কোথায় রাজগৃহ নালন্দা আর কোথায় মগধ পাটলীপুত্র কানাকুব্জ। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ নিঃশব্দ কালের ব্যবধান। পুরাণের কুলজি অংশ তাও একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। 'রাজতরঙ্গিনী' বইটা নামে ইতিহাস মাত্র। রাজ রাজন্যদের ঘিরে এক-একটা কালে এমনি আলোর রোশনাই উৎসারিত হয়ে উঠেছে আতসবাজীর মত, তারপর মুখ ঢেকেছে গভীর অন্ধকারে। এত বড় একটা প্রাচীন সভ্যতা—তার বিচ্ছেদহীন ধারা নেই কেন? ভূপেন্দ্রনাথ জানালেন—আছে, রাজ-রাজন্যের ঘটনা বা দুর্ঘটনাই একমাত্র ইতিহাস নয়। এক-একটি রাজার পতনের পরেও মানবযূথবদ্ধ সমাজ নামক মহাযন্ত্র বস্তুটা চলেছে আপন নিয়মে—চলেছে তার উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির জীবনধারা আদানে প্রদানে—সংগ্রাম-সন্ধি ও মৈত্রীতে। গ্রাম জনপদে অবিচ্ছিন্ন থেকেছে জন ও গণের জন্ম—জীবন সংগ্রাম ও মৃত্যু। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের শূন্যতা পূরণের জন্য ভূপেন্দ্রনাথের বক্তব্য: ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপকরণের যেখানে অভাব সেখানে সন্ধান করো সাহিত্যের, বা অন্যান্য রচনার। মায় ছড়া, কিম্বদন্তী পর্যন্ত। বললেন—

> 'রাষ্ট্রের যে যুগের যে-সব লক্ষণ আছে তাহার চিহ্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাজেই সাহিত্যকে এই প্রকারের সমাজতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।...সমাজের প্রত্যেক যুগের অবস্থা তৎকালীন সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সমাজের তৎকালীন কর্ণধারদের মনস্তত্ত্বও তাহাতে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের লেখক তাঁহার আবেষ্টনীর বাহিরে গিয়া কিছু লেখেন না। তাঁহার লেখার মধ্যে (তাই) তাঁহার শ্রেণীগত শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ একটি যুগের সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে তৎকালীন ক্ষমতাশালী শ্রেণী বা শাসকবর্গের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে।'

শ্রেণীর এই পরিচয় এবং মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় স্বরূপ যে আমাদের যৌবন দৃষ্টিকে কি ভাবে সেদিন আলোড়িত করেছিল—সে কথা আজ মনে পড়ে। আলোচ্য যুগটা ছিল বৈদিক। এক অলীক ভাবালু কল্পনায় সে যুগ আমাদের মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। স্নিগ্ধ তপোবন, যজ্ঞধূম, অনেক ঘৃতাহুতি, চন্দনচর্চিত যে একটা অপরূপ ছবি আমাদের চোখে আঁকা হয়ে গিয়েছিল—বলা বাহুল্য, তা বহু

পুরুষের গড়ে তোলা। এবং অস্বীকার করে উপায় নেই—হিন্দু নব জাগরণের অবদানও এতে কম ছিল না। সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে মুখে মুখে ওই ঋক্ রচনার প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি জগতের প্রাচীনতম সাহিত্যের ইতিহাসেও বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। তার জন্যে আমাদের গৌরববোধ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কী ছিল তার শ্রেণীচরিত্র? কী তার সমাজতাত্ত্বিক পরিচয়? সনাতন ভারতবর্ষের ঋষি চিত্রিত, মহিমা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে নানা অলৌকিক গালগল্পে সমাকীর্ণ এই যে একটা কালের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে তার প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ ভূপেন্দ্রনাথের ভাষায় শোনা থাক:

> 'বৈদিক যুগের কৌমগুলির (tribes) রাজাদের চারণেরা ছন্দোবদ্ধ ভাষায় যে সকল গীতস্তুতির কবিতা রচনা করিয়া ছিলেন সেগুলিই "বেদ" নামে পরিচিত। বেদের প্রথম অবস্থায় দেখা যায় যে একদল চারণ-গায়ক সর্দার বা রাজার স্তুতি গায়ক ছিল, তাহারাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইত।...সমাজের যে অবস্থায় বেদ বিরচিত হয় তাহা বৈদিক কৌমগুলির যৌবনাবস্থা। তখন "রাজন" যুদ্ধরাষ্ট্র ও শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত সমাজ বিবর্তিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের "দানস্তুতি" ও "দশ রাজ্ঞ্য" যুদ্ধে ব্রাহ্মণ চারণদের দ্বারা ক্ষত্রিয় রাজাদের গুণগ্রাম কীর্তিত দেখা যায়। ..."ব্রহ্মজায়া" ও "ব্রহ্মগাভী" স্তোত্রসমূহে ভীষণ শ্রেণীসংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।...এই যুগে পুরুরবা কর্তৃক ব্রাহ্মণদের ধন অপহরণ (এবং) এক সহস্র ব্রাহ্মণ কর্তৃক নহুষের রথ টানাইবার উল্লেখ দেখা যায়। ক্ষত্রিয়ের সহিত দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণদের বৈশ্য ও শূদ্রকে তাহাদের বিরুদ্ধে উসকাইতে দেখা যায়।...বৈদিক যুগের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীষণ শ্রেণীসংগ্রাম বাধিয়া উঠে। এই প্রকারে বেদে কেবল ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতে না দেখিয়া শ্রেণী মাহাত্ম্যও কীর্তিত হইতে দেখা যায়।'

উদ্‌ঘাটিত এ ছবিতে সে যুগ সম্পর্কে সেদিন আমাদের কোনও অশ্রদ্ধার কারণ ঘটেনি—বরং রহস্যঘন হয়েছে ইতিহাস। মহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পার তীর্থদর্শন আমার ঘটেনি—সেদিনও হয়নি—আজও নয়। মনে পড়ে ভূস্তর-বিদীর্ণ ব্রাত্য ভারতের ছবিগুলোর অলিগলিতে ঘুরেছি সেদিন উত্তেজিত কল্পনায়, ভাঙা খুলির দাগে খুঁজেছি বিজিত এক অপসৃত সভ্যতার

বেদনা ও বিজয়ী আর্যের নৃশংস হুংকার, যাদে—কুম্ভোত্তলায় নরকংকালের স্তূপে শুনেছি তৃষ্ণা ও মৃত্যুর নিষ্ফল আর্তনাদ। সব বিচূর্ণ হয়ে গেছে বিজয়ী এক কৌম গোষ্ঠীর পায়ের তলায়। এমনই হয়।

আমরা জানি, কেবল শ্রেণী যাহাত্মের ওপর ভূপেন্দ্রনাথের এই বিশেষ ঝোঁক ও মন্তব্যে অনেকে বিচলিত হবেন। বলবেন, পূর্বপুরুষদের দার্শনিক অবদানের কথা। সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ কেবল মাত্র তাঁর সন্ন্যাসী অগ্রজের একটা লাইন মাত্র উদ্ধৃত করেছেন—'তুমি তোমার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে অহঙ্কার কর কিন্তু তাহা শ্রেণীগত দর্শনশাস্ত্র।' বস্তুত ভারত-সমাজে বহু নিন্দিত সেই পুরোহিত তন্ত্রের ঐতিহাসিক উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের এই কালে ফিরেই ঠেকতে হয়। যাগযজ্ঞ যজন-যাজন যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তার নিদর্শন বহন করছে জাতকমালার কিছু কথাচিত্র।*

পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ লক্ষ্য করেছেন ভূপেন্দ্রনাথ। বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যদের জনসাধারণের ভাষা প্রাকৃত ও পালিতে রচিত সাহিত্যে এই বিদ্রোহ ধ্বনিত। সংস্কারকগণ ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বিধান ভেঙে শূদ্র ও পতিতদের আহ্বান জানিয়েছেন, জাতিবর্ণহীন একটা সাম্যবোধের সঞ্চার করতে চেয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে। গণ অর্থাৎ শ্রমজীবী শ্রেণী এক কালে সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী হয়ে ওঠে। জাতক অবদান শতক, ধম্মপদ ও অঙ্গাদি গ্রন্থে জনসাধারণের ভাষায় জনসাধারণের জীবনের সংবাদ আমরা রচিত হতে দেখি। জন-জীবন সংবলিত কথা কাহিনীর এই স্রোত অবরুদ্ধ না হলে ভারতীয় সাহিত্য—তথা সমাজেরও একটা নূতন মানবমুখী মোড় নেওয়া হয়তো সম্ভব হতো। বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রকম একটা সম্ভাবনার নিষ্ফলতায় একালের ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'উপন্যাসের পূর্ব সূচনায়' মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু এ বিদ্রোহ, এ সর্বমানবমুখী করুণা, প্রেম ও অহিংসার ভাববন্যা মাত্র কয়েক শতাব্দীর। আবার ফিরে এল সেই পুরোহিততন্ত্র ব্রাহ্মণাধিকার। শেষ মৌর্য সম্রাটকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র আবার ব্রাহ্মণাধিপত্যের সূত্রপাত করল। 'মানবধর্মশাস্ত্র' বা মনুসংহিতার নূতন

---

* দ্রষ্টব্য 'মহাস্বপ্ন জাতক', 'অষ্টশব্দ জাতক'—ঈশান চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।

সংকলন হলো সে যুগের শাসক শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে এবং তার জের চললো একটানা সুদীর্ঘ বার-তেরশ বছর ধরে—বাংলায় তুর্কী আগমনের কাল পর্যন্ত। নিম্নকোটির জীবনের সংবাদ হারিয়ে গেল সাহিত্যের রাজ্য থেকে। এই কালের মধ্যে একে একে উদয় হলেন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের পৃষ্টপোষক শুধু রাজা নয় শাস্ত্রকার নয়, রাজসভাকেন্দ্রিক উচ্চকোটির সাহিত্য রথীরাও: ভাস, কালিদাস, ভবভূতি; পরে রাজশেখর, ভারবী, মাঘ, ভট্টনারায়ণ; আরও পরে বানভট্ট শ্রীহর্ষ, জয়দেব, কৃষ্ণ মিশ্র। এযুগের শেষ লেখক বলে উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণ মিশ্রকে—কারণ তাঁর 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে তুরস্কের নামোল্লেখ দেখা যায় অর্থাৎ তুর্কী অভিযান তখন সম্পূর্ণ। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একজন বৌদ্ধ মহাকবির নাম পাওয়া যায়—যিনি 'বুদ্ধচরিত' প্রণেতা অশ্বঘোষ। ঐতিহাসিকদের মতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে কনিষ্কের রাজসভায় তিনি পারিষদ ছিলেন। অর্থাৎ এই কালের তিনি প্রথম মহাকবি—অগ্রজরূপ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যযুগের এমনি প্রতাপ এবং প্রচার—তাঁর বৌদ্ধ মহাকাব্য ভারতের মাটি থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বহু পরে একটা খণ্ডিত অংশ আবিষ্কৃত হয় মধ্য এশিয়া থেকে—বাকী অংশ চীন থেকে এবং দুই অংশ একত্রিত হয় মাত্র ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। দীর্ঘ এই বারো-তেরশ বছরের মধ্যে আবার গুপ্ত সাম্রাজ্যাধিকার কালকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় এবং শেষাংশে তার লজ্জাকর আদি রসাত্মক অবক্ষয়। তুলনামূলক আলোচনায় এ পার্থক্যটুকু ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি।

এ কথা অনস্বীকার্য, শিল্পকলা সৃষ্টির নৈপুণ্য একটা জাতির গর্বের বস্তু, মর্যাদার বস্তু। তার সৃষ্টির মায়াজাল, তার বাক্য-সঙ্গীত-চিত্র-চরিত্র আমাদের মনকে অভিভূত করে। এবং যিনি যত বড় শিল্পী তাঁর অভিভূত করার ক্ষমতাও তত বেশী। আমরা তেমনি অভিভূত হয়েছি: ভূপেন্দ্রনাথ শোনালেন—শিল্পী তো শুধু সৌন্দর্যস্রষ্টা নন, তাঁর তীক্ষ্ণ চোখে তার শ্রেণীপরিচয়টাও তুচ্ছ বলে গণ্য হয়নি। বরং বড় শিল্পীর ক্ষেত্রে সেটা বহু ক্ষুদ্র অবহেলিত জাতি-ধর্ম-গণ সমন্বিত একটা মহাজাতির জীবনে কম বড় বিপদ হয়ে দেখা দেয় না। আমাদের সমগ্র দৃষ্টি ও মন কেবল একটা মোহাচ্ছন্নতার দিকে একমুখী করে তোলে।

এই যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত সংস্কৃত সাহিত্য, যা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এবং যার বিশিষ্টাংশ সামন্ততান্ত্রিক যুগেই লেখা তার মোটামুটি একটা স্বরূপ নির্ণয়ে ভূপেন্দ্রনাথ লিখছেন—

'বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্য, কুল ও বংশের মহিমা, স্বামীধর্ম, সামন্ত-রাজাদের অস্তিত্ব, বাজারে বাজারে শিক্ষিতা গণিকার প্রাদুর্ভাব, গোলাম শ্রেণীর অস্তিত্ব ··অবগুণ্ঠনের প্রচলন, স্ত্রীলোক আইনের অধিকার হইতে বঞ্চিত (যদিচ বৈদিক যুগের পরে অনেক মনীষী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন— দ্রঃ যাস্কের টীকাকার দুর্গাচার্য), সামাজিক আদবকায়দার বাহুল্য ইত্যাদি। এই সব পুস্তকে সামন্ততান্ত্রিক যুগ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়. সেইজন্য তাহাতে জনের ও গণের সংবাদ পাওয়া যায় না, কেবল রাজা রাণী, সেনাপতি. মন্ত্রী, রাজকন্যা ও তাহার প্রণয়ী।'

সেকালে এ সাহিত্যের সমাজদার ছিলেন কারা? সাধারণভাবে সমাজের উচ্চকোটির মানুষ—যাদের রুচি ও বাসনা অনুযায়ী রচিত এ সাহিত্য। বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' তাদের নাগরক নামে অভিহিত করে তাদের একটা সমাজচিত্র দেওয়া হয়েছে—বোধকরি তার আংশিক উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন :

'নদী বা রম্য দীর্ঘিকার সন্নিহিত উদ্যানবেষ্টিত গৃহে নাগরক বাস করেন। বাসগৃহ নানা বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত। বাদ্যযন্ত্র, গ্রন্থ ও অক্ষক্রীড়ার আয়োজন পার্শ্বে রহিয়াছে। প্রাতে স্নানান্তে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য বিলাসোপকরণে সজ্জিত নাগরক ক্রীড়াকৌতুকে কাল অতিবাহিত করেন। দ্বিপ্রহরে নিদ্রান্তে তিনি পুনরায় বেশভূষা করিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করেন। সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গীতে সুখ ভোগ করেন।···নানা গুণযুক্ত বারাঙ্গনাগণের গৃহে নাগরক আমোদ-প্রমোদ করিতেন।' ইত্যাদি।

এ বিষয়ে প্রসঙ্গ বাড়াবার অবকাশ এবং ইচ্ছে এখানে নেই। কিন্তু এমনি তার মোহ, বাংলায় বুর্জোয়া যুগের যখন আবির্ভাব—তখনও তার শ্রেষ্ঠ কবি এ যুগের জন্য হা-হুতাশ করেছেন—দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ। এ যুগের এ শিক্ষিত বিদগ্ধ শ্রেণী আমাদের সহযোগী ধনবাদী যুগের নাগরক!

ভূপেন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতের উপরোক্ত নাগরক শ্রেণীর হয়তো একটা অংশ সহজ ভোগবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়—তারা বৃহস্পতি ও চার্বাকের লোকায়তবাদের ছিল সমর্থক। কিন্তু বৃহৎ হিন্দুসমাজের বাইরে তারা ছিল না। দেখা যায়—ঐ ব্রাহ্মণ্যধারার দুটো রূপ, কঠিন এবং শিথিল। কঠিনের

জায়গায় সে বিধানদাতা, শাস্তিদাতা। সামান্য জন ও গণ তার ভয়ে কাঁপে। শিথিলের জায়গায় সর্বগ্রাসী তার রূপ, নানা ছলে ভারতের বিচিত্র জন ও গণকে, ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শকে সে নিজের পক্ষপুটে টেনে নিয়েছে। বোধকরি এই তার 'একের মধ্যে বহু।' ভাবাবেগে আজও তাকে ঘোষণা করে থাকি। কিন্তু সেই 'বহু'র সঠিক অবস্থানটা যে সমাজের কোথায়, মাঝে মাঝে তাদের মাথা নাড়ায় আজ স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও সেটা জানতে পেরে আমাদের ঠিক গর্বের কারণ আর থাকে না। নতুন বিশ্বের কাছে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে।

ভারতে এক বৃন্তে বিধৃত এই 'বহু'র বৈচিত্র্য কালে কালে আরও বেড়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন—পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের 'ভারশীব' ও 'ভাকাটাকা' রাজাদের শৈব ধর্মের অনুপ্রবেশ, তন্ত্রাচারের উদ্ভব, শক যবন ও ম্লেচ্ছরাও যেখানে বৃহত্তর ভারত-সমাজে স্থান পেয়েছে।

এই দীর্ঘ বার-তেরশ' বছর—যার শেষ লেখক কৃষ্ণ মিশ্র, বাংলায় তুর্কী অভিযান যখন শেষ হয়েছে—এই সুদীর্ঘকাল ধরে চলেছে যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজ—তার রূপরেখা ও রসের একঘেয়েমীও ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ধর্ম যে কালে সমাজের মূল অবলম্বন এবং বিশেষ একটা কৌমের আদর্শগত আধিপত্য যেখানে রাষ্ট্রশক্তিকে সহায় ক'রে সমাজ শাসন করে, Caste ও Class supremacy—বর্ণ ও শ্রেণীর শ্রেয়তা যেখানে একত্র সমাবিষ্ট—এবং সে শাসনের কাল যদি দীর্ঘায়ত হয়, তখন তাকে সনাতন ও বিধিনির্দিষ্ট ও অলংঘনীয় বলে দাবী করতে তার শাস্ত্রকারদের বাধে না। হিন্দু ভারতেও বাধেনি।

ভূপেন্দ্রনাথ যাদের বলেছেন 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'—দক্ষিণাগত সেই সেন রাজাদের আমল পর্যন্ত তিনি ভারত-সাহিত্যে উল্লেখিত 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাম্রাজ্যবাদীয় রূপ' "Brahmanical Imperialism" লক্ষ্য করেছেন। Imperialism কথাটা ব্যবহার করেছেন তিনি, বোধ করি তার আক্রমণাত্মক চরিত্রের জন্য। যেমন করে বৌদ্ধ মহাকবি অশ্বঘোষের ওপরে নেমে এসেছিল বিস্মৃতির অন্ধকার—ঠিক তেমনি ঘটনা লক্ষ্য করা যায় সেনদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাল রাজাদের কাল সম্পর্কে। তাঁরা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের কুলজী পরিচয়ে তিনি বলছেন—

'বাংলা আবার মাৎস্যন্যায় দ্বারা জর্জরিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ

গোপাল নামক একজন নায়ককে রাজপদে বরণ করেন।...ইনি 'দাস-জাতীয়' অর্থাৎ অতি নীচ শ্রেণীর শূদ্র।'

আপাতত ঐতিহাসিক বিন্যাসে আমাদের প্রয়োজন নেই—আমাদের আলোচ্য সাহিত্যধারা দেখি এখানে শূন্য—কয়েকটা ছড়া এবং গীতি, কিছু শিলালেখ, এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত 'মানস' ছাড়া সমৃদ্ধ এ পালযুগের কোন সাহিত্যিক নিদর্শন নেই। সক্ষোভে বলেছেন ভূপেন্দ্রনাথ—

"এখন 'ধান ভানতে মহীপালের গীত'-এর পরিবর্তে 'শিবের গীত' বলা হয়। চৈতন্য ভাগবতে বলা হইয়াছে—

জোগী পাল, ভোগী পাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।।—

সে কোথায় গেল? স্বর্গত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত এই যে, বাংলায় বৌদ্ধ কৃষ্টির সমস্ত চিহ্নই ব্রাহ্মণেরা বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করিয়াছে।...

'হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধ রাষ্ট্রিক প্রাধান্যের যে সব প্রতিভূ ছিল তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই। ইহা হইতেছে ভীষণ শ্রেণীসংগ্রামের একটি নির্মম দৃষ্টান্ত। দশম শতাব্দীতে এই সংগ্রাম ধর্ম সংগ্রাম রূপে প্রকাশ পায়। বাংলার ছড়া—

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে...
সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া
সাড়া গেল বামুন পাড়া।

সেই সংগ্রামের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।'

বাস্তবিকপক্ষে উপরোক্ত ছড়াটুকুরও ঐতিহাসিক যে তাৎপর্যটুকু আছে তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আগে কেউ মনেও করেন নি।

সমাজ যেখানে আত্মসংগ্রামে মত্ত এবং বিভক্ত সেখানে বাইরের শক্তি সহজে প্রবেশ লাভ করে। ভূপেন্দ্রনাথের মতে—এই অবস্থাই মুসলমান তুর্কীদের দ্বারা বাংলা বিজয় সহজ করে দেয়।

আমাদের বর্তমান প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসগুলোতে বাংলায় তুর্কী আগমন, রাজ্যপত্তন এবং তারপরের দুশ' বছরে সাহিত্য কিছুই রচিত হয়নি এমনি একটা মন্তব্য করা হয়ে থাকে। আমাদের আধুনিক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা হয় কৃত্তিবাসের রামায়ণকে—যার

রচনাকাল ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিচার অন্যরকম। আমরা তাঁর আগের বক্তব্যে দেখেছি—সুদূর বৈদিক যুগের শেষ থেকে ধর্মসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছে এক ধরনের শ্রেণীবিরোধ—সে বিরোধ বরং তীব্র হয়ে উঠেছে ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে। ভারতের অনার্য বা আদিম জাতিগুলি প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন—

> 'মহেঞ্জোদাড়োতে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় হয় যে ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্বেও সাধারণ লোকে অশ্বত্থ গাছ ও নানা প্রকারের জন্তু ও লিঙ্গ পূজা করিত; এই ধর্ম আজও পর্যন্ত অন্তঃসলিলার ন্যায় ভারতে চলিতেছে।'

এরই ওপর বিজয়ী আর্যের বৈদিক ধর্ম চেপে বসে। কিন্তু দেখা যায়, ভারতের প্রাচীন আদিম কৌম গোষ্ঠীগুলির জীবনের গভীরে সামগ্রিকভাবে তা প্রবেশ করতে পারে নি। কোথাও কোথাও তারা হয়তো স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু যথার্থ সম্মান পায়নি। এরাই সেই একের মধ্যে 'বহু', এদের আরাধ্য দেবতারা কখনো দু চার ছত্র সংস্কৃতের মন্ত্র উপহার পেয়েছে বটে কিন্তু একান্তই তা ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর যাজনিক সুবিধাবাদের খাতিরেই। কখনো সেই 'বহু' বীতশ্রদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাচার্যদের প্রেম ও সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে গিয়েছে মঠে বিহারে—এরাই ভারতের সেই বিশালবপু জন ও গণ। সমাজের ওপর তলার সাহিত্য সংস্কৃতির দরবারে এদের অস্তিত্ব নেই কিন্তু তারই তলার অন্ধকারে একান্ত অবহেলায় অনাদরে এদেরও একটা আপন সংস্কৃতি ধারা কিছু কিছু রূপ-রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আজও প্রবহমান। সে চলেছে তার বিশ্বাস আর প্রবল জৈবিক নিয়মে। এটাই ভারতের বৃহত্তম অংশের লোকজীবন ধারা—যার সম্পূর্ণ পরিচয় আজও আমরা উদ্ধার করতে পারি নি।

তুর্কী অভিযানের পরবর্তী যে দুশো বছর বর্তমান সাহিত্যের ইতিহাসকাররা নিষ্ফলা বলে চিহ্নিত করেন—ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তার চিত্র অন্য রকম। তিনি বলছেন—

> "এই যুগে বাংলা সাহিত্যের যাহা কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সূর্যের পাঁচালী, শূন্যপুরাণ ইত্যাদি—তাহাতে আমরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গণশ্রেণীর সংবাদ পাই। এই সময়েই ধর্মপূজা সংক্রান্ত ধর্মমঙ্গলই

বাংলার Epic (মহাকাব্য) বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।...এই মহাকাব্যে দেখি ভোম সেনাপতি, মেটে (বাগদী জাতির একটি শাখা) জাতীয় ইন্দ্র—গৌড়ের শহরকোটাল,...আর ঢেকুরের সামন্ত ইছাই ঘোষ সম্ভবতঃ গোয়ালা...আজ যাঁহারা অধঃপতিত সেই সময়ে তাঁহারাই উচ্চবর্ণের এবং শাসকশ্রেণীর লোক ছিলেন। এই যে, বাংলার সামাজিক পট সেনযুগ হইতে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে—সেই নির্মমতার কোন স্মৃতিই বাংলা সাহিত্যে নাই।'

স্মৃতি নাই, সন তারিখ অংকিত পুথি নাই কিন্তু সমাজ কথা আছে। সে ধারার লোকশিল্পের মত লোক সাহিত্যের সৃষ্টি-কথা আছে। প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে জন ও গণ-এর জীবন সম্পর্কে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সূর্যের পাঁচালী, শূন্যপুরাণ, ধর্মমঙ্গল ছাড়াও গোরক্ষবিজয়, ময়নামতী বা গোপীচাঁদের গান, মনসা মঙ্গল ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যধারার বিপরীত কোটিতে ব্রাত্য বাঙালীর পরিচয় বহন করছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এবং পুথি রচনার প্রাপ্ত তারিখ অনুসারে আমাদের প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসগুলোতে তাদের এখন অর্বাচীন কালে ফেলা হয়। সেটা পুথির ইতিহাস—কিন্তু যে সাহিত্য সমাজ-মানসের চিহ্ন বহন করে চলেছে, তার ইতিহাস নয়। তার চিত্র যতটা ছিন্ন, অসম্পূর্ণ এবং অপরিজ্ঞাত ছিল—সেটা সম্পূর্ণ হয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর এবং লক্ষ্যনীয় যে, বাংলার ত্রিসীমানায় তাকে পাওয়া যায় নি। নেপালের রাজ গ্রন্থাগারে মূল গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ পাওয়া যায় তিব্বতী ভাষায়। এই কালের সাহিত্য সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথের ধর্মসংগ্রাম তথা শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ে মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, একালের ঔপন্যাসিক ইতিহাসকারদের দ্বারা অনার্য বলে চিহ্নিত ও অবহেলিত রচনাগুলির পুথির তারিখ যে কালেরই হোক, ওর বিষয় ও বেদনা সেই অন্ধকার কালের। রাজা-সুলতান-জমিদার পৃষ্ঠপোষিত যে ব্রাহ্মণ্য-ধারার সাহিত্য উচ্চকোটির জন্য রচিত হচ্ছিল তারই সমান্তরাল বাংলার অবজ্ঞাত অব্রাহ্মণ্য লোকজীবন প্রবাহের সঙ্গে ওগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ছড়া ও পাঁচালি আকারে ওগুলি তাদের নিজস্ব সম্পদ হিসাবে প্রচলিত ছিল। লোকশিল্পের ধারা যেমন উচ্চকোটির শিল্প রীতির ধার ধারে না তেমনি ওগুলিও বিচার্য।

বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যেরও নানা গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ তাঁর রচনায় ধরা দিয়েছে যেসব কথা আমাদের প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাস-গুলিতে অনুপস্থিত। বাংলায় মানসিংহের দ্বারা মোগল-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের বিষয়। বাংলায় সামন্ত সমাজের যেটুকু স্বাধীন মানসিকতা ছিল এই প্রাধান্যে বিধ্বস্ত হল। দিল্লী মসনদের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বাংলার জমিদার শ্রেণী পাশবদ্ধ হল—রূপান্তরিত হল খাজনা আদায়ের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী রূপে। এ ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের একটা সমাজগত মানসিক প্রতিক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করেছেন সাহিত্যে। বৈষ্ণব পদাবলীসমূহ বাঙালী কবির যে সকরুণ কণ্ঠস্বর তিনি শুনেছেন—বিশেষ করে মাথুরের পদসমূহে—তাকে পরাধীনতার বেদনার রূপান্তর বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে দুই কবি—মাধব আচার্য ও মুকুন্দরামের কিছু তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন যেটা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি মাধব আচার্যের নায়ক ব্যাধ কালকেতুর মধ্যে তিনি দেখেছেন মোগল পাশে আবদ্ধ সদ্য এক পরাধীন বাংলার ক্রোধ, ক্ষোভ ও অন্তর্বেদনা। কিন্তু বহু শিল্পগুণ থাকা সত্ত্বেও মুকুন্দরামের উচ্চকোটিপৃষ্ঠপোষিত চণ্ডীতে সে ব্যাধ কালকেতু ভীরু, দৈবাহত—একান্ত দৈবনির্ভর। এবং নিজের হীন 'জাত' সম্পর্কে সে একান্ত সচেতন। ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে—এ সেই উচ্চ-কোটির চিত্র রচনা। মানসিংহ বাংলায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের উত্থান ঘটিয়ে, নূতন নূতন জমি-জায়গীরের পত্তন করে ভেদপন্থায় বাংলার স্বাধীনতা করায়ত্ত করেন—তাতে স্বভাবতই প্রাচীন উচ্চকোটির সমাজে একটা বিপর্যয় ঘটে। ভূপেন্দ্র-নাথ উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন—

> মানসিংহের প্রশস্তি গাইছেন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম :
> 'ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ
> গৌড়বঙ্গ উৎকল অধীশ।'
> অন্য দিকে মাধব আচার্যের বন্দী প্রতাপ বলে—
> 'কহ গিয়া অরে চর, মানসিংহ রায়ে।
> বেড়ী দেউ আপনার মনিবের পায়ে॥
> লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
> যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥'

দুই কবির পার্থক্যের এমন আরও উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন। কিন্তু বোধ

করি সে বৃথা—মাধব আচার্যের চণ্ডী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রচলিত পাঠ্য তালিকায় নেই। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনায় স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মাধবাচার্যের যেটুকুও কবিকৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন—তা এখন বোধ-করি সেই 'রূপ-রস রীতি'-সর্বস্ব সমালোচনার মানদণ্ডে কমতে কমতে একেবারে আধুনিক ইতিহাসকারদের বইতে প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে!! ভূপেন্দ্রনাথ বলছেন—'বাংলার সেই ক্রান্তিকাল অশনিপাতের যুগেই মাধবের বীর পরাজিত বাঙালীর প্রতীক হইয়াছিলেন।'

তাঁর বিচার বিশ্লেষণ থেকে মধ্যযুগীয় কাব্যধারার শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্রও বাদ পড়েন নি। তিনি এ কাব্যে স্বভাবতই একটা মুসলমানী দরবারী ছাপ লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করেছেন একটা জাতির পরাজিতের মনোভাবও। বলা বাহুল্য, উচ্চকোটি বা জমিদারের সভার কাব্য হিসাবে এরও বক্তব্য ছক বাঁধা এবং প্রাচীন সেই সংস্কৃত আলঙ্কারিক ধারা এখানেও অব্যাহত। প্রতাপাদিত্য ও মোগলের যুদ্ধবর্ণনায় 'রবিচন্দ্রবাণে'র ব্যবহার, 'শূলশেল' লোফা ইত্যাদি তাঁর চোখে হাস্যকর লেগেছে। সংক্ষেপে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

> 'আর একজন সাহিত্যিক সংস্কৃতে প্রতাপাদিত্যের জীবনী রচনাকালে চন্দ্রবাণ, বায়ুবাণ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালের মাণিক গাঙ্গুলি তাঁহার ধর্মমঙ্গলে···সংস্কৃত মহাভারতের ঢং ঢুকাইয়াছেন। এতদ্বারা যেমন চিন্তাশক্তির অনুর্বরতার পরিচয়, অন্যদিকে সনাতন ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টাও এই সব ব্রাহ্মণ লেখকদের মধ্যে ছিল···। তাঁহাদের এই প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই অসওয়াল্ড স্পেংলারের উক্তি—গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীনেরা space and time (স্থান ও কাল) অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে আসে।'

এই কাল ব্যতিক্রম দোষ—১২শ শতাব্দীর সাহিত্যে, এমনকি ২০শ শতাব্দীতেও তিনি লক্ষ্য করেছেন। ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলায় আবার একটা বিপর্যয় ঘটল—নূতন একটা অর্থনীতির বিন্যাস সৃষ্টির উদ্যোগ হল, শোষণের ধারা হলো নূতন কিন্তু সামন্ততন্ত্রের ভিৎ একেবারে নষ্ট হলো না। নূতন বুর্জোয়া সভ্যতার যা কিছু সোরগোল উঠলো শহরে-সুদূর গ্রামসীমায় রয়ে গেল সেই প্রাচীন ধারা অব্যাহত। ফলে যে মিশ্র সমাজ-বাস্তবের প্রতি-ফলন ঘটল সাহিত্যে তাকে সম্পূর্ণ বুর্জোয়া সাহিত্য বলতে ভূপেন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন—

'বাংলার সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়াত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, সেইজন্য আমরা একটা খাঁটি বুর্জোয়া সাহিত্য এখনও উদ্ভূত হইতে দেখি না।...মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহিনী নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা এখনও প্রাচীনের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।'

আমরা যাকে বর্তমানে 'আধুনিক সাহিত্য' বলি—অর্থাৎ মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ—এবং তারও পরে বিদ্রোহী যুবশক্তির রচনাধারা তাঁর দৃষ্টিপথ এড়ায় নি। তার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তিনি উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং ২০শ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ—এই এক শতাব্দী কালের রচনা ও লেখকের সংখ্যাও কম নয়। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি যখন গ্রন্থাকারে সংকলিত হচ্ছিল তখন কালটা প্রায় আমাদের স্বাধীনতা লাভের পূর্বাহ্ন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে জানি—সে সময় পর্যন্ত সাহিত্যের সমসাময়িক গতিবিধি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই একটা শতাব্দীর সাহিত্যও রচিত হয়েছে বিচিত্র ধারায়। নবাগত বুর্জোয়া ভাবধারা আমাদের জাতীয় জীবনে যত আংশিকভাবেই গৃহীত হয়ে থাক—ওই নূতন ভাব ও ভাবনা আমাদের সাহিত্যকে নানা পথে উৎসারিত করে দিয়েছে। কখনো অবতার-বাদবর্জিত মানবীয় আবেগ সম্বলিত কাব্যে, কখনো ঐতিহাসিক রোমান্সে, কখনো স্বাদেশিকতায়—হিন্দু ভাবালুতায়, কখনো নূতন মধ্যবিত্ত সমাজের পটভূমিতে। তাঁর আলোচনার মধ্যে, সংক্ষিপ্ত হলেও, আলোচিত হয়েছেন মধুসূদন, হেম-নবীন-বঙ্কিম-দীনবন্ধু-গিরীশচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও। সমাজপ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানটুকুও যেমন তিনি স্বীকার করেছেন, তেমনি যেখানে তাঁদের পিছুটান, তাঁর সমালোচনা করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হননি। বলা বাহুল্য, সে বিশাল রচনা সম্ভারের 'সমালোচনা' উল্লেখও এখানে সম্ভব নয়। তিনি নিজেও তা সম্পূর্ণ করে যান নি। তাঁর সে পথে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব নূতন কালের।

অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রাঙ্গণে একটা নতুন আবির্ভাবকেও তিনি স্বাগত জানিয়ে গেছেন—সে হলো আধুনিক বাংলার গণসাহিত্য। আমরা তাঁর সমালোচনা সম্পর্কে এইটুকু জেনেছি অন্ততঃ যে—বাংলা তথা ভারতের জন ও গণ জীবন সম্পর্কে তাঁর অপরিমেয় আগ্রহ। তাদের নষ্ট, অসম্পূর্ণ চিত্র

সংগ্রহের জন্য কী তাঁর আকুল প্রত্যাশা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে গেছেন—'মনে রাখিও—গণের জীবন লইয়া লিখিলেই গণসাহিত্য হয় না, থাকা চাই গণের চরিত্র ও মানসিকতা',—তার বাঁচার সংগ্রাম।

পরিশেষে বলি, তাঁর বৃহৎ সমালোচনা ক্ষেত্রের আমি সামান্য মাত্র স্পর্শ করতে পেরেছি—সমগ্র স্পর্শ করি সে যোগ্যতাও আমার নেই। ইচ্ছে ছিল—হিন্দী ও উর্দু সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁর সমালোচনা অংশের সারাংশটুক অন্তত দেওয়ার—কিন্তু তাও সম্ভব হলো না। ক্ষোভ রইল। শুধু সান্ত্বনা রইল এইটুকু—আমাদের কালের সেই মহৎ শিক্ষাগুরু, যাঁকে আমরা জীবন্ত বিশ্বকোষ বলে অভিহিত করতাম, যিনি নানা হাসি-পরিহাসে আমাদের সাহিত্যপথযাত্রার প্রাক্কালে ক্ষুদ্র সংস্কার ও ভুলভ্রান্তিকে অগ্রজ বন্ধু, তাত্ত্বিক ও পথপ্রদর্শকের মত দেখিয়ে দিতেন তাঁর সংস্পর্শে এসে পেয়েছিলাম আমরা অনেক। সে ঋণ শোধ করি, সাধ্য কী! এ আমার সামান্য ঋণ স্বীকার মাত্র।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৪ এর কোনো সময়। ডাঃ ভূপেন দত্তের ৬৪তম বর্ষ বয়স উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটের সোভিয়েত-সুহৃদ্‌ সমিতির কার্যালয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হচ্ছে। খুব বড় সভা নয়। কিন্তু সভার বৈশিষ্ট্য ছিল। ডাঃ দত্তের জীবনের তিন স্তরের বন্ধু, সহকর্মী ও গুণগ্রাহীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রথম স্তরের, অর্থাৎ যুগান্তর দলের সহকর্মীদের কেউ কেউ, কংগ্রেস-কর্মীদের কয়েকজন, আর ছিলেন ডাঃ দত্তের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসরণ করে যাঁরা প্রথম কমিউনিস্ট হয়েছেন তাঁদের অনেকে। এ ছাড়াও আছেন বিনয় সরকারের মত প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, যিনি ডাঃ দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই সভায় কমিউনিস্ট পার্টির ভবানী সেন ডাঃ দত্তের উদ্দেশে যা বলেছিলেন তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছিলেন ডাঃ দত্ত হচ্ছেন আমাদের দেশের তিনটি রাজনৈতিক ধারার সঙ্গম-স্থল, পুরাণো দিনের বিপ্লবী ধারা, পরবর্তী অবস্থার সাধারণ কংগ্রেসী ধারা ও তারপরের সমাজতান্ত্রিক ধারা, যা আজকে কমিউনিস্ট কর্মীরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি ডাঃ দত্তকে ভারতের রাজনৈতিক ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই কথা যে কত তাৎপর্যপূর্ণ তা সকলেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু ভবানী সেনের কথার চেয়ে আরো বেশী করে আমার মনে আছে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ডাঃ দত্ত যা বলেছিলেন সেই কথাটি। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ডাঃ দত্ত আবেগপূর্ণ স্বরে বলেন, 'আমার মতো একটা unsuccessful life কে নিয়ে এইভাবে হৈ চৈ করা কেন তা বুঝতে পারছি না।' ডাঃ দত্তের এই কথাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। কেননা, আমি বুঝলাম কি ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে ডাঃ দত্ত তাঁর এই মনের কথাটা সেদিন স্পষ্ট ক'রে সকলের সামনে বলে ফেললেন। আমরা, যারা ডাঃ দত্তের এদেশে ফিরে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সংস্পর্শে আসি এবং তখন থেকে প্রায় দুই দশক

ঘরে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশি, তারাই জানি কেন ডাঃ দত্তের মনে এই অভিমান। ডাঃ দত্ত এদেশে এসে (অন্তত বাংলার) যুবসমাজকে যে নতুন দৃষ্টি ও চেতনা দিয়েছেন, যা প্রায় একটা 'জেনারেশন'কেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেছে, তার তুলনা নেই। অথচ তাঁর এই অবদানের তুলনায় তিনি জনসমাজে স্বীকৃতিলাভ করেছেন কতটুকু ? নব-ভাবধারার সমস্ত আন্দোলন ও সংগঠনের শুধু অংশীদারই তো তিনি ছিলেন না, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু ছিলেন। সকলে তাঁকে অত্যন্ত নিকটে পেয়েছে সব কাজে। কিন্তু একজন রাজনৈতিক জননেতার প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি বলতে যা বোঝায়, তা তাঁর ঠিক ছিল না। তাঁর অজস্র গুণগ্রাহী ও যাকে 'শিষ্য' বলা যায় তা থাকা সত্ত্বেও একজন জননেতার দাঁড়াবার যে একটা জমি থাকে, যা তাঁকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখে, সেরকম কোনো জমি ডাঃ দত্তের ছিল না। তাই তাঁর নেতৃত্বের বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়ার মত কোনো সংগঠিত জনসমষ্টিও ছিল না। এইজন্য তিনি সর্বক্ষেত্রে সাধারণ সম্মান পেয়েও বিশেষ নজর পান নি। কিছুটা উপেক্ষা ও অবহেলা যেন সর্বদাই তাঁকে পেতে হয়েছে। আমরাও তো তাই করেছি। তাঁর কাছ থেকে অনেক পেয়েছি, কিন্তু তাঁকে দিয়েছি কতটুকু ? এর জন্যই তাঁর অভিমান। হয়ত সেদিন সেই সভার পরিবেশটাই এমন ছিল যা তাঁকে অভিভূত করেছিল এবং তাই মনের সংগোপনে যে অভিমান তাঁর ছিল তা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু আর কোনোদিন ওরকম কথা তাঁর মুখে শুনিনি। তিনি যা করতেন খোলা মনে করতেন।

ডাঃ দত্তের ক্ষেত্রে এই যে স্বীকৃতির অভাব, তার জন্য আমরা দায়ী তো বটেই, কিন্তু ডাঃ দত্ত নিজেও এর জন্য কম দায়ী নন। তিনি চিন্তা জুগিয়ে দিয়েছেন সকলকে, এ-যুগের কর্মী হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন সকলকে। কিন্তু কোনোদিন সংগঠক ছিলেন না। এটাই ছিল তাঁর দুর্বলতা। দল তৈরী বলতে যা বোঝায় (আমি ঠিক রাজনৈতিক দলের কথাই বলছি তা নয়, অনুগামী গোষ্ঠী হিসাবেই বলছি) তা তিনি কোনদিন করতে পারতেন না। অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে তিনি মিশতেন যুবকদের সঙ্গে, সে মেশার মধ্যে ছিল একটা সমতার ভাব। আমাদের চিন্তার দোষত্রুটি সংশোধন করে দিতেন, নতুন চিন্তার খেই ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু সংগঠন গড়ে তোলার বা নির্দিষ্ট আন্দোলনের পরিকল্পনা ঠিক দিতে পারতেন না।

তাই নেতৃত্ব বলতে যা বোঝায় সেটা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত না এবং তাঁকে নেতার আসনে বসাবার কথাও কারুর মনে হত না।

ডাঃ দত্তের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় তাঁর ইউরোপ থেকে ফিরে আসার দু-এক বছরের মধ্যেই। ১৯২৬-এই চন্দননগরে এক সভায় বক্তৃতা করতে আসেন তিনি এবং তখনই তাঁর নতুন চিন্তাধারার পরিচয় পাই। তবে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় তখনও হয় নি। পরিচয় হয় ১৯২৮-এ কলকাতায় নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সম্মেলন উপলক্ষে। সেখানেও তাঁর সঙ্গে যে খুব বেশী পরিচয় হয় তা নয়। কিন্তু সেটুকু পরিচয়ের ভিত্তিতেই তিনি যেভাবে আমাকে মনে রেখেছেন তা দেখে পরে অবাক হয়ে যাই। তাতেই বুঝলাম ছাত্র-যুবকদের সম্বন্ধে ডাঃ দত্তের কি গভীর আগ্রহ। আমি তখন চন্দননগরে থাকি। হঠাৎ একদিন শুনি ডাঃ দত্ত এখানে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আমাকে খোঁজ করছেন। আমার ঠিকানা তিনি জানতেন না, তবু চন্দননগরের অনেক জায়গা খুঁজে আমাকে ঠিক বার করলেন। সেদিন থেকে ডাঃ দত্তের সঙ্গে আমার এমন ঘনিষ্ঠতা হল যে পরস্পরের সংস্পর্শে আসার সামান্য সুযোগটাও আমরা ছাড়তাম না। ডাঃ দত্তের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়েই আমি সমাজতন্ত্রের ভাবধারা অনুশীলন করতে শিখেছি, ছাত্র-যুব আন্দোলনের কাজেও এগিয়ে গিয়েছি। তখন অগ্রণী যুবকদের এক বড় অংশের মধ্যে বিপ্লবী দলের নেতাদের প্রভাব। যুবকর্মী যার সঙ্গেই ডাঃ দত্তের কথাবার্তা হত, তিনি স্পষ্টভাষায় বিপ্লবীদলের 'দাদা'দের অন্ধ অনুসরণ না করার জন্য পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন সমাজ-পরিবর্তনের তত্ত্বটা বুঝতে। তাঁর সব কথা সব সময় সকলের পছন্দ হত না, কিন্তু তবু এমন অন্তরঙ্গভাবে তিনি সমাজ-তত্ত্ব, রাজনীতি-তত্ত্ব আলোচনা করতেন যে তাঁর কথার মূল্য বুঝতে চেষ্টা না করে উপায় ছিল না কারুর। চিন্তার মধ্যে বিভ্রান্তি বা সমস্যা দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকেই চিন্তাটা পরিষ্কার করে নেবার পথ খুঁজেছি সর্বদাই।

ডাঃ দত্তের বাড়ীটা ছিল অদ্ভুত ধরনের। বিবেকানন্দের পৈত্রিক বাড়ী, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী লেন—এটা বিখ্যাত জায়গা। বিবেকানন্দের মেজভাই মহেন্দ্র দত্ত ও ছোট ভাই ভূপেন দত্ত। দুজনেই নিজ নিজ জীবন-ধারা অনুসরণ করে চলেছেন। মহেন্দ্র দত্ত বিবেকানন্দের পথের পথিক, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে মশগুল। আর ডাঃ দত্ত এ-যুগের চিন্তাধারা,

সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার অনুসারী ও কঠোর বাস্তববাদী। ত'াদের বাড়ীর বাইরের দিকে দুপাশে দুটো বৈঠকখানা, একটায় বসে মহেন্দ্র দত্ত ত'ার অনুগামী ভক্তদের সঙ্গে ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করছেন, আর অন্যটায় ডাঃ দত্ত ঠিক বিপরীত বিষয় নিয়ে ত'ার অনুগামীদের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। দুপুরের দিকে ত'ার বাড়ী গিয়ে প্রায়ই দেখেছি যে মহেন্দ্র দত্ত ত'ার ঘরে রয়েছেন ত'ার ভক্তদের সঙ্গে, ডাঃ দত্তের ঘরটা তালাবন্ধ। ভয়ে ভয়ে আমি মহেন্দ্র দত্তকেই জিজ্ঞাসা করি ডাঃ দত্ত আছেন কিনা। তিনি একটু বিরক্তিসহকারে বলে উঠলেন, "এই সব ভূপেনের চেলারা এসেছে।" কিন্তু বাড়ীর ভেতর থেকে ঠিক ডেকে দিতেন ডাঃ দত্তকে। ডাঃ দত্ত এসে চাবি খুলে আমাকে ত'ার ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেজদা কি বলল? গালাগাল দিল বোধ হয়! যত সব বুজরুগের দল!" দেখলাম ডাঃ দত্ত বড় মুখফোঁড়, মেজদাকেও খাতির করেন না। কিন্তু একটু পরেই কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "যাই বল বাপু, ওরা এখন মনপ্রাণ দিয়ে নিজেদের ব্রত সাধন করে চলেছে, দেখে ভাল লাগে। বড়দার পথ না নিয়েও তাঁকে আমি অগাধ শ্রদ্ধা করি, একটা মানুষ ছিল বটে!" আমাদের বলতেন, কর্মীদের নিষ্ঠা থাকা দরকার, উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে হবে, তা না হলে কিছু হবে না। এই নিষ্ঠা ও উৎসর্গীকৃত জীবন বিবেকানন্দ শিখিয়ে গেছেন। এ কথা বলতে বলতে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ত'ার শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

ডাঃ দত্তকে যখনই যে-ব্যাপারেই চেয়েছি তাতেই পেয়েছি। কতবার যে তিনি চন্দননগরে এসেছেন তার হিসেব নেই। শুধু সভা-সমিতি উপলক্ষেই নয়, মেলামেশার জন্যও তিনি আমাদের সঙ্গে কাটাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গোন্দলপাড়া ইউনিয়ন অফিসে বসে শ্রমিকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা কইছেন, কখনও কোনো শ্রমিক-কর্মীর বাড়ীতে গিয়ে তার পরিজনদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করছেন। তার ফাঁকে ফাঁকে ত'ার বিশেষ জ্ঞান নৃতত্ত্বের গবেষণার কাজও চলছে। একটু বিশেষ ধরণের চেহারা দেখলেই তার মাথা মেপে নির্দ্ধারণ করছেন কোন নর-গোষ্ঠী থেকে এর পূর্বপুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এমনি ছিল ত'ার ধারা। শুধু চন্দননগরেই কেন, আমাদের ডাকে হুগলী জেলার কত জায়গায় যে এসেছেন সভা-সম্মেলন উপলক্ষে তা সব মনে রাখাও যায় না। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চুচুড়া, তারকেশ্বর, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি জায়গায় ত'াকে অনেকবার নিয়ে

যাওয়া হয়েছে। দূর অঞ্চলের গ্রামে যেখানে খুব কষ্ট করে যেতে হয়, সেখানেও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কৃষক-সম্মেলনে। অন্য জননেতাদের মতো মিটিং সেরেই কলকাতা ফিরে যাওয়ার স্বভাব তাঁর ছিল না। যেখানেই গেছেন, সেখানেই একদিন তো থেকেছেনই, কখনও একাধিক দিনও থেকেছেন। আর সেই অবকাশে কত কর্মীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনা, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় ও সেই সূত্র ধরে অনেকের বংশ পরিচয়, জায়গাটির পুরানো সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিবৃত্ত—সব জেনে নিয়ে তবে তিনি সন্তুষ্ট। তাঁকে এত সহজভাবে পাওয়া যেত বলেই বোধহয় তাঁর ক্ষেত্রে জননেতা সুলভ উচ্চ আসন দানের কথা কেউ ভাবতেন না। এত কাছের মানুষ যিনি হয়ে পড়েন তাঁর বরাতে বোধহয় এরকমটা হয়ই। হুগলী জেলায় ডাঃ দত্তকে আমরা যেভাবে পেয়েছি, বাংলার অনেক জেলাতেই তাঁকে সেইরকমভাবেই পাওয়া যেত, এটা অনেক বন্ধুর মুখে শুনেছি।

এদেশে, বিশেষতঃ বাংলায় ১৯২৭-২৮ থেকে গোটা ৩০-এর দশক জুড়ে যে সমাজতন্ত্রমুখী ভাবধারা ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করেছে এবং যার ফলশ্রুতি হিসাবে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে অনেক নতুন আন্দোলন ও সংগঠন, যেমন ছাত্র-আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সমাজতন্ত্রী দল, প্রগতি-লেখক আন্দোলন প্রভৃতি, তার সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে ডাঃ দত্তের অবদান। ট্রেড ইউনিয়ন আগে থেকেই ছিল বলে তার কথাটা বললাম না। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে ডাঃ দত্তের অবদানটা একটা নির্দিষ্ট মতবাদে দীক্ষিত এক সংগঠিত গোষ্ঠী তৈরী কায়দায় ঠিক নয়। তাঁর কাজটা ছিল গতানুগতিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব থেকে দেশের যুবসমাজকে বার করে এনে অগ্রগামী ধারা সমাজতান্ত্রিক ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। একদিকে কংগ্রেসী ধারা ও অন্য দিকে যাকে বলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের চিন্তাধারা—এই দুটোর দ্বারাই তখন যুবসমাজ প্রভাবিত। জাতীয় ধারা হিসাবে কংগ্রেসের যথোচিত মূল্য ডাঃ দত্ত দিতেন ঠিকই এবং বিপ্লবীদেরও তিনি যথাযোগ্য মূল্য দিতেন। কিন্তু যুবকদের তিনি শেখাতেন যে শুধু কংগ্রেসী-আদর্শের দ্বারা শেষপর্যন্ত কিছু হবে না এবং বিপ্লববাদী নেতাদের পুরানো চিন্তা নিয়ে চললেও কিছু হবে না। এসব কথা বলতে গিয়ে ডাঃ দত্তের মুখ দিয়ে অনেক কড়া কথাই বেরিয়ে আসত। নিজে কংগ্রেস-সভ্য হয়েও আলোচনার সূত্রে

কংগ্রেস-কর্মীদের কাছেই তিনি স্পষ্ট বলে বসতেন যে, 'গান্ধী মাইকী জয়' করে গেলেই শুধু হবে না, অন্যদের বলতেন, 'শুধু দাদাদের পিছু পিছু ঘুরলেই হবে না, এ যুগের চিন্তাধারা বুঝতে হবে, সমাজ-পরিবর্তনের দিকটা ধরতে হবে, তবেই দেশের স্বাধীনতার লড়াই ঠিক পথে এগোবে।' ১৯২৮-এ নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির উদ্ভবের কাজে উৎসাহ তিনি দিয়েছিলেন, এর ডাকে তিনি সর্বদাই আসতেন। কিন্তু তবু এই ছাত্র-সমিতির কর্মধারা দেখে কিছুদিন পরেই ছাত্র-নেতাদের কঠোর সমালোচনা করতেন এই বলে যে 'তোমাদের ছাত্র-সমিতি তো কংগ্রেসের B-team ছাড়া আর কিছুই নয়।' কেননা কংগ্রেসের বক্তব্যের বাইরে ছাত্র-সমিতির নিজস্ব বক্তব্য কই, নিজস্ব স্বতন্ত্র কর্মসূচী কই যা না হলে এ যুগের প্রকৃত ছাত্র-আন্দোলন দাঁড়াবে না। ডাঃ দত্তের এইসব কথার তাৎপর্য প্রথমে ঠিক ধরতে পারতাম না, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝলাম। পরবর্তী ছাত্র-আন্দোলনের ধারা দেখেই ডাঃ দত্তের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ডাঃ দত্তের প্রচণ্ড উৎসাহ দেখেছিলাম ১৯৩১-এ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট কনফারেন্সে। সম্ভবতঃ ডাঃ দত্তের উৎসাহ এইজন্যই যে, এইরকম তিনি চাইছিলেন, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ভিত্তিতে সকল কর্মীর একত্রিত হওয়া। এই সম্মেলনে সমবেত হয়েছিল বাংলার, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার জেলাগুলির যুবকর্মীরা। এই সম্মেলনের পিছনে ডাঃ দত্তের কতটা ভূমিকা ছিল জানি না। তবে যত কর্মী এখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই ডাঃ দত্তের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর চিন্তার প্রভাব তাঁদের মনের ওপর পড়েছিল—এটা জানি। কোনো সংগঠিত রূপ এই সম্মেলনের ছিল না, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে এরকম সব কর্মী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এসে মিলেছেন এক জায়গায়। এর মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস-কর্মীদের কেউ কেউ, ছাত্র-সমিতির কর্মী, বিপ্লবী-দলের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, শুধু ট্রেড ইউনিয়ন করেন এরকম কর্মী, তখনকার লেবার পার্টির দু-একজন, কলকাতার তখনকার একটি নূতন গোষ্ঠী 'সাম্যরাজ পার্টি' নামে, তার কর্মীরা এবং কোনো সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এরকমও যুবক। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিন, নীহারেন্দু মজুমদার, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি। ডাঃ দত্তই ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন বর্ধমানের সরোজ মুখার্জী,

সচ্চিদানন্দ অধিকারী প্রভৃতি। সেই থেকে বর্ধমানের কর্মীদের সঙ্গে ডাঃ দত্তের সম্পর্ক গভীরতর হয়।

৩০-এর দশকের মধ্যভাগে দেশে সমাজতন্ত্রমুখী চিন্তার জোয়ার নতুনভাবে দেখা দেয় এবং অনেকগুলি সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রথমেই নাম করতে হয় কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট পার্টির কথা। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর থেকে গড়ে ওঠে বিভিন্ন গণ-সংগঠন—কৃষক-সভা, প্রগতি-লেখক সংঘ প্রভৃতি। ট্রেড ইউনিয়ন তো আগে থেকেই ছিল। ছাত্রসংগঠনের কথাও বলতে হয়, কেননা এই সময়ই ছাত্র-ফেডারেশন গড়ে ওঠে, যার চিন্তাধারাও আগের ছাত্র-সমিতির থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ যুগোপযোগী ধারার অনুসারী। এই সময় থেকে এক দশক ধরে ডাঃ দত্তেরও যেন সবচেয়ে কর্মব্যস্ত জীবন দেখা যায়। তাঁর চিন্তাধারাই যেন রূপ পাচ্ছে দেশে, তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীরা যেন ঠিক রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণ মতৈক্যের ভিত্তিতে সকলের অবস্থান না হলেও, সমাজতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করতে সকলে যে চেষ্টা করছে এটাই দেশের পক্ষে যথেষ্ট অগ্রগতি। সব সংগঠনের সভা-সম্মেলনেই ডাঃ দত্তের সোৎসাহ উপস্থিতি দেখা যেত এই সময়। কলকাতায় যে কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট সম্মেলন হয় তাতে ডাঃ দত্তের উপস্থিতি দেখেছি, কর্মীদের সঙ্গে তিনি উৎসাহভরে আলোচনা করছেন। কৃষকসভার সঙ্গে তো তাঁর সাংগঠনিক যোগই ছিল। কৃষক-সভার অনেক সভা-সম্মেলনেই তিনি যোগ দিতেন। প্রগতি লেখক-সংঘের সভা-সম্মেলনেরও অধিকাংশটাতেই তিনি থাকতেন। শুধু তাই নয়। সাধারণ সাহিত্য-সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেলেও তিনি যেতেন এবং সেখানে গিয়ে প্রগতি-লেখক সংঘের ভাবধারা প্রকাশ করে অন্যান্যদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিতেন। চন্দননগরে একবার একটা খুব বড় সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল যাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন নামকরা সব বড় বড় সাহিত্যিক ও পণ্ডিত লেখকরা। এটা ছিল প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকদের আসর। কিন্তু ডাঃ দত্ত এতেও উপস্থিত হয়ে ভিন্ন সুরে কথা বলেন, তাতে সেইসব সাহিত্যিকরা খুব চটেছিলেন এবং ডাঃ দত্তকেও অনেক কটূক্তি শুনিয়েছিলেন। আমরা ডাঃ দত্তকে বলতাম, কেন তিনি এরকম জায়গায় আসেন, যেখানে তাঁর মূল্য কেউ বোঝে না? ডাঃ দত্ত কিন্তু নির্বিকার। বলতেন, ওসব ধরতে গেলে চলে না, তাঁর কথা তিনি সব জায়গায় বলে যাবেন।

একজন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে ডাঃ দত্তের যোগাযোগ

ছিল তখনকার সবরকম বিদ্রোৎসাহী মহলের সঙ্গে। কিন্তু সব জায়গাতেই তিনি বেসুরো কথা বলতেন, তাই সব জায়গাতেই তিনি অপাংক্তেয়ের মত ব্যবহার পেতেন। কিন্তু তবু তিনি দমতেন না, নিজের ধারায় চলতেন। তাঁর মতো একজন বয়স্ক ব্যক্তি যে চিরাচরিত ধারার এক মূর্ত ব্যতিক্রম ও প্রতিবাদ হিসাবে একজন যুবকের মতো দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে পারেন, এটা আর কারুর ক্ষেত্রে আমি দেখিনি।

বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, ডাঃ দত্ত বুঝি শুধু ওপর ওপর কিছুটা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার হলেই এবং সেই ধারার সঙ্গে মেলে এমন কিছু সংগঠন ও আন্দোলন হলেই যথেষ্ট হল মনে করতেন, তার চেয়ে গভীরতর, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে বুনিয়াদী সংগঠন দরকার, অর্থাৎ যে কমিউনিস্ট পার্টি দরকার, সে বিষয়ে কিছুই ভাবতেন না। কিন্তু তা মনে করা যায় না। কেননা, তাঁর কাছ থেকে যারা শিক্ষা পেয়েছে তাদের বেশীর ভাগই কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকেছে। সকলকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে বলতেন না হয়ত, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে যেতে নিষেধ করেছেন কাউকে তাও শুনিনি। কমিউনিস্ট পার্টি করা ঠিক নয় মনে করলে তিনি নিশ্চয়ই সে কথা বলতেন এবং অনেকের মতো সমাজতন্ত্রী দলে বা দল-বহির্ভূত অবস্থায় সকলকে থাকতে বলতেন। কিন্তু সেরকম মনোভাব তাঁর দেখিনি কখনও। বরং কমিউনিস্ট মনোভাব নিয়ে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল বেশী ঘনিষ্ঠ। রঙ্কিম মুখার্জী ও আব্দুল মোমিন, এই দুজন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন শ্রমিক-আন্দোলনের একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন ডাঃ দত্তের বোধহয় সবচেয়ে প্রিয়। সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত থেকেই ডাঃ দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। সরোজ মুখার্জীও ডাঃ দত্তের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এঁরা সকলেই তো কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন অল্পদিনের মধ্যেই। আমাকেও ডাঃ দত্ত কখনও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার কথা বলেন নি বটে, তবে যেদিন এই উদ্দেশ্যে আমি কলকাতায় কমরেড গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিন ডাঃ দত্তই আমাকে কমরেড চক্রবর্তীর বাড়ী চিনিয়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ দত্তের ভাবভঙ্গিতে বুঝেছিলাম যে আমার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ দেখে তিনি খুশীই হয়েছিলেন।

এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ ডাঃ দত্ত ২০ দশকের প্রথম দিকে

সোভিয়েতে গিয়ে লেনিনের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর একটা লেখা লেনিনকে দেন। লেনিনও ডাঃ দত্তের লেখা পড়ে তাঁকে নির্দেশ দেন যে ভারতের পরিস্থিতিতে কৃষক সমাজের অবস্থারই ভিত্তিতেই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা নির্ধারণ করতে হবে। ডাঃ দত্ত লেনিনের এই নির্দেশ থেকে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন ও প্রকৃত পথের সন্ধান পান। এ সব থেকে বোঝা যায় ডাঃ দত্ত লেনিনের পথেরই পথিক ছিলেন। তবু স্পষ্টভাবে তিনি এখানে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেন হলেন না সেটা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ডাঃ দত্ত যে সব কথাবার্তা বলেছেন তা থেকে এর কারণ কিছুটা বোঝা যায়। প্রথমতঃ, যে কথাটা আগেই বলেছি, ডাঃ দত্ত নিজে ছিলেন একজন গবেষকের মতো, যার কাজ সঠিক চিন্তাধারা জুগিয়ে দেওয়া, আন্দোলন গড়ে তোলা বা সংগঠন তৈরী করা ঠিক তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গের কাছে ছাড়া কারুর কাছে তিনি প্রকাশ করেন নি। কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম ও কর্মীদের সম্বন্ধে সাগ্রহে খোঁজখবর নিতেন তিনি। কিন্তু তবু কোনদিন তাঁকে কোনো উপলক্ষ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে আসতে দেখিনি। একথা তাঁকে একদিন বলতে তিনি জানান যে তিনি আমাদের 'কমিউনে' আসতে রাজী, কিন্তু আমাদের পার্টি অফিসে যাবেন না। কথামত একদিন তিনি আমাদের 'কমিউনে', যেখানে আমি, সরোজ মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি থাকতাম, সেখানে এসেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে না আসার কারণটা তাঁর মুখে যা শুনলাম তা নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিমান। তাঁর অভিমানটা এই যে, তিনিই প্রথম রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিনের সঙ্গে এ দেশের সমস্যা নিয়ে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে এগিয়ে যান, অথচ তাঁর এ চেষ্টার কোনো স্বীকৃতি মোটেই দেওয়া হয়নি এখানকার পার্টির পক্ষ থেকে। তাই তাঁর অভিমান থেকে গিয়েছে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সম্পর্কে। অবশ্য তাঁর এই আত্মাভিমানকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা আর আমরা কখনও তুলিনি। তাঁর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তাতেই আমরা তাঁর উচ্চ মূল্য বরাবর দেব।

ডাঃ দত্ত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছাড়াও নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এ দেশের কৃষক-সমস্যা ও দেশের সামাজিক

ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত। এবং এইদিক দিয়ে শিক্ষিত মহল সকলেই তাঁকে বিশেষ মূল্য দেন। তাঁর এইসব বিষয়ে লেখা মূল্যবান বই আমি যতটুকু পড়েছি তা থেকে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছি। কিন্তু তবু ডাঃ দত্ত আমার কাছে ছিলেন অন্য রকমের একজন মানুষ, যিনি শুধু জ্ঞানই দেন নি, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু করেছেন। আমার রাজনৈতিক জীবনের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন, বন্ধুর কাজ করেছেন, আত্মীয়ের মতো কাজ করেছেন। সেই হিসাবেই ডাঃ দত্ত আমার কাছে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের আর এক অধ্যায়

রণেন সেন

পার্টি অফিসের কথা

এই প্রসঙ্গে লেখার প্রয়োজন। '৪২-এর পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার ও ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অফিস ২৪৯নং বহুবাজার স্ট্রীটে ছিল। ১৯৪০-এ পার্টি আইনী হলে আর ছোটো ফ্ল্যাট নিয়ে প্রাদেশিক পার্টি অফিস খোলা হয়। কলকাতা জেলা কমিটির অফিসও ঐখানে একটা ফ্ল্যাটে নেওয়া হয়। বউবাজার স্ট্রীটে (বোধহয় ১২১ নং) ২৪ পরগণা অফিস খোলা হয়। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর উল্টো-দিকে দক্ষিণ কলকাতা লোকাল অফিস খোলা হয়। '৪৫-এর কোনও সময়ে ক্যাম্পবেল হাসপাতালের উল্টোদিকে ১২১ নং আপার সার্কুলার রোডে প্রাদেশিক কমিটির অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। '৪৬-এর মাঝা-মাঝি ঐ অফিস কলকাতা জেলাকে দিয়ে প্রাদেশিক অফিস ৮নং ডেকার্স লেনে স্থানান্তরিত হয়। '৪৬-এ ২৪৯নং বহুবাজার স্ট্রীটে বি পি টি ইউ সির অফিস খোলা হয়। পূর্বেই লেখা হয়েছে ২৪ পরগণা অফিসেই একটা মেডিকেল সেন্টার খোলা হয়েছিল।

বন্দীমুক্তি

১৯৪৬-এর মাঝামাঝি বাংলাদেশের সমস্ত রাজবন্দী ছাড়া পান। আগের আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকার আন্দামানের বন্দীদের বাংলার জেলে এনে রেখেছিল। এবারও তাঁদের মুক্তির জন্য দেশে আন্দোলন করতে হয়। এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পার্টির ছিল। মুক্ত বন্দীদের বেশীর ভাগ পার্টিতে যোগ দিলেন, যেমন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ। সত্যেন মজুমদার, প্রভাত মিত্র প্রমুখ বন্দীরা ১৯৪২-এর পর থেকেই বাংলার বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। এরাও এই সময়ই ছাড়া পান। ১৯৪৫-৪৬

নাগাদ 'আগস্ট বন্দীরা' মুক্তি পান। সুতরাং ময়দানে লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি সকলেই মজুদ। দুনিয়ার সর্বত্র পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছে—এদেশেও তার মহড়া চলতে লাগল। এই মহড়ায় কমিউনিস্ট পার্টিও বিশিষ্ট স্থান দখল করল। ভারতের মানচিত্রে পার্টির নিজস্ব স্থান নিজেই করে নিয়েছিল।

১৯৪৬-এ কেন্দ্রে যুক্ত মন্ত্রিসভা

বৃটিশ সরকারের পরামর্শে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার আলোচনা লর্ড ওয়াভেল (ভাইসরয়) লীগ ও কংগ্রেসের সঙ্গে শুরু করে। অনেক দর কষাকষির পর কংগ্রেস-লীগের একটা যুক্ত মন্ত্রিসভা কেন্দ্রে গঠিত হয়। কিন্তু তারই মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। নানা কারণে এই মন্ত্রিসভা একটা বাজেট পাশ করেই ভেঙ্গে যায়। বৃটিশ সরকার ক্রীপস ও পেথিক লরেন্সকে ভারতে পাঠায় কি করে, কিভাবে কতটুকু 'স্বাধীনতা' ভারতকে দেওয়া যায় ও কার হাতে দেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় ঠিক করতে। এ সবের অনেক বৃত্তান্ত বেরিয়েছে আমি শুধু উল্লেখমাত্র করলাম।

স্বাধীনতা পত্রিকা প্রকাশ

লীগ বা কংগ্রেসের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল হলেও পার্টির শ্রমিক-মহলে ভাল সংগঠন ও প্রভাব ছিল; মধ্যবিত্তদের মধ্যেও বেশ প্রভাব বিস্তার করে। পার্টি গ্রামাঞ্চলেও সর্বত্র না হলেও অল্পবিস্তর প্রসার লাভ করেছিল। দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম থেকে বীরভূম বাঁকুড়ায় পার্টির শক্তি নানাদিক থেকে অনুভূত হত। অথচ পার্টির কোনও পত্রিকা ছিল না। তাই প্রচারক, সংগঠক ও সংগ্রামের বাণী বহন করবার মত একটা দৈনিক পত্রিকার প্রয়োজন অনুভূত হয়। '৪৫ সালের শেষদিকে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশিত হল। পার্টির সভ্য, সমর্থক, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকলেই অর্থসংগ্রহ করলেন। সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী, সহ সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তী, প্রকাশক প্রমোদ দাশগুপ্ত। ভারতে সেই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা। কি উৎসাহ ও উদ্দীপনা পার্টির মধ্যে ও আশপাশে তা লিখে প্রকাশ করা যায় না। রাত জেগে কর্মীরা পত্রিকা প্রকাশ করতেন, অগুদল পার্টি অফিস-গুলিতে বা টি ইউ অফিসগুলিতে পত্রিকা পৌঁছে দিতেন। প্রত্যেক কমরেড স্কোয়াড করে কারখানার গেটে, রাস্তায়, বাজারে তা বিক্রী করতেন। সে

সময় সকাল হতে না হতে 'স্বাধীনতা'র প্রচার দিয়ে দিনের অন্য কাজ আরম্ভ হত।

গোড়ার দিন থেকেই কংগ্রেসী নেতারা জেল থেকে মুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ও উৎকণ্ঠিত হলেন। লীগ তো আগে থেকেই প্রকাশ্য বিরোধিতা করছিলই। 'স্বাধীনতার' উপর তাই এইসব দিক থেকে কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও প্রকাশ্য আক্রমণ বা চোরাগোপ্তা আঘাত আসতে লাগল।

প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন

পুরানো '৩৫ সালের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুযায়ী নির্বাচন ঘোষিত হল। আমরা সাধারণ আসনে যশোর জেলা থেকে কৃষ্ণবিনোদ রায়, দিনাজপুর তরুণীলী কেন্দ্র থেকে রূপনারায়ণ রায় (পার্টি ভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান পার্টির সঙ্গেই ছিলেন, '৭১ এর মুক্তি সংগ্রামে ঘাতকের হাতে নিহত হন), দার্জিলিং থেকে রতন লাল ব্রাহ্মণ, চট্টগ্রাম থেকে কল্পনা দত্ত (যোশী) ও শ্রমিক আসনে কলকাতা কেন্দ্রে লাহিড়ী, হাওড়া থেকে বঙ্কিমবাবু, আসানসোল কয়লাখনি থেকে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, শ্রীরামপুর থেকে মহম্মদ ইসমাইল ও বারাকপুর থেকে চতুর আলীকে ও বিশেষ রেলকেন্দ্র (কলেজিয়েট প্রথায় ডাক ব্যালটে নির্বাচন) জ্যোতি বসুকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাই। এর-মধ্যে রূপনারায়ণ, রতনলাল ও জ্যোতি বসু নির্বাচিত হন। সর্বত্রই 'আমরা বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, বৃটিশের দালাল' প্রভৃতি কুৎসা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি অফিস, শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস, নির্বাচন কেন্দ্র প্রভৃতি জায়গায় আমাদের উপর কংগ্রেসীদের আক্রমণ শুরু হয়। ডঃ নীরোদ মুখার্জি, প্রঃ নীরেন রায়, রাধারমণ মিত্র, অমৃত নাগ (১৯৫০ এ বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বলি হন) প্রভৃতি জানা অজানা অনেক সভ্য ও সমর্থক কংগ্রেসীদের হাতে নির্যাতিত হন। গান্ধী টুপি পরিহিত কংগ্রেসীরা কমিউনিস্ট নির্যাতনে বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন—তাঁদের মধ্যে সেটা হুজুগে পরিণত হয়। স্বাধীনতা পত্রিকার বহুৎসবও এই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ছিল। এই সময় কংগ্রেসীদের সাথে আমাদের সর্বত্রই ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই থাকত। কলকাতা ও তার আশপাশ ছাড়াও ঢাকা, মৈমনসিং, যশোর প্রভৃতি শহরেও এইরূপ মারপিট হত।

১৯৪৬-এ নির্বাচনের কিছু আগে শরৎ বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতা নেতাজী

সুভাষের নামে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা নেহরুজীকে ঐ উপলক্ষে কলকাতায় আনেন। দেশপ্রিয় পার্কে নেতাজীর বিরাট প্রতিকৃতির (বোধহয় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট চওড়া) নীচে সভায় নেহরুজী বক্তৃতা দেন। নেহরু '৪২ এ বলেছিলেন যে, সুভাষ যদি জাপানীর সহায়তায় দেশে প্রবেশ করতে চান তো নেহরু তরোয়াল হাতে তাকে প্রতিরোধ করবেন। অনেকে সেই সুভাষের প্রতিকৃতির নীচে নেহরুকে দাঁড় করানোকে একপ্রকারের প্রতিশোধ নেওয়া মনে করেন। সেই সভায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নানা প্ররোচনা (যেমন এরা মাইক নষ্ট করে দিয়েছে ইত্যাদি) দেওয়া হয়। বস্তুত এই সভা নির্বাচনের মহড়ার আগেই হয়েছিল। এবং যতটা মনে পড়ে পার্টির উপর আক্রমণ এই সভার পর থেকেই হতে থাকে। কলকাতা ও আশপাশের কয়েকটা পার্টি অফিস আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ কলকাতা অফিস থেকে অতিকষ্টে পার্টি ভলান্টিয়ারের সাহায্যে সুধীর পাখিরাকে বের করে আনতে হয়। এ ঘটনা ২৬শে জানুয়ারী ঘটে। এর আগে ২৪ পরগণা পার্টি অফিস তিনদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। পার্টিও সর্বশক্তি দিয়ে অকুতোভয়ে প্রতিরোধ করে। অনেক স্থানে আমাদেরও লাঠি ধরতে হয়। বাংলার প্রত্যেক জেলাতেই অল্পবিস্তর পার্টি সভ্যদের উপর কংগ্রেসীদের পরিকল্পিত আক্রমণ ১৯৪৫ এর পর থেকে চলতে থাকে।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন

আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাপার সকলেই জানেন। দেশের এই অগ্নিগর্ভ সময়ে ঐ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল। তখন আর আমরা 'জনযুদ্ধের' লোক নই। আমরাও চাই বৃটিশ অবিলম্বে দেশত্যাগ করুক এবং আন্দোলন করে তাদের বিতাড়ন করতে হবে। কিন্তু কি করা তা স্পষ্ট ছিল না।

১৯৪৬এর শেষ ভাগে কলকাতার ছাত্র সমাজ আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে রাস্তায় নেমে পড়লেন। ধর্মতলা স্ট্রীটে অবরোধ স্থাপন করা হল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন ছাত্র নিহত হলে উত্তেজনা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত কলকাতা ও আশপাশ অচল হল। যানবাহন ও কারখানা বন্ধ। পার্টি কি করবে? আমরা আলোচনায় বসলাম যত প্রাদেশিক কমিটির সভ্য পাওয়া গেল তাদের নিয়ে। ব্যাপারটা যে সাম্রাজ্য-

বাদ বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয় বুঝতে অনেকের দ্বিধা হচ্ছিল, বিশেষ করে নেতৃত্ব যখন কংগ্রেসের হাতে—আর সেই হাতে আমরা পিটুনীও খাচ্ছিলাম। যাই হোক সিদ্ধান্ত হল আমরা সর্বতোভাবে ঐ আন্দোলনে যোগ দেব। ব্যাস, আমাদের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। 'পরিচয়ের' ১৩৮৪র শারদীয়া সংখ্যায় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের এই এ-সম্পর্কে লেখাটা পড়ে দেখলে বোঝা যাবে। দেশপ্রেমীদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধের হারানো যোগসূত্রটা ফিরে পেলাম। এই আন্দোলনে মুসলমানরা অগ্রণী হলেন। বিশেষ করে সেটা হল ক্যাপ্টেন রশীদ আলী প্রভৃতির মুক্তির দাবীতে (এঁরাও আজাদ হিন্দ বাহিনীর)। লীগের তরফ থেকে শহীদ সুহরাবর্দী নেতৃত্ব দিলেন, আর আমরা তো লাগাম ছাড়া ঘোড়া। অনেক দিনের রুদ্ধ আবেগ স্রোতের মত বেরিয়ে এল। আমরা সকলের আগের সারিতে। রাজাবাজার, মহম্মদ আলী পার্ক, পার্ক সার্কাস প্রভৃতি অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক মানুষ হিন্দু ও মুসলমান লাল নিশান, তেরঙ্গা ও লীগ ঝাণ্ডা নিয়ে পথে বেরুল। কত ছেলে গুলিতে প্রাণ দিলেন তার ইয়ত্তা নেই। মিছিল সব বাধা ভেঙ্গে লালবাজার পার হল। তখন দেখা গেল সামনে মেশিন গান। নেতারা অবস্থা বুঝে মিছিলকে ঘুরিয়ে নিলেন নচেৎ সেদিন কত যে প্রাণ বলিদান হত তার ঠিক নেই।

এই দুই আন্দোলনে পার্টির পতাকা সসম্মানে উড্ডীন হল। কমিউনিস্ট বিরোধিতায়ও একটু ভাঁটা পড়ল। আর সর্বস্তরের মানুষ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকল। স্বাধীনতার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ল, পার্টির অর্থাগম বাড়তে থাকল, পার্টির সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। মধ্যবিত্তের মধ্যে বিশেষ করে।

কলকাতায় এ আই টি ইউ সি সম্মেলন

১৯৪৭-এর জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতির প্রধান কার্যাবলী নন্দ বসুই পরিচালনা করেন। তিনি বি পি টি ইউ সির সহ সম্পাদক ছিলেন।

ভারতের প্রতি প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি আসে এবং তার মধ্যে পার্টির টি ইউ গুলির প্রতিনিধি প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ। সেই শেষ এ আই টি ইউ সি-র সংযুক্ত সমাবেশ। তার পরে প্যাটেল অনুপ্রাণিত আই এন টি ইউ সি-র জন্ম

ও এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। দেশও ভাগ হয়ে গেল। ১৯৪৯ সালে বোম্বাই-এ অর্ধ গোপন আর একটা সম্মেলন হয় যা থেকে এন. এম. জোশী প্রমুখ ব্যক্তিরা বহিষ্কৃত হন। তার পরে হিন্দ মজদুর সভার ও ইউ টি ইউ সির জন্ম হয়।

এই সম্মেলনে আমরা কার্যকরী সমিতিতে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ আসন নেই। ভাঙ্গে সভাপতি ও জোশী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রায় সারা রাজ্যব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় যাতে হেমন্ত মুখার্জী, পঙ্কজ মল্লিক, সলিল চৌধুরী প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেন। পার্টির সাংগঠনিক শক্তি ও প্রভাব এই টি ইউ সি সম্মেলন মারফৎ প্রকাশ পায়। পার্টি গণ পার্টিতে পরিণত হয়েছিল এবং হয়েছিল একটা জাতীয় শক্তি হিসাবে।

এই সম্মেলনের কিছু কাল পরে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার স্বপক্ষে কলকাতার ছাত্র মহল হরতাল ও মিছিল করে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দুটি ছাত্র নিহত হয়। নন্দ বসু ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ঠিক হয় যে বি পি টি ইউ সি ছাত্রদের দাবী ও সংগ্রামের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেবে। ধর্মঘট খুবই সফল হয়। এইরূপ ধর্মঘট, হরতাল যতটা মনে পড়ে পার্টির নেতৃত্বে ঢাকা ও মৈমনসিং-এও হয়।

পার্টি এইভাবে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সম্মেলন. ধর্মঘট ও হরতালের মারফৎ দিয়ে নিজের শক্তি সংহত করছিল, আরও বিভিন্ন জনসমষ্টিকে সংগ্রামের পতাকা তলে সমবেত করছিল। পার্টির শক্তি ও প্রভাবের সামনে সি এস পি, আর এস পি, এফ-বির প্রভাব বা ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়েছিল।

তেভাগা আন্দোলন

পার্টির নেতৃত্বে সারা বাংলায় তেভাগার দাবীতে বিরাট আন্দোলন। দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি জায়গায় এই আন্দোলন প্রকৃতই ব্যাপক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। রূপনারায়ণ রায়, বিভূতি গুহ, গুরুদাস তালুকদার, মনিকৃষ্ণ সেন, হাজী দানেশ, ইয়াকুব মি'য়া প্রমুখ কৃষক নেতারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। শেষোক্ত কমরেডরা এখন কেউ কেউ বাংলাদেশের পার্টির কাজ করছেন।

এইসব আন্দোলন (শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন) সত্ত্বেও কলকাতা ও আশপাশে থেকে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে থাকে। আসলে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে

কার হাতে ক্ষমতা আসবে বা পাকিস্তান মেনে নেওয়া হবে কিনা প্রভৃতির প্রশ্নটাই চাপ হিসাবে লীগ দাঙ্গার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল যদিও ঐ লীগের মধ্যে একদল নেতা দাঙ্গার বিরোধিতা করছিলেন।

নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ

ঐ সময় বোম্বাইতে নৌ বাহিনীর বিদ্রোহ হয়। ইতিহাসে বেশী যাব না, সকলেই ঘটনা জানেন। লাল ঝাণ্ডা, তেরঙ্গা ও লীগ পতাকা হাতে নিয়ে কয়েকদিন ভারতীয় নৌ-বাহিনী বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বোম্বাই-এর পার্টি সমুচিতভাবে শ্রমিক ধর্মঘট ও হরতালের মারফৎ ঐ বিদ্রোহকে সমর্থন জানায়। আমাদের একজন কমরেড কমল দোন্দে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। কিন্তু জিন্না ও প্যাটেল উভয়ই বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করেন। বিদ্রোহ কয়েকদিনের মধ্যে বন্ধ হয়।

ভারতের কয়েক স্থানে পুলিশের বিক্ষোভও ঘটে।

এইসব সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ সারা ভারতে শুধু নয় ইংলণ্ডেও চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এরই ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে বৃটিশ সরকার ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে ভারত থেকে চলে আসতে চায় এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে দুতিয়ালীর কাজে ভারতে পাঠান। এ ইতিহাসে আমি আর যাচ্ছি না।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং—জুন ১৯৪৭

'৪৭ এর জুন মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা দিল্লীর তদানীন্তন পার্টি কমিউনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা ও আগত ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্পর্কে বৃটিশের চক্রান্তের বিষয় বিবেচিত হয়—প্রস্তাবটি ঠিক মনে নেই। সভায় পেশোয়ারের পার্টি সভ্য আতা মহম্মদ খাঁও আসেন। দেশ বিভাগের প্রশ্নটি তখনই আলোচিত হয়। ঐ কমিউনে একদিন শেখ আবদুল্লা, মহম্মদ সাদিক ও বক্সী গোলাম মহম্মদ পার্টি নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। নূতন কাশ্মীর আন্দোলনের তখন কেবল সূত্রপাত। এঁরা প্রত্যেকেই পার্টি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সমর্থক ছিলেন পার্টি'র। "নয়া কাশ্মীর" আন্দোলনের এই নেতারা এক নূতন পথের দিশারী ছিলেন।

কলকাতায় হো চি মিনের আগমন

ডেকার্স লেনের অফিসে একদিন খবর আসে যে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আগের দিন হো-চি-মিন এসে আমাদের খবর করেছেন। আমরা তৎক্ষণাৎ হোটেলে যেয়ে শুনি যে তিনি প্যারিসে চলে গেছেন ও সংবাদ রেখে গেছেন যে তিনি শীগ্‌গীরই আবার আসবেন। কিছুকাল পরে তিনি একজন ফরাসী পার্টি'র কমরেডকে নিয়ে ডেকার্স লেনের অফিসে নিজেই আসেন। তিনি জানান যে, ফরাসী সরকারের সাথে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার প্রশ্নে আলাপ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নি। দেশে ফিরে আবার নতুন করে সংগ্রাম করতে হবে। ফরাসী কমরেডটি দোভাষীর কাজ করেন।

তাঁদের ভীম নাগের উৎকৃষ্ট সন্দেশ খেতে দেওয়া হয়। একটু ভেঙ্গে মুখে দিয়ে হো-চাচা ইংরাজীতে বললেন বেশী মিষ্টি। পার্টি অফিসে আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে ফটো তুলি ও পরে তা টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। পার্টি বে-আইনী সময় সে ফটোটা পুলিশ নিয়ে যায়।

গণ পরিষদ (কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী) ঘোষণা

'৪৭-এর গোড়ার দিকে কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী দেশ ভাগের আগে ঘোষিত হয় যে প্রাদেশিক আইনসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে গণ পরিষদে সভ্য নির্বাচন করা হবে। সেই অনুসারে সোমনাথ লাহিড়ী পরিষদে নির্বাচিত হন। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সোমনাথ লাহিড়ী তার সভ্য হিসাবে কাজ করেন। যদিও ঐ সময় টামে একটা বিরাট ধর্মঘট হওয়ায় তাকে কিছুদিন জেলে থাকতে হয়।

গণ আন্দোলনের ব্যাপকতা

যতটা মনে পড়ে এই সময়ই মৈমনসিং জেলায় মণি সিংহের নেতৃত্বে টঙ্ক আন্দোলন সংগঠিত হয়। ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে (পরে নাম এ বি রেল:) আমাদের সংগঠন প্রবল শক্তিশালী হয়। বাংলায় এমন রেলকেন্দ্র ছিল না যেখানে তার শাখা ও কর্মী ছিল না। সংগঠনের নেতা ছিলেন ইসমাইল ও জ্যোতি বসু। বীরেন দাশগুপ্ত, বিমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি উত্তর বাংলায় সংগঠক ছিলেন। এই রেলওয়ের আওতায় সমগ্র পূর্ব বাংলা, উত্তর বাংলা, রাজশাহী ডিভিশন ও প্রেসিডেন্সী ডিভিশন ছিল। ই আই আর (ইঃ রেঃ) এ সেই

পরিমাণে ভাল সংগঠন ছিল না। বি এন আর (দঃ পূর্ব রেল) এলাকায়ও ভাল সংগঠন গড়ে উঠেছিল—হাওড়া থেকে নাগপুর পর্যন্ত কম বেশী।

দেশ ভাগ ও পার্টি সম্মেলন—পার্টি লাইনের পরিবর্তন

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে হবার ঘোষণা ছিল। তাই ১৯৪৭-এর অক্টোবরে প্রাদেশিক সম্মেলন ডেকার্স লেনের অফিসের বিরাট ছাদে প্যাণ্ডেল বেঁধেই অনুষ্ঠিত হয়। কোন বিতর্ক হয় নি একটা বিষয় ছাড়া যে জোশীর প্রভাবে টি ইউ প্রস্তাবে লেখা হয় যে বর্তমান যুগে অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে এখন অন্তত কিছুকাল কোনও শ্রমিক ধর্মঘট হওয়া উচিত নয়। গোপাল আচার্য, আমি ও অন্য কয়েকজন ঘোর আপত্তি তোলায় ঐ অংশটি বাদ যায়। যুক্ত বাংলায় সেই শেষ যুক্ত পার্টি সম্মেলন।

সম্মেলনে সমস্ত বাংলারই প্রতিনিধি ছিলেন যদিও ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন ও বাংলা বিভক্ত হয়ে যায়। নতুন কমিটির সভায় আমাকে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। সেক্রেটারিয়েটে সরোজ, নিরঞ্জনদা, ইন্দ্রজিৎ, লাহিড়ী, নৃপেন চক্রবর্তী, ভবানী সেন ও বিশ্বনাথ নির্বাচিত হন। মুজফফর, রসুল, হালিম, মণি সিং কৃষ্ণবিনোদ রায়, বঙ্কিমবাবু, খোকা রায়, আলতাব আলী, হীরেন বাবু, নেপাল নাগ ও অন্যান্য জেলা থেকে আরও অনেকে প্রাদেশিক কমিটিতে নির্বাচিত হন।

প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিম বঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের সঙ্গে বেশ খাতির। একটু একটু করে কিন্তু গভর্ণমেন্ট জনবিরোধী পথে অগ্রসর হতে থাকল—কলকাতায় তার নীতির বিরুদ্ধে এ্যাসেম্বলীর সামনে মিছিলের উপর পুলিস লাঠি ও গুলি চালায় ও গুলি করে একজনকে হত্যা করে (নাম মনে পড়ছে না)। কলকাতায় চাঞ্চল্য পড়ে যায়, আমরা হরতাল ও ধর্মঘটের ডাক দিই। ট্রাম প্রভৃতি স্থানে সোশালিস্ট পার্টির ও কংগ্রেসের ভলান্টিয়াররা জোর করে কাজ চালায়। অন্যত্র ধর্মঘট তেমন হয় না—এমনকি মেটেবুরুজেও।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস—কলকাতায়

ইতিমধ্যে ভারতের অন্যত্র ভারত সরকারের নীতি কায়েমী স্বার্থমুখীন, জনবিরোধী ও গণ আন্দোলন বিমুখী হতে থাকে। বহু স্থানে জনগণের উপর অত্যাচারও চলতে থাকল। হায়দ্রাবাদে অক্র মহাসভার নিজামের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। তার প্রতিও ভারত সরকার বিমুখতা পোষণ

করছিল। পার্টির মধ্যে সরকারী নীতির বিরোধিতার মনোভাব দানা বাঁধছিল। পার্টির স্লোগান "জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতি" বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। এই অবস্থায় ডিসেম্বর ১৯৪৭ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসে। সেখানে বাংলার কমরেডরাই পার্টিনীতির পরিবর্তন দাবী করে। মোটামুটি রণদীভের নেতৃত্বে বেশীভাগ সভ্যরাই সরকারবিরোধী সংগ্রামের কথাই বলেন। কেবল জোশী, সুন্দরায়া ও কয়েকজন পুরোনো পথেরই সমর্থক ছিলেন। এই হল দ্বিতীয় কংগ্রেসের পটভূমি।

রণদীভে দলিল লিখে কলকাতায় আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে গেলেন।

বিশ্ব যুব প্রতিনিধিরা কলকাতায় সম্মেলন করে পার্টি কংগ্রেসের কিছু আগে। কংগ্রেসী ছেলেদের হাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের চাবিকাঠি ছিল। তাঁরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কমিউনিস্টবিদ্বেষ ও সোভিয়েত-বিরোধিতা জাহির করে। কিন্তু ভারতের বাইরের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন ভিয়েতনাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ফরাসী প্রভৃতি দেশ থেকে, যেখানে সংগঠিত প্রচণ্ড গেরিলা-যুদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের চেষ্টাকে কংগ্রেসী ছেলেরা সুবিধা করতে পারে না। ঐ বিদেশী ছেলেদের চারু ঘোষের বাড়ীতে একটা অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে সশস্ত্র কিছু লোক নিমন্ত্রিতদের আক্রমণ করে। একজন আই. পি. টি-এর কমরেডও চারুবাবুর বাড়ীর একজন তাদের গুলিতে মারা যান। এই হল পার্টি কংগ্রেসের দ্বিতীয় পটভূমি।

সময় মত পার্টি কংগ্রেস বসল। বিরোধীদের তরফ থেকে আক্রমণের ভয় ছিল তাই শক্ত রেডগার্ড পাহারা দেওয়া গেল। আধা-সামরিক উর্দী পরে রেডগার্ডরা কলকাতায় পথে পথে বহু কুচকাওয়াজ পূর্বে করেছে। শত্রুমিত্র সকলেই চেয়ে দেখত। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত পার্টি সদস্য ও সমর্থক নিয়ে এটা গঠিত হয়েছিল '৪৭ এর গোড়ায়। প্রতিটি স্ট্রাইকে এদের কুচকাওয়াজ করান হত কারখানার ধারে কাছে। পার্টি লাইন সংগ্রামের পথে যাচ্ছে বুঝে রেডগার্ডের উপর আরও নজর দেওয়া হল। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, ডাঃ নারায়ণ রায় প্রভৃতিই শিক্ষা ও সংগঠনের ব্যাপার দেখতেন। খাকী উর্দী ও লাল টুপি পরিহিত রেডগার্ডের কুচকাওয়াজ দেখার বস্তু ছিল।

সব সময় সতর্ক থাকার জন্য ব্যবস্থাও রাখা হল। সে এক এলাহি

ব্যাপার। তবে সবই সম্ভব ছিল কারণ পার্টি মধ্যে বজ্র-কঠিন ঐক্য সংগঠনের শক্তি ও দৃঢ়তা, সভ্যদের সাহসিকতা ও তদুপরি পার্টির প্রতি আনুগত্য ও নীতির প্রতি অটুট-বিশ্বাস ও ভালবাসা পার্টি সভ্যদেরকে সর্বদাই উদ্দীপিত রাখত। এবং পার্টি-নেতৃত্বের প্রতি সভ্য ও সমর্থকদের বিশ্বাস ও ভালবাসা এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ পরিবারের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।

কংগ্রেসে সর্বশ্রেণী থেকে সর্ব বয়সের নরনারীর এক বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি আসেন। কংগ্রেসে মূল দলিল উপস্থিত করেন রণদীভে—"সোশিয়লবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম"। অনেক বক্তা বক্তব্য উপস্থিত করলেন। কংগ্রেসে মূল ধ্বনি হল—'পার্টিকে সোধনবাদ মুক্ত করতে হবে', এতদিন জাতীয় ঐক্যের নামে পার্টিতে সোধনবাদ চলছিল। কংগ্রেস বুর্জোয়া সংগঠন বুর্জোয়া শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই সরকার পরিবর্তন করতে হবে, সংগ্রাম করে সরাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। খুবই সরগরম অবস্থা। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে বাংলার সকলে থাকলাম মুজফ্‌ফর সাহেব প্রথম এর সভ্য হলেন। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কৃষ্ণাণ, মোহন, বাসবপুন্নায়া, রাজেশ্বর রাও, রঙী নারায়ণ রেড্ডী প্রভৃতি নির্বাচিত হলেন। জোশী নির্বাচিত হতে পারলেন না যদিও বাংলার সকলেই বোধহয় ভোট দেন। রণদীভে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। পিবিতে অজয় ঘোষ, ভবানী সেন, ডাঃ অধিকারী ও আরও তিনজন এলেন। পিবিতে ডাঙ্গে নির্বাচিত হতে পারলেন না।

কংগ্রেসে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি এসেছিলেন অন্যান্য দেশ থেকে যেমন য়ুগোভিচ ও দিদিজের (য়ুগোস্লাভিয়ার পার্টি হোক), লরেন্স শারফী (অষ্ট্রেলিয়ার পার্টি থেকে) ও বর্মার পার্টির সম্পাদক থানটুন (বর্মার পার্টি নতুন করে ইতিপূর্বেই গঠিত হয় আউঙ্গ সানকে বাদ দিয়ে)। থানটুনের সঙ্গে প্রায় ৮ বছর-বাদে দেখা হল। তার বক্তৃতা খুবই গরম—সশস্ত্র সংগ্রামের মারফৎ মুক্তি আসবে, আমরা বর্মায় সেই পথে চলেছি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কংগ্রেসই শেষ যুক্ত পার্টি কংগ্রেস। তারপরেই পার্টিকেও ভাগ করে দেওয়া হল। পাকিস্তানের পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন সজ্জাদ জহীর ও পার্টিতে বুখারী, আতা মহম্মদ, মণি সিং, খোকা রায়, নেপাল নাগ, বারীণ দত্ত (আব্দুস সালাম), জ্ঞান চক্রবর্তী, অনিল মুখার্জী, প্রমথদা, কেষ্টদা, আলতাব আলী প্রভৃতি পূর্ব বাংলার সব কমরেডই রয়ে গেলেন।

কংগ্রেস শেষে আমরা ভাঙ্গা বাংলার পার্টি নিয়ে বসলাম। সংগ্রাম কিভাবে শুরু করা যায় এবং কোথায়। রেডগার্ডকে আরও মজবুত করা, পার্টি সংগঠনকে নতুন পর্যায়ে দাঁড় করান, শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আরও শক্ত করা ইত্যাদি আশু কর্তব্য। গুজব রটছিল পার্টি বে-আইনী হবে তাই তারও কিছু গোপন ঘাঁটি প্রস্তুত করার কাজও চলছিল।

এমন সময় ২৫শে মার্চ দুটো স্থান থেকে গোপন খবর এল—পার্টিকে ২।১ দিনের মধ্যে বে-আইনী ঘোষণা করা হবে। অতএব সাধু সাবধান। ২৬শে মার্চ ভোরবেলা সরকারী বেড়াজাল পড়ল। কিন্তু আমরা বেড়াজাল এড়াতে সমর্থ হই। ভবানী সেন, লাহিড়ী, ভূপেশ, প্রমোদ, আমি, সরোজ, নিরঞ্জনদা প্রভৃতি পুলিশের বেড়াজাল এড়াতে পারি।

সকালে রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম যে দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট পার্টি, তার কমিউনগুলো, তার স্বাধীনতা পত্রিকা, রেডগার্ড, রেড এড কিংবা হোম অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করছিল তাই উক্ত সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল, এবং আমাদের নাম করে বলা হল যে এদের নামে ওয়ারেন্ট আছে।

তখন ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রিসভা, কিরণশঙ্কর রায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, তিনি সন্ধ্যায় রেডিও মারফৎ বক্তৃতায় ঐসব কথাই বললেন এবং দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করলেন।

অতএব স্বাধীনতা পত্রিকা ও প্রেস সরকার দখল করলেন, আর দখল করলেন সব পার্টি-অফিস, পার্টির টাকা পয়সা ও সব সম্পত্তি।

শুরু হল আমাদের নতুন বিপ্লবী জীবন, আর পার্টির গোপন ক্রিয়া-কলাপ। পার্টির মধ্যে কোন আতঙ্ক দেখা দিল না। বরং নতুন চেতনা, সাহসিকতা, কর্তব্যবোধ, নীতির প্রতি নিষ্ঠা ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর অটুট আস্থা দেখা দিল।

পার্টির নতুন পর্যায় শুরু হল।

পরিশিষ্ট

১৯৩০এ সংগঠিত কলকাতা কমিটির কাজের পরিধি বাড়তে বাড়তে বিভিন্ন জেলায় পার্টি কমিটি গঠিত হতে থাকে। ১৯৩৫-৩৮এ সেই কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে রূপান্তরিত হল। মুক্ত রাজবন্দীরা সারা বাংলা দেশে

পার্টি গড়ে তোলেন। বাংলার কোন জেলা বাদ গেল না। জেলা থেকে মহকুমা এমনকি গ্রামেও পার্টি বিস্তৃতি লাভ করল।

ব্যাপক কৃষক আন্দোলন সৃষ্ট হল। ১৯৩৯-৪০ এর তেলা-গাণ্ডী আন্দোলন ১৯৪৬এ বিরাট তেভাগা আন্দোলনের সৃষ্টি করল। শহরাঞ্চলে বড় বড় ট্রেড ইউনিয়ন গড়া হয়, বিরাট বিরাট হরতাল সংগঠিত হয়—কোনও শিল্পাঞ্চল বাদ যায় না। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও টি. ইউ. গঠিত হয়। রেল শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনে সমস্ত ই. বি. আর. ও বি. এন. আর. এলাকা পরিব্যাপ্ত হয়। মূল ঘাঁটি কলকাতায়।

বাংলায় ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন গড়ে ওঠে। মহিলা আন্দোলনের ব্যাপ্তিও কম ছিল না।

আমরা ১৯৪৩-৪৪এ কিশোর বাহিনীও সংগঠিত করি। পার্টি পরিবারের কিশোর কিশোরী ছাড়াও অন্যান্যরাও এই বাহিনীতে যোগ দেয়।

এই সমস্ত আন্দোলনের ভিতর থেকে ও পার্টি সংগঠনের মধ্য দিয়ে নতুন পার্টি কর্মী ও নেতার জন্ম হয়। যাঁরা পার্টি সংগঠন ও গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁরাই বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তখনকার পার্টি সভ্যের সংখ্যা মনে নেই। তবে নিশ্চয়ই অর্ধলক্ষের মত দাঁড়িয়েছিল ১৯৪৭এর মধ্যভাগে।

কিন্তু পার্টির দুর্বলতাও ছিল। হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে সভ্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত, যদিও কয়েকটি জেলাতে মুসলিম সমাজ থেকেও প্রচুর সভ্য এসেছিলেন যথা নদীয়া, মৈমনসিং, কুমিল্লা জেলা।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন প্রভূত সংখ্যায় মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়, বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলন। কলকাতায় আমরা মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের একটা অংশকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হই।

১৯৪৭এর মাঝামাঝি আমরা সুসংগঠিত শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা গণ পার্টিতে পরিণত হই যার সদস্যরা মার্কসবাদে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কর্মী ছিলেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়া এক গৌরব, শ্লাঘা ও আনন্দের ব্যাপার ছিল। জেলায় জেলায় পার্টির লাল পতাকা উড্ডীন ছিল।

আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে

(স্মৃতিচারণ)

নরহরি কবিরাজ

ইতিহাস-খ্যাত আগস্ট বিদ্রোহ তখন শেষ হয়েছে। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েত বিজয় তখন অবিসম্বাদী সত্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে গণ-অভ্যুত্থানের নতুন তরঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। এই রকমের এক ঐতিহাসিক পর্বে আমার সঙ্গে আচার্য ভূপেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

ডক্টর দত্তের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল তাঁরা জানেন তিনি কি রকমের আলাপী লোক ছিলেন। কাজেই ঐ সময়ে আমার মনের কোণে যত প্রশ্ন ভিড় করে আসত তার প্রত্যেকটি আমি তাঁর কাছে তুলে ধরতাম। তিনি সোৎসাহে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন এবং খুবই স্পষ্ট ক'রে তিনি প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতেন।

এই সাধারণ আলোচনা ছাড়া দুটি বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ-আলাপ জ'মে উঠেছিল। প্রথমটি, আমার বই "স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলার" পাণ্ডুলিপি তাঁকে পড়তে দিই এবং তাঁর মতামত জানতে চাই। তিনি পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মত ও সমালোচনা আমাকে জানান। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত—যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ, বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, "সন্ত্রাসবাদী" আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানার সুযোগ ঘটে।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৬ সালে ডক্টর দত্ত সিউড়ীতে যান এবং আমার অতিথি হিসাবে সেখানে এক মাসের মত অবস্থান করেন। আমি তখন সিউড়ি কলেজে শিক্ষকতা করতাম এবং স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির বীরভূম জেলার সম্পাদক ছিলেন কমঃ কালিপদ বশিষ্ট এবং বীরভূম জেলার কৃষক সভার সম্পাদক ছিলেন কমঃ সুরেন ব্যানার্জি।

ডক্টর দত্তের সিউড়িতে যাবার প্রধান আকর্ষণ ছিল—সিউড়িতে থেকে বীরভূম জেলার কৃষক আন্দোলনের ঘাঁটিগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং ভারতের ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবিত পুস্তকের জন্য সরেজমিন তদন্তের ভিত্তিতে স্থানীয় কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও স্থানীয় কৃষক সভার পরামর্শক্রমে ডক্টর দত্ত ও আমি রাজনগরে গিয়ে কয়েকদিনের জন্য অবস্থান করি। জনৈক স্থানীয় কৃষক কর্মীর অতিথি হিসাবে আমরা সেখানে থাকি এবং কৃষক কমরেডদের সহযোগিতায় কয়েকটি কৃষক পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হই। ডক্টর দত্ত কৃষকদের কাছ থেকে একটি প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। কিভাবে গবেষণার জন্য 'ফিল্ড ওয়ার্ক' করতে হয় তা দেখে আমি বিশেষ মুগ্ধ হই এবং ডক্টর দত্ত সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া, আগেই বলেছি মাঝে মাঝে কলকাতায় তাঁর বাড়ী ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে যেতাম এবং জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম।

"বাঙলার জাগরণ" সম্পর্কে তিনি বলতেন—এর অবশ্যই একটা ইতিবাচক দিক আছে, কেননা এই আন্দোলন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তায় দেশকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিল। তিনি রামমোহন, ইয়ং বেংগল, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখ ক'রে বলতেন—এঁরা আমাদের দেশকে দেশপ্রেমে দীক্ষিত ক'রেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বিবেকানন্দের কথা বলতে গিয়ে তিনি রামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে, বা বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলতেন না। বিবেকানন্দের চিন্তার ওপর "কল্পনামূলক সমাজতন্ত্রে"র চিন্তার প্রভাবের দিকটার ওপর খুব জোর দিতেন। আমার মনে হত—বিবেকানন্দের মতামত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর চিন্তার অধ্যাত্মবাদের দিকটা কিছুটা ছোট ক'রে দেখছেন এবং তাঁর চিন্তার ওপর কল্পনামূলক সমাজতন্ত্রের প্রভাবের দিকটা একটু বাড়িয়ে দেখছেন। সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কেও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলতেন—নিবেদিতা আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রকাশিত বিভিন্ন বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা তাঁদের হাতে তুলে দিতেন এবং তাঁদের বিপ্লবী কাজে উৎসাহ দিতেন। তিনি আরও বলতেন—এই কারণে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা নিবেদিতার প্রতি রুষ্ট হন।

এর পাশাপাশি তিনি উনিশ শতকের বাঙলা দেশে যে কৃষক বিদ্রোহগুলি দেখা দিয়েছিল সে-সম্পর্কেও গভীর কৌতূহল পোষণ করতেন। দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে যে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, ময়মনসিংহে পাগলাপন্থীদের যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, বীরভূম ও দুমকায় যে সাঁওতাল বিদ্রোহের আবির্ভাব হয়েছিল, নদীয়া ও যশোহরে যে নীল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, পাবনা ও বগুড়ায় যে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল—এইগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এবং তার ভূমিকা নির্ণয় করার জন্য চেষ্টিত হতে তিনি বারবার আমাকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন—সন্দেহ নেই যে এইগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, তবুও যেহেতু এই বিদ্রোহগুলির একটি ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী চরিত্র রয়েছে তাই এগুলিকে সঠিকভাবে ইতিহাসের পাতায় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল—এটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। বিহারীলাল সরকারের লেখা "তিতুমীর" গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ব'লে চিত্রিত করা হয়েছিল। বিহারীলালের গ্রন্থটি তাঁর মনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। আমি তাঁকে এই বিদ্রোহের মূলত কৃষক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি বারবার এই বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক দিক সম্পর্কে আমাকে সচেতন থাকতে অনুরোধ করতেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-০৮), গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৮-২১), ও আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১) প্রভৃতিকে তিনি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ব'লে মনে করতেন। তিনি বলতেন—এই আন্দোলনগুলির একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিক আছে। তবে এই আন্দোলনের দুর্বলতার দিক সম্পর্কেও তিনি বিশেষ সজাগ ছিলেন—বিশেষ করে, গান্ধীজীর অহিংসা নীতি যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের রাস্তা খুলে রাখার অজুহাত মাত্র—এবিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

"সন্ত্রাসবাদী" আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি গর্ববোধ করতেন। "যুগান্তর" (এক সময়ে তিনি সম্পাদক ছিলেন) পত্রিকার সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা তিনি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতেন। "সন্ত্রাসবাদী" আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ, সাহস, বীরত্ব সম্পর্কে তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ

করতেন। আবার এই আন্দোলনের দুর্বলতার দিকটি সম্পর্কে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। বিশেষ ক'রে, "সন্ত্রাসবাদী" আন্দোলনের নেতাদের ভাবালুতা, উপদলীয় কোন্দল, 'দাদাগিরি' সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ছিল খুবই কঠোর।

তবে আমার মনে হয়েছে, তিনি সব থেকে ভালবাসতেন কৃষক আন্দোলনকে। দেশের ভূমি সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণায় তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। শুধু কৃষক সমস্যা নিয়ে পড়াশুনা নয়, কৃষক আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী, একজন সংগঠক। কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটিকে তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন।

কৃষক সমস্যা সম্পর্কে কোনো কথা উঠলেই তিনি লেনিনের কথা বলতে ভালোবাসতেন। তিনি গল্পসূত্রে বলতেন—১৯২১ সালে তিনি যখন মস্কো যান সেই সময়ে তিনি তাঁর লিখিত একটি থিসিস লেনিনের কাছে পেশ করেন। লেনিন সেটি প'ড়ে তাঁর মন্তব্য সহ ফেরৎ পাঠান। তাতে তিনি বলেন—কমরেড দত্তের উচিত হবে তাঁর (লেনিনের) ঔপনিবেশিক থিসিস-টিকে মনে চলা এবং ভারতে যদি কৃষক সংঘ থাকে তাহ'লে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

ডক্টর দত্ত বলতেন—এই চিঠি তাঁর জীবনে এক মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে। কৃষক সমস্যা যে জাতীয় আন্দোলনের এত বড় একটা দিক—এটা এর আগে তিনি কখনও ভাবেন নি। লেনিনের চিঠি পড়ার পরে, বিশেষ ক'রে, লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিসের মর্মটি অনুধাবন করার ফলে, তিনি বুঝতে পারেন যে আমাদের দেশেও নতুন ধরনের এক বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব—যার মূলশক্তি হবে কৃষক।

এই ধরনের বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তিনি নতুনভাবে কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে থাকেন।

এখন থেকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডক্টর দত্ত ভারতের কৃষি-সমস্যার বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৃষি সমস্যার সমাধান খুঁজতে থাকেন।

ইংরেজ-সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ক'রে তিনি লেখেন—বিনা ক্ষতিপূরণে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া উচিত। কেননা—যারা কৃষকদের

জমি কেড়ে নিয়ে এতদিন ভোগ দখল ক'রেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে তিনি "জাতীয় সরকারের" কাছে দাবি জানান—বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত কর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান দাবি ক'রে তিনি বলতেন—"লাঙ্গল যার, জমি তার" এই নীতি অনুযায়ী কৃষকদের মধ্যে ঐ জমি বিলি করে দিতে হবে।

অবশ্য, তিনি সব সময়েই স্মরণ রাখতে বলতেন যে কৃষকের মধ্যে জমি বিলি হবে আশু কাজ। এটি কখনও কৃষক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ায় যেভাবে জমি জাতীয়-করণ করা হয়েছিল এবং বৃহদাকার সমষ্টিগত চাষ প্রথা চালু হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার ওপর বিশেষ জোর দিতেন এবং বলতেন—ভারতের ক্ষেত্রেও কৃষি সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান রয়েছে এই জমি জাতীয়করণ ও সমষ্টিগত চাষ-প্রথার মধ্যে।

শুধুমাত্র কৃষি-সমস্যার বিশ্লেষণের মধ্যে তিনি তাঁর কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি নতুন ধরনের এক কৃষক আন্দোলন গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই আমরা দেখি এই শতকের তিরিশের দশকে তিনি কৃষকের স্বার্থে কৃষি সংস্কারকে মুখ্য উপজীব্য করে নতুন ধরনের কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী। বাঙলায় যে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে ও পরে যে "সারা ভারত কৃষকসভা" গড়ে ওঠে তিনি ছিলেন তাঁর অন্যতম স্থপতি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষকসভার অন্যতম নেতা হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডক্টর দত্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজনীতিতে যাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী বা নেতা।

আমাকেও তিনি স্নেহ করতেন, কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী জেনেই। তবে তিনি সব সময়েই বলতেন—পার্টির কাজ অবশ্যই করবে, তবে চোখ-কান খোলা রেখে চলবে। অর্থাৎ পার্টির প্রতিটি সিদ্ধান্ত বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নেবে। অন্ধ আনুগত্য পরিহার করবে।

কথাটার গুরুত্ব তখন পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারি নি। পরবর্তীকালে এই কথা যে কত সঠিক তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি।

কমিউনিস্ট পার্টির কতকগুলি সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না। যেমন, ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি যে অবস্থান গ্রহণ করেছিল তিনি তাকে সমর্থন করতেন না। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল—"এই আজাদী ঝুটা হ্যায়" এই সিদ্ধান্তকেও তিনি ভুল বলে মনে করতেন। তিনি নেহরু সরকারকে "জাতীয় সরকার" ব'লে বিবেচনা করতেন এবং একটি জাতীয় বুর্জোয়া সরকারের কাছে যতটুকু আশা করা যায় তিনি এই সরকারের কাছ থেকে সেইটুকু আশা করতেন।

এই সময়ে সাহিত্য-সম্পর্কিত রবীন্দ্র গুপ্তের "থিসিস" নিয়ে পার্টির মধ্যে বেশ বিতর্ক উঠেছিল। ডক্টর দত্ত এই ব্যাপারটিকে ছেলে-খেলা ব'লে উপহাস করতেন। নীতিনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র গুপ্তের অবস্থানের বিরুদ্ধে নির্ভীক ও আদর্শগত বক্তব্য উপস্থিত করতে আমাকে তিনি উৎসাহ দিতেন। ঠিক এর অব্যবহিত পরেই আমি "স্বাধীনতার সংগ্রামের বাঙলা" নামক বইয়ের খসড়া প্রস্তুত করি। এই খসড়া ছিল একদিকে আত্ম-সমালোচনা এবং আর একদিকে রবীন্দ্র গুপ্তের মতের সমালোচনা। এই বই লিখতে ও প্রকাশ করতে ডক্টর দত্তের কাছ থেকে আমি যে প্রেরণা পাই তা এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

উপসংহারে বলতে চাই, আচার্য ভূপেন্দ্রনাথের চরিত্রের কয়েকটি দিক আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল।

তার প্রথমটি, মার্কসবাদের শিক্ষার প্রতি তাঁর আনুগত্য ও নিষ্ঠা। তিনি ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বিবর্তনের ও বিকাশের একটি মার্কসবাদী বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করার জন্য আজীবন সাধনা করেন। তাঁর লিখিত—"Studies in Indian Social Polity", Dialectics of Hindu Ritualism, "ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি" (কয়েক খণ্ড) এই বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করছে। ভারতের ভূমি-সমস্যার বিচার—তিনি তাঁর গবেষণার আর একটি ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান "Dialectics of Land Economics of India." ভারতীয় রাজনীতির বিকাশ, বিশেষ ক'রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অধিকতর বিপ্লবী ধারা

সম্পর্কে রচিত তাঁর পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি একটি বড় সম্পদ। তাঁর বই 'দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' (১৩৫৬) (এই বইয়ের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়) এবং "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" (১৩৬০) স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের দুটি আকর-গ্রন্থ বলা চলে। এই বই দু'খানি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের অধিকতর বিপ্লবী ধারার ওপর বিশেষ আলোকপাত করেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও মার্কসবাদের প্রয়োগে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। 'সাহিত্যে প্রগতি' ও 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব'—তাঁর এই বই দু'খানিতে মৌলিকত্বের ছাপ রয়েছে।

বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশের পটভূমিকায়, এবং গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে, তাঁর গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজ সংশোধন করা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞান-সাধনার মূল্য চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। কেননা, সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে তিনি ছিলেন পুরোধা। এবং তাঁর গবেষণার মূল ধারাটি যে ছিল সঠিক—কালের আলোকে তা আরও ভালোভাবে প্রমাণিত হতে চলছে।

তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক—যা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ক'রেছিল তা হ'ল গবেষক হিসাবে তাঁর অক্লান্ত সাধনা। দেশের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শগত তাগিদের দিকে তাকিয়ে, শ্রমিক ও কৃষক জাগরণের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তিনি গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতেন। তাই ব'লে তিনি গবেষকের স্বধর্ম থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। তিনি বলতেন—ডুবুরী যেমন রত্নরাজির খোঁজে সমুদ্রের গভীরে ডুবে যায়, তেমনি গবেষকদেরও প্রধান কাজ প্রামাণিক সূত্রের (Primary Source) সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা। তাঁর প্রত্যেকটি বইয়ের বিশেষত্ব ও মূল্যও এইখানে—যে তাঁর বইগুলির মালমশলা প্রামাণিক সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আর একটি বিষয় যা আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল তা হল—ডক্টর দত্ত ছিলেন নিপীড়িত মানুষের পরম আত্মীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকের মত সংগ্রামের কিনার থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে চলা—এ ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াইয়ের ময়দানকেই জীবনের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। অস্ত্র নিয়ে যারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল হাতে কলম নিয়ে তিনি তাদেরই পাশে এসে

দাঁড়িয়েছিলেন। জাগতিক সম্মানকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে একজন জ্ঞানতাপস কিভাবে স্বাধীনতা ও বিপ্লবের সৈনিক হিসাবে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে পারেন—তার এক অতি বিরল দৃষ্টান্ত : আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ।

কিউবা বিপ্লবের তাৎপর্য

ভানুদেব দত্ত

বিশ্বের প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব হল রুশ বিপ্লব। এটি সংঘটিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী যুগে। আর কিউবা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে যে যুগ, শুরু হয়েছিল রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে রুশ বিপ্লবের তাৎপর্যমণ্ডিত গতিপথে কিউবা বিপ্লবের সাফল্য এসেছিল।

কিউবা পশ্চিম গোলার্ধের একটি দেশ হওয়ার ফলে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে আরো বেশী। কিউবা বিপ্লব লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে জোয়ার সৃষ্টিতে এবং তাদের চেতনার স্তরকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এক ভাস্বর দৃষ্টান্ত স্থাপন ত' বটেই, উপরন্তু এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই বিপ্লব এই অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসি-পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে অনেক শক্তিশালী করেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এই বিপ্লবের সাফল্য মাওবাদী তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছে। একদিকে রুশ বিপ্লবের প্রভাব এবং অন্যদিকে তার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি'—এ দুইই কিউবা বিপ্লবের মধ্যে দেখা গেছিল।

বিরুদ্ধ প্রচার

রুশ বিপ্লব সাফল্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কি অতিবাম হঠকারী শক্তি বা কি দক্ষিণপন্থী শক্তি—এদের তরফ থেকে এর তাৎপর্যকে খাটো করার এক জোর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিউবা বিপ্লবের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি এবং এর সাফল্য ও তাৎপর্যকে খাটো করার এক হীন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।

কারো মতে কিউবা বিপ্লব একটি "মতাদর্শশূন্য বিপ্লব" এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক "বিশেষ ধরনের সমাজতন্ত্র।" বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এদের প্রচেষ্টা হল সকলকে মতাদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং "মতাদর্শ পরিহারের

তত্ত্ব" প্রচার করা। এদের বক্তব্য হল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সূত্রায়িত সমাজ বিকাশের নিয়ম ছাড়াই এই বিপ্লব সমাধা হয়েছে।"২ এ যেন এক আকস্মিক ঘটনা—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এবং কয়েকজন সাহসী মানুষের উপর ভিত্তি করেই তা সমাধা হয়েছে।৩ কারো মতে কিউবা বিপ্লবে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী বা বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বসূরী পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টির কোন ভূমিকা ছিল না। এমন কি কোন গণ আন্দোলনেরও সম্পর্ক ছিল না। আবার কেউ কেউ এমনও দাবী করেন যে কিউবা বিপ্লবে ট্রটস্কির স্থায়ী বিপ্লব তত্ত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে।৪

কিন্তু প্রকৃত তথ্য এর কোনটারই যৌক্তিকতা প্রমাণ করে নি। এই বিপ্লব কিউবার সামাজিক জীবনের বাস্তবতা-বিচ্ছিন্ন কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিস্ময় নয়। বিশ্বজুড়ে পরস্পর বিরোধী দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে সংগ্রাম—কিউবা বিপ্লব তারই এক অংশ। মানবসমাজের ইতিহাসের নিয়মের সঙ্গে তাল রেখে কিউবার বিপ্লবীদের তরফ থেকে যে সচেতন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কিউবা বিপ্লবের সাফল্য তারই এক ফলশ্রুতি। এই বিপ্লবের তাৎপর্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন : (ক) বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা ; (খ) রুশ বিপ্লব পরবর্তী যুগের প্রভাব ; (গ) বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্বশর্ত ; (ঘ) শ্রেণী শক্তির বিন্যাস। আলোচনার এই পদ্ধতি কিউবা বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করবে।

বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা

কিউবা বিপ্লবের উৎস ও ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই স্বীকার করেছেন, "এই সংগ্রাম চলেছে প্রথমে স্পেনীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং তারপরে, গত শতাব্দীর শেষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব-বন্ধনের বিরুদ্ধে, তখন জাতীয় মুক্তি অর্জনের ব্রতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের উপরে মানুষের শোষণ নিশ্চিহ্ন করার ব্রত।৫ অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারা, বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা এবং যার বিকাশপথে এল সমাজতান্ত্রিক ধারা—এই তিন ধারারই অস্তিত্ব কিউবার বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় ছিল। তবে এই ধারাগুলি যে একটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটা এসেছে, তা নয়। এ কোন ক্রমাগতিক ধারা বিবর্তন নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কিউবায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল। অন্যান্য দেশের মতোই এই আন্দোলনের এক দ্বৈত চরিত্র ছিল। ফলে সামন্তবাদ ও স্পেনীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ সংগ্রাম করার বোধ জাগ্রত হয় নি। কিন্তু কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পরই কিউবা মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে এক অধিকতর বিপ্লবী ধারা দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত এরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দী অতিক্রম করে সমাধান খুঁজতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের দাসত্ববিরোধী সংগ্রাম, ১৮৬৮-৭৮ সালের দশ বছরের সংগ্রাম, স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ প্রভৃতি হল এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সামন্তবাদ ও স্পেনীয় উপনিবেশবাদ উভয়েরই বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি পরিচালিত ছিল। কিউবার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে এগুলি ছিল বিপ্লবী গণতন্ত্রের ধারা।

বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনের অভ্যন্তরে এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারার অস্তিত্বের কথা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন উল্লেখ করেছিলেন। ফরাসী, পোল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, চীন প্রভৃতি দেশের মুক্তি আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিপ্লবী গণতন্ত্রের ধারার অস্তিত্ব তাঁদের বিভিন্ন লেখায় উল্লিখিত রয়েছে। এঁরা কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি এবং সেই কারণে এই ধারাকে সমর্থন জানানোর কথা তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে অধিকতর বিপ্লবী ধারার জন্ম কিউবার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল এবং জোসে মার্তি ছিলেন এর প্রবর্তক।

জোসে মার্তি যে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তার নাম ছিল কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এটি তৈরী হলেও, এতে মার্কসবাদী, কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রী ও নৈরাজ্যবাদী সকলেই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা শুকিয়ে গেলেও, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তর্নিহিত এক স্রোত ছিল এবং এই স্রোত আবার জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হয় ফিদেল কাস্ত্রোর আমলে।

মার্তির মৃত্যুর পর কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি থেকে কয়েকটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক অংশ মার্কসবাদের পথে যায় এবং ১৯২৫ সালে গঠন করেন পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টি। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে দ্বৈর বিরোধ বর্তমান, তার স্পষ্ট স্বীকৃতটা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করা অথবা প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিকতার জন্য বা

বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রাম চালানো—এটাই হল মার্কসবাদের শিক্ষা। কিউবার কমিউনিস্টরাও তাই করেছিল। ত্রিশ দশকে কিউবা যখন সংকট জর্জর, মানুষের বিক্ষোভ যখন চরমে, ধর্মঘট সংঘটিত হচ্ছে সর্বত্র—সে সময় সমস্ত সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে কিউবার কমিউনিস্টরা এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল।

কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি থেকে দ্বিতীয় যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার মধ্যে ছিল উদারনৈতিক পেটিবুর্জোয়া অংশ যারা ১৯৪৬ সালে কিউবান পিপলস্ পার্টি (অর্থোডক্স পার্টি নামেও এটি পরিচিত) গঠন করেন। তৃতীয় অংশটি রয়ে গেল প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে।

এই তিনটি অংশের মধ্যে দ্বিতীয় অংশ থেকে ১৯৫৩ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে একদল বেরিয়ে এসে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিল। এঁরা ছিলেন যথার্থভাবে জোসে মার্তির ঐতিহ্যবাহী উত্তরপুরুষ। এঁরা ছিলেন বস্তুতঃ বিপ্লবী গণতন্ত্রী।

কিউবার মার্কসবাদীদের সঙ্গে এই সব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের গভীর মৈত্রী ছিল। মার্কসবাদীরা এই সব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বিভিন্ন ব্যাপারে সমর্থন করত। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর শিক্ষাও ছিল তাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন, মালিকানার প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরা এবং গণতন্ত্রী পার্টিগুলির সঙ্গে ঐক্য ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কাজ করা—কিউবায় কমিউনিস্টরা ঠিক তাই করেছিল। মার্কসবাদী ব্যক্তিদের সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর যে যোগাযোগ ছিল, তার কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।৬ এদের সংস্পর্শে আসার ফলেই এই সব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে সামান্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এরই ভিত্তিতে তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল—কিউবার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট কত গভীর এবং এর সমাধানের রাস্তাই বা কি।

এইভাবে কিউবার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকা সত্ত্বেও, এর মধ্যে বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জের অবস্থান হেতু বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ছিল কিউবার বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিষয়ীগত দিক।

বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে স্থানীয় বুর্জোয়া ও জমিদার সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংমিশ্রণের ফলে কিউবায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে যে সান্নিধ্য ঘটেছিল, তা ছিল কিউবার বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিষয়গত দিক।

উভয় স্তরের মধ্যে এই সান্নিধ্যের ফলে, কিউবার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা দানা বেঁধেছিল। কিউবা বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তার দ্রুত বিকাশ। এই ঘটনারই স্বীকৃতি মিলবে কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৭৫) গৃহীত কর্মসূচীতে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণতান্ত্রিক স্তর ও সমাজতান্ত্রিক স্তরকে একই প্রক্রিয়ার অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়েছে।৭

রুশ-বিপ্লব পরবর্তী যুগের প্রভাব

কিউবা বিপ্লব সফলতা অর্জন করেছে এমন এক যুগে যার মর্মবস্তু হল—পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। লেনিনের শিক্ষা হল—মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য যুগের প্রভাব অনেকাংশে কাজ করে এবং এ দুটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যুগের প্রভাবের অর্থই হল যুগের মর্মবস্তু ও কেন্দ্র স্থলে রয়েছে যে শ্রেণী তার প্রভাব।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর বিশ্বে যে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল, তার প্রভাব কিউবায় দুভাবে পড়েছিল। প্রথমত, এই ঘটনা বা এই যুগ কিউবা মুক্তি আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ধারাকে উজ্জীবিত করেছিল। ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই বলেছেন—১৯১৭ সালের গৌরবময় অক্টোবর বিপ্লব এমন এক ঘটনা, যা কিউবার ভাগ্য নির্ধারণে এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়ত, এর প্রভাব পড়ে কিউবান রেভলিউশনারী পার্টির অন্তর্গত অধিকতর বিপ্লবী ধারার অনুসারীদের উপর এবং এই প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল এক সমাজতান্ত্রিক ধারা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯২০ সালে হাভানায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স' কংগ্রেসে রুশ বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা, ১৯২১-২২ সালে "রাশিয়াকে রক্ষা করো" এই নামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু কমিটি গঠন, ১৯১৮ সালে সোশ্যালিস্ট এসোসিয়েশনের নতুন উদ্যমে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শুরু এবং ১৯২৩ সালে কমিউনিস্ট এ্যাসোসিয়েশন

নাম গ্রহণ যার ফলশ্রুতিতে ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ইত্যাদি ঘটনা এই দুই ধারার অস্তিত্বেরই প্রমাণ।

লেনিনের অপর শিক্ষা হল—বিশ্বের যে কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলেই যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, তাকে সেই যুগের প্রধান বিরোধের আলোকেই দেখা উচিত। কিউবার ক্ষেত্রে একথা বলা চলে যে বিশ্বজুড়ে দুই বিপরীত সমাজব্যবস্থার যে সংগ্রাম চলছিল, তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কিউবার বিপ্লব সাফল্য অর্জন করেনি। সফলতা অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতির দরুন যা গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক শক্তির নিয়ামক ভূমিকা অর্জনের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে শক্তি বিন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি ও ভূমিকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার প্রভাব কিউবার উপর সমসাময়িক কালে পড়লেও, অন্যান্য দেশের তুলনায় কিউবা ও লাতিন আমেরিকাতে তার ব্যাপ্তি ও ক্ষিপ্রতা কম ছিল। ১৯৫৩ সালে মনকাড়া দুর্গ অভিযান কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শক্তি এবং কিউবার মাটিতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যোগাযোগ কম ছিল।

কিউবার স্বৈরতন্ত্রী শাসন উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো মন কাড়া দুর্গ দখলের যে অভিযান সংঘটিত করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছিল, একথা ঠিক। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, সেই অভিযানে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে, তা হলে সেই সাফল্য কতদিন ধরে রাখা যেত বলা মুস্কিল। ফিদেল কাস্ত্রোর স্বীকারোক্তির মধ্যেই এই আশংকা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি ১৯৫৩ সালে বাতিস্তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতাম, তবে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উৎখাত করতে সক্ষম হত। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। তাছাড়া এটা মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রধানত মোক্ষম সাহায্য দেয় কিন্তু ১৯৫৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরনের সাহায্য দিতে সক্ষম ছিল না। এটা আমার অভিমত।"৮

আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতির প্রভাব কালের অগ্রগতিতে জাতীয় পরিস্থিতির উপর বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই কিউবা বৈপ্লবিক আন্দোলনের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছিল। এই অনুকূল পরিস্থিতি হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ামক ভূমিকা অর্জন।

১৯১৭ সালের পর যে নতুন যুগ শুরু হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই চরিত্র প্রাপ্তিতে তা এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে। কিউবা বিপ্লবের উপর এর এক অনুকূল প্রভাব পড়ে।

আবার কিউবা বিপ্লব টি'কে থাকার পিছনেও যে আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতি কাজ করছে, এটা ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই স্বীকার করেছেন। ১৯৬২ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ গড়ে তুললে, কারা সে সময় কিউবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে সমস্ত দেশের নাম করেছিলেন, তা হল—"সোভিয়েত-ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, বিশ্বের শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রসমূহ।...

"কেউ কি বলতে পারে যে এই সাহায্য ছাড়া কিউবার বিপ্লব মার্কিন অবরোধ ও মার্কিন বিরোধিতা কাটিয়ে উঠতে পারত।..."আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংহতি ছাড়া কিউবার বিপ্লব টি'কে থাকতে পারত না।"৯

বৈপ্লবিক-আন্দোলনের পূর্বশর্ত

সমাজ বিকাশের যেমন একটা বিজ্ঞান রয়েছে, তেমনি সামাজিক বিপ্লবেরও একটা বিজ্ঞান রয়েছে। এটা কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব হয় না। আবার সব বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিপ্লব সৃষ্টি করে না। এর জন্য বিষয়গত উপাদানগুলির সঙ্গে বিষয়ীগত উপাদানগুলিও বিবেচ্য। এ দুয়ের সমন্বয় না ঘটলে বিপ্লব শুরু হতে পারে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ীগত পরিস্থিতি এক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে বলেই কিউবা বিপ্লবের সাফল্য ঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে দেশেই সংঘটিত হোক না কেন—এক সাধারণ সূত্র অনুসারেই তার বিকাশ ঘটে। এটাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। তবে সেই দেশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে সংযোজিত হয় যা নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, জনগণের চেতনার বিকাশ এবং অতীত ঐতিহ্য দ্বারা। লেনিন বলেছেন—এটা অনিবার্য যে প্রতিটি রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে। কিন্তু সকলেই একই ভাবে পৌঁছবে না। শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের ধরণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে.....প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কিছু অবদান রাখবে।১০

সেজন্যই দেখি অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও কিউবা বিপ্লবের মধ্যে সাধারণ সূত্রের দিক থেকে অভিন্নতা থাকলেও, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্নতা রয়েছে। কিউবা বিপ্লব ঘটেছিল—মধ্যবর্তী স্তরের এক পুঁজিবাদী দেশে। এর অর্থনীতি ছিল একপেশে ও কৃষি নির্ভরশীল। কিউবার শিল্প গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র চিনি শিল্পকে কেন্দ্র করে। এর বিকাশ ঘটেছে শ্লথ গতিতে। কৃষিক্ষেত্রে যেমন বৃহৎ জমিদারীর আধিক্য রয়েছে, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির অস্তিত্বও রয়েছে। যেটুকু শিল্পায়ন সেখানে হয়েছে, তা হল পর-নির্ভরশীল শিল্পায়ন। কিউবার বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুর। সুতরাং কিউবা বিপ্লবের সাফল্যে এরাও অনেকখানি অবদান রেখেছিল। প্রাক বিপ্লবী কিউবা রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল—বুর্জোয়া-লাতিফুন্দিয়া-নয়া উপ-নিবেশবাদী রাষ্ট্র।

একথা ঠিক যে, কিউবায় পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। তা সত্ত্বেও সেখানে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এটা কোন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, তা নিয়ম-মাফিকই হয়েছিল। যারা পুঁজিবাদের পূর্ণ পরিপক্কতা অর্জনকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করার পূর্বশর্ত বলে মনে করেন, কিউবার দৃষ্টান্ত তাদের চোখ খুলে দেবে। মার্কসবাদে যারা বিশ্বাসী তারা কখনই এটাকে সঠিক বলে মনে করেন না, বরং যা মনে করেন তা হচ্ছে সর্বনিম্ন এক পূর্বশর্ত। সর্বনিম্ন পূর্বশর্ত-গুলি হচ্ছে—(১) উৎপাদিকা শক্তির নির্দিষ্ট মাত্রার বিকাশ; (২) সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈরীতার একটি নির্দিষ্ট স্তর; (৩) সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জকে পরিচালনা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা। বিশ্বের অনুকূল পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পূর্বশর্তগুলির গুরুত্ব জাতীয়ক্ষেত্রে আরো খানিকটা কমে গেছে।১১ কমে যাচ্ছে বলেই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে ক্রমেই বেশী বেশী করে সান্নিধ্য ঘটছে। কিউবার ক্ষেত্রেও এই জিনিষ ঘটেছে।

এই বিপ্লব সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বসূরী পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ব্লাস রোকা উল্লেখ করেছেন যে, এটি "এমন এক বিপ্লব যাকে উঁচুস্তরের গণবিপ্লব নামে অভিহিত করা যেতে পারে।১২ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী শ্রেণীশক্তি, বিপ্লবের চালিকাশক্তি এবং এতে 'র‍্যাডিকেল'

পন্থা ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কিউবা বিপ্লব গণ বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটি কিছু যুবকের কার্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এতে যেমন গেরিলা যুদ্ধ ছিল, তেমনি ছিল শ্রমিক আন্দোলন এবং সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ। এগুলি পৃথকভাবে সংঘটিত হলেও, এগুলির একই লক্ষ্য ছিল—বাতিস্তা স্বৈরতন্ত্রের অবসান। শেষপর্যন্ত এই আন্দোলনগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল বলেই, লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

বিপ্লবের এই গণভিত্তির মূলে ছিল সেখানকার উপনিবেশবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শ্রমিক আন্দোলনের এক বিরাট ঐতিহ্য যা সেখানে গড়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। বিপ্লবের এই গণভিত্তি প্রসঙ্গে চে গুয়েভারা উল্লেখ করেছেন,…বাতিস্তার শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র অথচ আত্মোৎসর্গীকৃত এক বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে পরাজিত করা যে সম্ভব হয়েছিল তার কারণ হল এই বাহিনী ব্যাপক জনগণের সমর্থন পেয়েছিল।

শ্রেণীশক্তির বিন্যাস

কিউবা বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিল জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও লাতিফুন্দিয়াবিরোধী. বিপ্লবের ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদনে যারা এগিয়ে এসেছিল, সে সম্পর্কে ব্লাস রোকা বলেছেন—যে সমস্ত সামাজিক শ্রেণী বাস্তব দিক দিয়ে এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে আগ্রহী, তারা হল শ্রমিক, কৃষক, শহরের মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়া। কিন্তু যারা বিপ্লবকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ বিপ্লবের যারা চালিকাশক্তি তারা হল প্রধানত শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক ও শহরের ক্ষুদে বুর্জোয়াদের সংস্কারকামী অংশ।১৪ ব্লাস রোকার এই মন্তব্যের মধ্যে বিপ্লবী ফ্রন্টে সমাবেশের ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া স্থান পেয়েছে। তবে প্রধান ভূমিকা নেওয়ার প্রশ্নে তিনি জাতীয় বুর্জোয়াকে বাদ দিয়েছেন এবং শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াকে সেই স্থান দিয়েছেন। ফিদেল কাস্ত্রোও কিউবার বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানকারী শক্তিগুলির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণী…কৃষক সম্প্রদায় ও মধ্যবর্তী স্তরের জনগণের সঙ্গে গভীর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।১৫

শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ার দ্বারা পরিচালিত বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক

যারা কেবল বাতিস্তা শাসনের একনায়কত্বেরই অবসান ঘটাতে চায় নি, তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে গেল। ফলে, "যে পুরাতন ও বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠী তখন পর্যন্ত সময়ে সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখত, তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের সমগ্র শক্তি একত্রিত করল এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে দিল; নতুন শিল্প-মালিক, বুর্জোয়া এবং মধ্যবর্তীস্তরের একাংশ বিপ্লব বর্জন করল। তাঁরা হয় সোজাসুজি বিশ্বাসঘাতকতা করল অথবা বিপ্লবকে সংস্কারবাদের দিকে চালিয়ে তার 'ডানা কেটে দেওয়ার' চেষ্টা করতে লাগল। যারা প্রথমে সমর্থন জানিয়েছিল, সেই বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পরে দলত্যাগ করে প্রতিবিপ্লবী দেশত্যাগীদের শিবিরে ভিড়ে গিয়েছিল।১৬

শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ারা বিপ্লবের চালিকাশক্তি হলেও, দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, ক্ষেতমজুরেরা সংখ্যায় বেশী থাকায় শিল্প শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয়ত, এই চালিকাশক্তিগুলির মধ্যে নেতৃত্ব ছিল পেটিবুর্জোয়া বামপন্থী অংশের হাতে।১৭ এই অংশ বিপ্লবের পরে ১৯৫৯-১৯৬১ এই সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেও নেতৃত্ব দিয়েছিল।

বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্ব অথবা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ব্যতীত অপর কোন নেতৃত্ব দ্বারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য অর্জন করা যায় না। এটাই হল নতুন যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য। এই নতুন যুগে এই সাফল্য কিউবায় এসেছিল বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে।

এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি সৈন্যদলকেও সংগঠিত করেছিল এবং এক বিপ্লবী সৈন্যদল গড়ে তুলেছিল। এই বিপ্লবী সৈন্যদল বস্তুতঃ ছিল "বিপ্লবের জীবন।" এটি একদিকে যেমন সমস্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্র ছিল, অন্যদিকে এটি ছিল শ্রমিক, কৃষক, শহুরে মধ্যবর্তী সম্প্রদায় এবং সর্বশেষে সমগ্র জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার এক চাবিকাঠি। কিউবায় যে ধরনের সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল সশস্ত্র জনগণের গণতন্ত্র।১৮ সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা ও আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য একদিকে যেমন সমগ্র জনগণকে সামরিক শিক্ষায় তৈরী করা হয়েছিল,

অন্যদিকে তাদেরকে নিয়েই 'বিপ্লবকে রক্ষা করার কমিটি' তৈরী হয়েছিল। এদের কাজই ছিল "বিপ্লবকে রক্ষা করা, ব্যাপক জনগণের মতাদর্শগত বিকাশ মাত্রাকে উন্নীত করা এবং অকুণ্ঠ চিত্তে সামাজিক কর্তব্য পালন করা।"১৯

সর্বহারা একনায়কত্বের এক অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল কমিউনিস্ট পার্টির গঠন ও তার নেতৃ ভূমিকা প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৯ সালের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি অন্য নামে থাকলেও তার এক সহযোগী ভূমিকা ছিল। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এমনই অপ্রতিরোধ্য শক্তি এবং মানব প্রগতির এমনই নির্ধারক ভূমিকা যে বিপ্লবের পরে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি কমিউনিস্ট আন্দোলনে সামিল হয়। এর ফলে ১৯৬৫ সালে কিউবায় যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হল তা সমস্ত বিপ্লবী এবং জনগণের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সচেতনতার ফলশ্রুতি। কিউবা বিপ্লবের তিনটি ধারা—ফিদেল কাস্ত্রোর ২৬শে জুলাই আন্দোলন, কমিউনিস্টদের পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টি ও "বিপ্লবী ডিরেক্টরেট" —এগুলির মিলনের ফলেই জন্ম নিল কমিউনিস্ট পার্টি।

পরিশেষে

কিউবার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এবং দ্রুত সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল নিম্নলিখিত তিনটি কারণের জন্য। প্রথমত, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা২০; দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তৃতীয়ত, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শক্তির আনুকূল্য। বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক শক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য, কালের অগ্রগতিতে ও অভিজ্ঞতার আলোকে সেই শক্তির বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অবস্থানে উত্তরণ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মঞ্চে সমস্ত বিপ্লবী শক্তির একীকরণ—এই হল কিউবা বিপ্লবের তাৎপর্য।

গ্রন্থপঞ্জী :

(১) Left.—wing Communism—An infantile Disorder—Lenin Collected Works, Vol 31, P 21

(২) কিউবার বিপ্লব—লাতিন আমেরিকার জনগণের সংগ্রামে এক গুণগত অগ্রগতি। 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'—ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯, পৃঃ ৭২

(৩) ঐ

(৪) International Socialist Review, New York, March-April 1968—The Cuban Revolution and its Lessons by Hugo Gonzalez Moscoso—The Cuban revolution is a living example of how the Trotskyist theory works in reality.

(৫) কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (১৯৭৫)।

(৬) Daily Review (1. 11. 78)—Published by Novosti Press Agency. Moscow. An interview by Fidel Castro given to Kommunist special correspondent O. Darusenkov. Fidel said, "I maintained excellent relations with all the communist leaders at the University...I had the most intimate relationship with representatives of the Popular Socialist Party."

(৭) The Marxist-Leninist Teaching of Socialism and the world today—P 205 quotes the programme as " in the epoch of imperialism there is no insuperable barrier between the people's democratic, anti-imperialist and the socialist stages. Both are components of a single process."

(৮) কিউবার বিপ্লব—লাতিন আমেরিকার জনগণের সংগ্রামে এক গুণগত অগ্রগতি। 'আমি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'—ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯, পৃঃ ৭২

(৯) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কিউবার বিপ্লব। ঐ—জানুয়ারী ১৯৭৭, পৃঃ ২১

(১০) A caricature of Marxism—Lenin Collected Works, Vol 23, P 69-70.

(১১) The World Communist Movement, Moscow P 112-13

(১২) The Cuban Revolution—Blas Roca, New Age, December, 1960.

(১৩) Ernesto Che Guevara by I. Lavretsky, Progress Publishers Moscow P 146.

(১৪) The Cuban Revolution—Blas Roca, New Age, December, 1960

(১৫) Daily Review (22.3.74)Published by APN—The experience of the Cuban Revolution by O, Tikhonov.

(১৬) সমাজ বিজ্ঞান, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান আকাদেমী, সংখ্যা

৪, ১৯৭৩ ; অধ্যায়—লাতিন আমেরিকা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—ভি. ভোলস্কি)

(১৭) Socialism---Theory & Practice, January 1979—Lessons of the Cuban Revolution by Oleg Darusenka—Due to specific conditions prevailing in the country the vanguard role in the mounting revolutionary struggle against the dictatorship was played by radical sections of the petty bourgeoisie, P 86

(১৮) The Marxist-Leninist Teaching of Socialism and the World today, P 216

(১৯) কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (১৯৭৫)

(২০) Socialism---Theory & Practice, January 1979. Lessons of the Cuban Revolution by Oleg Darusenkov,P 68.

বিপ্লব সাধনায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে যা পেয়েছি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবর্তনে এবং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে তাঁর বহুমুখী অবদানগুলির কথা স্মরণ করা হচ্ছে। দেরীতে হলেও এহেন প্রচেষ্টার অনেক দিক দিয়ে মূল্য আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ডঃ দত্তের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে যা শিখেছি এবং কয়েক দশকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় সেই শিক্ষাকে যাচাই করে একটা কথাই বারবার মনে হয়। আমরা যারা মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং সেই বিশ্বাসের আলোকে এদেশে অর্থনৈতিক সামাজিক- রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সংগ্রামের সৈনিক রূপে কাজ করে চলেছি তাদের পক্ষে ডঃ দত্তের অবদানগুলিকে নতুন করে বোঝার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁর মতামতের সব কিছুই যে অভ্রান্ত বা অপরিবর্তনীয় এমন কথা নিশ্চয় বলি না। কিন্তু তাঁর সমস্ত কৃতির মধ্য দিয়ে যে মূল দৃষ্টিভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে সেটিকে যদি সময়মত বোঝার চেষ্টা হত তাহলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে অনেক ভুলভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব হত। আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে যেসব জটিল, কঠিন, বহুমুখী সমস্যা দেখা দিয়েছে তার যথাযথ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিতে যে সাহায্য হত, এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

নানা অসুবিধার দরুন ঠিক এই মুহূর্তে একটি বিশদ আলোচনায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই মূল কয়েকটি দিকের সংক্ষিপ্তসার মূল্যায়নের পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

১। ডঃ ভূপেন দত্ত যখন সুদীর্ঘ প্রবাসজীবনের পর এদেশে ফিরে আসেন সেই সময়ে এখানে সমগ্রভাবে জাতীয় আন্দোলনে এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী তরুণদের মধ্যে হৃদয়াবেগ ও রোম্যান্টিক স্বপ্নচারণের মনোভাবই প্রবল ছিল। মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের সঙ্কল্পে তারা অধীর অথচ কোন পথে কিভাবে সেদিকে এগোলে সাফল্য অর্জন করা যাবে সে চিন্তাভাবনা বিশেষ করা হত না। একেবারেই করা হত না তা নয়। চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে তবে তার মধ্যেও

স্বপ্রচারিতারই প্রাবল্য। স্বাভাবিকভাবেই ডঃ দত্তকে কর্মক্ষেত্রে নামার পর একদিকে যেমন জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করতে হয়েছে তেমনি সেই সঙ্গে পেটিবুর্জোয়া রোম্যান্টিক বিপ্লববাদেরও কঠোর সমালোচনা করতে হয়েছে। ফলে তাঁকে যুগপৎ জাতীয় আন্দোলনের দক্ষিণ ও বাম উভয় অংশেরই নেতাদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। বিপ্লবী দলগুলির নেতারা তাঁর উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। একদিকে তাঁর পিছনের বিরাট বৈপ্লবিক ঐতিহ্য অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা—এই দুটি নাহলে তাঁর পক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে টিকে থাকাই কঠিন হত। অথচ তিনি যদি স্রোতে গা ভাসাতেন তাহলে সহজেই মস্তবড় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করা সহজ ছিল।

যে সময়ের কথা বলছি তখন জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের এক অংশ কমিউনিস্ট মতাদর্শের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে অথচ তাঁরা রোম্যান্টিক বিপ্লববাদের পিছুটানও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই সব তরুণদের অনেকে ডঃ দত্তের সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত তাঁর নিরাড়ম্বর নিরহঙ্কার আচরণ, সকলের সঙ্গে সহজভাবে আলোচনা ও যুক্তি দিয়ে বোঝাবার প্রবণতা। দ্বিতীয়ত, তরুণদের মধ্যে যাঁরা চিন্তার নতুন খোরাক পেতে উদগ্রীব ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে অনেক কিছু পেতেন। আমিও ছিলাম এই দলে। প্রথম পরিচয় ১৯২৮ সালে, পরে ১৯৩০ সালে কলকাতায় আসার পরে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। তখন আমার চিন্তা আজকার তুলনায় অনেক অপরিণত। তবু পিছনের দিকে তাকিয়ে হিসেব নিকেশ করলে দেখি দুটি এমন জিনিস পেয়েছি যা পরবর্তীকালে মূল্যবান পাথেয় রূপে কাজ করেছে। একটি হল মনের critical outlook-এর বিকাশ অর্থাৎ সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে বোঝার, যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতা। অপরটি হল নিজের দেশের নানা সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাকে তলিয়ে বোঝার প্রয়োজনীয়তা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ১৯৩২ সালে তিনি আমাকে বলেছিলেন 'অস্পৃশ্যতা' কিভাবে আমাদের দেশের সমাজে এসে জাঁকিয়ে বসেছে তার পিছনের সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলি নিয়ে গবেষণা করলে তিনি সাহায্য করবেন। বলা বাহুল্য যে তিনি অ্যাকাডেমিক গবেষণার কথা বলেন নি।

১৯৩২-১৯৪৫ পর্যন্ত ডঃ দত্তের সঙ্গে আমার যোগাযোগে ছেদ পড়েছিল। সুদীর্ঘ জেল জীবনের শেষের দিকে যখন পড়াশুনার কিছু সুযোগ পেয়েছি তখন ১২ বছর আগেকার সেই উপদেশের কথা বিশেষভাবে মনে পড়েছে। বন্দী-জীবনের সীমাবদ্ধ সুযোগ সুবিধার মধ্যেও ভারতবর্ষের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যত সামান্য উপাদান পেয়েছি সেগুলিকে খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টাই করেছি।

ডঃ দত্তের সঙ্গে আমার যোগাযোগের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৪৫-১৯৪৮। আগে যা পেয়েছিলাম সেটুকু এই সময়ে আরো মূর্তভাবে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করার সুযোগ হয়েছে। আমি দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে নেপালীভাষী চা-শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরূপে কাজ করতে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি দার্জিলিং এর সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেন। আমিও যতটুকু বুঝেছিলাম জবাব দিই। শুনে তিনি যা বলেন সেটা আজও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন 'ওখানে যেয়ে তো শুধু ট্রেড ইউনিয়ন করলে চলবে না। যে জনসমষ্টির মধ্যে কাজ করতে চলেছো তাদের ভাষা, ইতিহাস, সাংস্কৃতিক এবং মানসিকতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে হবে। নতুবা এগোতে পারবে না।'

ডঃ দত্তের উপদেশ অনুসরণ করে এক বছরের কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অধ্যয়নের ফলশ্রুতি স্বরূপ লিখিত "গোর্খা জাতির জাগরণ" শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র অধুনালুপ্ত "স্বাধীনতা" পত্রিকার ১০ই আগস্ট ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে কলকাতায় এসে যখন দেখা করি তখন জানতে পারি প্রবন্ধটি তিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন। তিনি বলেন 'তুমি ঠিকই ধরেছো। জাতি-সমস্যা আমাদের দেশের বিপ্লবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। এবিষয়ে কাজ চালিয়ে যাও'। তখন থেকে এ যাবৎ সীমিত শক্তিকে একক চেষ্টায় এই বিষয়ে যৎসামান্য যেটুকু করতে পেরেছি তাঁরই প্রেরণায়। আজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় ডঃ দত্তের দূরদৃষ্টির কথা। দুঃখের বিষয় ভারতের মার্কসীয় পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে সমস্যাটিকে অবহেলা করে এসেছেন।

ডঃ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগে আবার ছেদ পড়ে ১৯৪৮-১৯৫২ পর্যন্ত। ১৯৫২ সালের পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা করতে

গিয়েছি। নানা কর্মব্যস্ততার দরুণ বেশি সম্ভব হয় নি। তবু এখনও প্রেরণা পেয়েছি বিশেষভাবে উপজাতিদের জীবন ও সমস্যা সম্বন্ধে অধ্যয়নের কাজে। এসম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে বলার আছে। অনেক বন্ধুর সাথে কথা বলে দেখেছি উপজাতি-সমস্যা অধ্যয়ন বলতে তাঁরা বোঝেন নৃ-তাত্ত্বিক অধ্যয়নের কথা, তাও মূলত অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। আমি নৃ-তত্ত্বের ছাত্র নই। সুতরাং আমার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজেরই সংশয় ছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন ডঃ দত্ত। সকলেই জানেন যে, তিনি ছিলেন নৃ-তত্ত্বের খ্যাতনামা পণ্ডিত। কিন্তু তিনি আমাকে অ্যাকাডেমিক অধ্যয়নের কথা আদৌ বলেন নি। স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন 'ভারতের বিপ্লবে উপজাতিদের স্থান, ভূমিকা এবং কিভাবে তাদের সেই বিপ্লবের আন্দোলনে টেনে আনা যেতে পারে' সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটিকে বোঝার কথা। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এই বিষয়টিকেও আমাদের দেশের মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা সাধারণভাবে নিদারুণ অবহেলা করেছেন। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে।

প্রত্যক্ষভাবে যা পেয়েছি তাছাড়া পরোক্ষভাবে যা পেয়েছি সেটাও কম নয়। পরিণত বয়সে তাঁর বইগুলি পড়ে ডঃ ভূপেন দত্তের অবদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। তাঁকে স্বচ্ছন্দে মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারত-বিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ বলা চলে। ভারত-বিদ্যা অর্থাৎ ভারতের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাস অধ্যয়ন। বিগত কয়েক দশকে বেশ কিছুসংখ্যক মার্কসবাদে বিশ্বাসী ভারতীয় বিদ্বান এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন। বিষয় ও কালের দিক দিয়ে ভারতবিদ্যার সংজ্ঞাও সম্প্রসারিত হয়েছে। এককালে মনে করা হত ভারতবিদ্যার অর্থ প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে, তাও শুধু দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা। এখন ক্রমশ প্রাচীন থেকে শুরু করে সমকালীন ভারতের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির নানা দিক, বিশেষ করে জনজীবন পর্যন্ত অধ্যয়নের বিষয় রূপে পরিগণিত হচ্ছে। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় এই বিষয়ে, সম্প্রসারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যে অল্প কয়েকজনকে পথিকৃৎরূপে গণ্য করতে হয় তাঁদের মধ্যে ডঃ দত্ত একজন। আমি যতটুকু জানি ডঃ দত্তের সমসাময়িকদের মধ্যে অন্য যাঁরা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে : কে. এম. শেলভাঙ্কর, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং দক্ষিণ ভারতের একজন মার্কসবাদী পণ্ডিত। কিছুদিন

আগে ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মেইনস্ট্রীম' পত্রিকার একটি সংখ্যায় এই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় লেখার সময় তাঁর সঠিক নামটা মনে আসছে না।

আমার মতে ডঃ দত্তের কৃতীর পর্যালোচনা সাম্প্রতিক সংজ্ঞানুসারে মার্কসীয় দৃষ্টিতে গবেষণারত ব্যক্তিদের সামনে একটি পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরতে তথা দিক নির্দেশে সহায়ক হবে। তিনি অধ্যয়নের বিষয়টিকে আদৌ পুঁথিগত গবেষণা হিসাবে দেখেন নি, দেখেছেন সমাজবিপ্লবের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে। "ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি" নামক বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "অতীতকে না জানিলে বর্তমানের সমস্যাসমূহ বোঝা যায় না এবং বর্তমানের ত্রুটি নিবারণের জন্য ভবিষ্যতের গঠনমূলক আদর্শের চিত্র অঙ্কিত করা যায় না। এই জন্যই আজ সোভিয়েট রুশে সেই দেশের অতীতকে বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা চলিতেছে"।

ডঃ দত্ত চেয়েছিলেন ভারতের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কসীয় তত্ত্বকে প্রয়োগে করতে। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষক ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতের যে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলিকে তুলে ধরার কাজে তিনি প্রবৃত্ত হন। সেই সঙ্গে আর একটি কথাও বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি অতীতকে বিশ্লেষণের কাজে কোনরকম ছুঁৎমার্গ তথা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। German Ideology নামক গ্রন্থের শেষে মার্কস বলেছেন "It is necessary to study all social phenomenon in its hlstorical context in order to understand why, how and what for, this phenomenon appeared in this particular context." অর্থাৎ সমস্ত সামাজিক প্রপঞ্চ বা ঘটনাকে তার ঐতহাসিক পটভূমিতে বিচার করে দেখা প্রয়োজন—কেন, কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উক্ত প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়েছিল তা বোঝার জন্য।

এদেশের মানুষ যে ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত, যে সব দৃষ্টান্ত ও উপমার সঙ্গে পরিচিত সেগুলির সঙ্গে মিল রেখে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শকে প্রচারের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। দেখাতে চেয়েছিলেন এ দেশের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগসন্ধিতে প্রগতিশীল চিন্তানায়কেরা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হল মার্কসীয়

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজীতে "Swami Vivekananda-Prophet and Patriot" এবং পরে বাংলায় "স্বামী বিবেকানন্দ" বই দুটি রচনা করেন। স্বামীজীর চিন্তার যে সবদিক মানুষকে সমাজতন্ত্র অভিমুখী হতে সাহায্য করে, সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়, মানুষের চিন্তাকে অন্ধ সংস্কারের তথা সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধির শৃঙ্খল মুক্ত হতে সাহায্য করে—সেই দিকগুলিকে তিনি সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেছেন ঐ বই দুটিতে।

একক চেষ্টায়, নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে ডঃ দত্ত যে উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন, যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে সেগুলির পর্যালোচনা করাই হবে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক

কমরেডগণ, আলোচ্য সময়ে পার্টি'র আন্তর্জাতিক কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলসমূহের মধ্যে আমরা ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত হওয়া দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার সুস্পষ্ট সম্প্রসারণকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এই দেশগুলি অত্যন্ত স্বতন্ত্র ধরনের। মুক্তিলাভের পর কতকগুলি দেশ বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করছে। অন্যগুলোতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক মূল বিস্তার করেছে। এদের কেউ কেউ সত্যিকারের স্বাধীন নীতি অনুসরণ করছে, আবার অন্যেরা আজ নেতৃত্ব নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি থেকে। সংক্ষেপে বললে, চিত্রটা বেশ খানিকটা তালগোল পাকানো।

প্রথমে সমাজতন্ত্র-অভিমুখী রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে অর্থাৎ যারা সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেছে নিয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এদের সংখ্যা বেড়েছে। প্রগতিশীল পথে বিকাশ ঘটা অবশ্য সব দেশের বেলায় একই রকম নয়, এবং তা এগোয় কঠিন পরিস্থিতিতে। কিন্তু প্রধান ধারাগুলি একই। সেগুলো হল, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির, স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়ার ও সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের প্রতিষ্ঠা ক্রমে নির্মূল করা, এবং বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করা। সেগুলি হল, জনগণের রাষ্ট্র কর্তৃক আর্থব্যবস্থায় কর্তৃত্বের শিখরদেশ অর্জন করা এবং উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর পরিকল্পিত বিকাশ ঘটানো, আর গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ দান করা। সেগুলি হল, সমাজে শ্রমজীবী জনগণের ভূমিকাকে বাড়ানো, এবং জনসাধারণের প্রতি বিন্যস্ত জাতীয় কর্মিবাহিনীর সাহায্যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ক্রমে শক্তিশালী করা। সেগুলি হল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি। শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের স্বার্থ বাস্তবায়ী বিপ্লবী পার্টিগুলো সেখানে শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

আলোচ্য কালপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন আঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক, আফগানিস্তান এবং ইয়েমেন জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছে। সম্প্রতি সিরিয়ার সঙ্গে এক মৈত্রী ও সহযোগের চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি যে সোভিয়েত-সিরিয়ান মৈত্রী এগিয়ে নিতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভালভাবেই সহায়ক হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে আমাদের ব্যাপক-পরিধির পারস্পরিক সুবিধাজনক অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা রয়েছে। আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে কোন না কোন-ভাবে সোভিয়েত অংশগ্রহণে ওই দেশগুলিতে বিরাট বিরাট প্রকল্প নির্মাণের উপর।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সম্পূর্ণ হওয়া প্রকল্পের মধ্যে অনেকগুলিই সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থব্যবস্থার পক্ষে বড়, এমনকি গুরুত্বপূর্ণও। সিরিয়ার আলখাওয়ারা জলবিদ্যুৎ সমাহার তার অন্যতম। সে দেশে উৎপন্ন বিদ্যুতের ৭০ শতাংশেরও বেশি এটিতে উৎপাদিত হচ্ছে। অপর কয়েকটি হল আলজেরিয়ার ২০ লক্ষ টনে সম্প্রসারিত ইস্পাত কারখানার দ্বিতীয় পর্যায় এবং বছরে ২৫ লক্ষ টন বক্সাইট উৎপাদনকারী গিনির একটি কারখানা।

ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, দক্ষ শ্রমিক, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতিদের প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে অনেকগুলি সদ্যস্বাধীন দেশকে সাহায্যদানের ব্যাপারে আমাদের দেশ চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছে না।

হাজার হাজার সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ মনপ্রাণ সমর্পণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের নির্মাণক্ষেত্রগুলিতে, শ্রমশিল্প ও কৃষিতে, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করে চলেছেন। তাঁরা তাঁদের মহান সমাজ-তান্ত্রিক মাতৃভূমির যোগ্য প্রতিনিধি। আমরা তাদের জন্যে গর্বিত, এবং আন্তরিকভাবে তাঁদের সাফল্য কামনা করছি।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মিলে, আমরা সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষা সামর্থ্য শক্তিশালী করতেও সাহায্য করছি, অবশ্য তারা এধরনের সাহায্য চাইলে তবেই। যেমন, অ্যাঙ্গোলা ও ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছে। অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবে উস্কানি দিয়ে কিংবা বাইরের আক্রমণের সাহায্যে এইসব দেশে জনগণের বিপ্লব ধ্বংস করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। আমরা বিপ্লব রপ্তানির বিরোধী, আর কোনো প্রতিবিপ্লব রপ্তানিও আমরা মেনে নিতে পারি না।

সাম্রাজ্যবাদ আফগান বিপ্লবের বিরুদ্ধে সত্যিকারের এক অঘোষিত যুদ্ধ

শুরু করেছে। এটা আমাদের দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তার প্রত্যক্ষ বিপদের সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে ওই বন্ধু দেশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাকে সামরিক সাহায্য দিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

আফগানিস্তানের শত্রুদের পরিকল্পনাগুলি ভেস্তে গেছে। কমরেড বাবরাক কারমালের নেতৃত্বে পীপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির ও আফগানিস্তানের সরকারের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিন্যস্ত সুচিন্তিত নীতি জনগণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে।

সোভিয়েত সামরিক বাহিনী সম্পর্কে বলা যায়, আফগান সরকারের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা তা প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত। এটা করার আগে, আফগানিস্তানে প্রতিবিপ্লবী দস্যুদলের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। আফগানিস্তান ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে সহমতের মাধ্যমেই এটা সুনিশ্চিত করতে হবে। নতুন করে যে কোনো হস্তক্ষেপ হবে না তার নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি প্রয়োজন। এটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের মৌলিক অবস্থান, এবং আমরা এই অবস্থানের প্রতি অবিচল।

ইরাণে বিপ্লব হালের বছরগুলির আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে একটি প্রধান ঘটনা। এর একটা সুনির্দিষ্ট চরিত্র আছে। এই বিপ্লব যতই জটিল ও পরস্পর-বিরোধী হোক না কেন, এটা অপরিহার্যরূপেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব, যদিও দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়া এই বৈশিষ্ট্যকে পাল্টে দিতে চাইছে।

মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে ইরাণের জনগণ তাঁদের নিজস্ব পথের সন্ধান করছেন। আমরা আন্তরিকভাবে তাঁদের সাফল্য কামনা করি, এবং সমানাধিকার আর, অবশ্যই, পারস্পরিক আদান-প্রদানের নীতির ভিত্তিতে ওই দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আমরা প্রস্তুত।

হালে প্রাচ্যের কতকগুলি দেশে সক্রিয়ভাবে ইসলামী শ্লোগানগুলি তোলা হচ্ছে। আমরা কমিউনিস্টরা ইসলাম কিংবা অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে খুবই শ্রদ্ধা করি। আসল কথাটা হল কি উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন শক্তি নানা ধরনের শ্লোগান তুলছে। ইসলামের পতাকা মুক্তির জন্যে সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে পারে। তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে, একেবারে হালের ইতিহাসেও। কিন্তু এটাও দেখা গেছে যে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ঘটানোর জন্যেও প্রতিক্রিয়া ইসলামী শ্লোগানগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে। ফলে, সমস্ত জিনিসটা নির্ভর করছে কোনো আন্দোলনের প্রকৃত বিষয়বস্তুর উপর।

কমরেডগণ, সদ্যস্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারতের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতাকে একটা বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিষয়ে ওই বৃহৎ দেশটির ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে আমরা স্বাগত জানাই। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক-বন্ধন সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। আমাদের দুই দেশেই, সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী এক গভীর-মূল জনপ্রিয় ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় নেতৃ-সঙ্গে হালের আলাপ-আলোচনার ফলে, সোভিয়েত-ভারত সম্পর্কের সমগ্র পরিসরই আরো যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে।

শান্তিকামী ও স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম সোভিয়েত বৈদেশিক সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে থাকবে।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে এবং, বলতে গেলে, 'আসিয়ান'-ভুক্ত অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পথে আমরা কোনো বাধা দেখছি না।

বিগত পাঁচ বছরে আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান ও ওসিয়ানিয়ায় দশটি নতুন রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের। জিম্বাবুয়ে প্রজাতন্ত্রের জন্ম, নামিবিয়ায় এবং এখন দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রেও মুক্তি সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে 'ক্ল্যাসিক' উপনিবেশবাদী ও জাতি-বর্ণবিদ্বেষীদের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলি তাদের স্বাধীনতা সংহত করছে, এই ঘটনায় সাম্রাজ্য-বাদীরা খুশি নয়। ওই দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে ব্যবহার করার এবং নিজেদের রণনৈতিক ষড়যন্ত্রে তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ওই দেশগুলিকে নিজেদের রথে বেঁধে রাখার জন্যে হাজারো ভাবে চেষ্টা করে চলেছে। একাজ করতে গিয়ে, তারা বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার পুরনো ঔপনিবেশিক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে।

কার্যত, ইরান-ইরাক যুদ্ধে পশ্চিমী মনোভাবও এটাই। দুই দেশের স্বার্থের দিক থেকে দেখলে সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন এই যুদ্ধ চলছে পাঁচ মাস ধরে। কিন্তু এতে বিরাট সুবিধা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের, সে ওই অঞ্চলে তার দৃঢ় অবস্থান

কোনক্রমে পুনরুদ্ধার করতে উদগ্রীব। আমরা আশা করতে চাই যে ইরাকও ইরাণ উভয়েই এ থেকে যথাযথ সিদ্ধান্ত টানবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চিতরূপেই যতশীঘ্র সম্ভব এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান, এবং এই সংঘাতের রাজনৈতিক মীমাংসা দেখতে চায়। বাস্তবেও আমরা একে সহজতর করার প্রয়াস চালাচ্ছি।

এবার মধ্যপ্রাচ্যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। মধ্যপ্রাচ্যে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড নীতির, আরব দুনিয়াকে বিভক্ত করা এবং ইজরায়েল ও মিশরের মধ্যে আলাদা চুক্তি সম্পাদনের পথ নিয়েছে। মার্কিন কূটনীতি এই আলাদা-আরববিরোধী চুক্তিকে পরাজিতের মনোভাবের ধরনের এক ব্যাপকতর চুক্তিতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সে সফল হয়েছে অন্যভাবে ; এই অঞ্চলে নতুন করে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সমস্যার মীমাংসাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে পিছনে।

এখন কি হবে ? আমাদের মতে, কাজ শুরু করার এটাই উপযুক্ত সময়। এক সর্বাঙ্গীন ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবসম্মত মীমাংসার জন্যে সৎ যৌথ অনুসন্ধান আবার শুরু করার উপযুক্ত সময় এটাই। এই পরিস্থিতিতে এটা করা যাবে, ধরুন, বিশেষভাবে আহূত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কাঠামোর মধ্যে।

গঠনমূলক মনোভাব ও শুভেচ্ছা নিয়ে এই ধরনের কাজে অংশ নিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত। অন্যান্য আগ্রহী পক্ষের—আরব জাতিগুলি (স্বভাবতই প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা সমেত) ও ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে একাজ করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা প্রস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিতভাবে এই ধরনের অনুসন্ধান চালাতে—আর আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কয়েক বছর আগে এ ব্যাপারে আমাদের কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ইওরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে, এবং আর যারা মধ্যপ্রাচ্যে এক ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি অর্জনে আন্তরিক প্রয়াস চালাচ্ছে তাদের সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।

রাষ্ট্রসংঘও, স্পষ্টতই, এইসব ব্যাপারে কাজের ভূমিকা পালন করে যেতে পারে।

মোদ্দা কথা হল, আমরা এখনও এব্যাপারে প্রত্যয়শীল যে মধ্যপ্রাচ্যে যদি প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে ইজরায়েলকে ১৯৬৭ সালে দখল করা

সমস্ত আরব ভূখণ্ড ছেড়ে দিতেই হবে। প্যালেস্টাইন আরব জনগণের অলঙ্ঘনীয় অধিকারগুলিকে—তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কম তো নয়-ই—অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। ইজরায়েল সমেত এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করা অপরিহার্য। এগুলি মূল নীতি। খুঁটিনাটি বিষয়গুলি স্বভাবতই বিবেচনা করতে হবে আলোচনার সময়ে।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন—যা এবছর তার বিংশতিতম বার্ষিকী পালন করছে—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল এবং আছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী এবং যুদ্ধ ও আগ্রাসন-বিরোধী অভিমুখীনতাই এর শক্তির উৎস। আমাদের এই দৃঢ়প্রত্যয় রয়েছে যে এইসব মূল নীতির প্রতি নিষ্ঠাই বিশ্ব রাজনীতিতে এই আন্দোলনের আরও ভূমিকা বৃদ্ধির চাবিকাঠি—এবং আমরা একে স্বাগত জানাব।

৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্বতন উপনিবেশ দেশগুলি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রশ্নটি তোলে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে, সমানাধিকারের নীতি নিয়ে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠন ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে অনেক কিছু করা যেতে পারে আর তা করতেই হবে। আর, নিশ্চিতরূপেই, এই প্রশ্নটিকে নিছক "ধনী উত্তর" ও "গরিব দক্ষিণ"এর মধ্যে পার্থক্য টানার পর্যায়ে নামিয়ে আনা চলবে না, যা কখনো কখনো করা হয়ে থাকে। সমানাধিকারসম্পন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে আমরা প্রস্তুত, এবং কার্যত অবদান রাখছি।

কমরেডগণ, এ বিষয়ে কারুরই কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রবর্ধনের এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী সুদৃঢ়তর করার কর্মনীতি সুসঙ্গতভাবে চালিয়ে যাবে।**

(ব্রেজনেভ কর্তৃক প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির
রিপোর্টের অংশবিশেষ)

সোভিয়েত সমীক্ষা :
মার্চ ১১, ১৯৮১ থেকে গৃহীত

ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে সোভিয়েত ভাষ্য : প্রামান্য গবেষণা

ভারতে শিল্পায়ন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ যথার্থভাবে এখনও অপ্রণীত। যেটুকু ইতিপূর্বে পেরেছেন যিনি, তিনি হলেন প্রয়াত মারাঠী অর্থশাস্ত্রবিদ ডি আর গ্যাডগিল, অথচ খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রায় সব বিভাগেই উল্লেখ্য গবেষণা গ্রন্থ/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েত অর্থ-বিজ্ঞানী জি শিরোকভ* এদিক থেকে একটা বড় অভাব পূরণের কাজ অনেকটা সমাপন করেছেন। ভারতে শিল্পায়নকে সামগ্রিকভাবে ইতিপূর্বে কেউ বিচার করেন নি, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তো নয়ই।

প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতোত্তর কালের শিল্পবিকাশের ধারাকে লেখক পৃথকভাবে আলোচনা করে সবশেষে শিল্পায়নের অন্তর্নিহিত সূত্র নির্দেশ করেছেন। শিল্পায়নের ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে তিনি মৌলিকত্ব নিয়ে দেখেছেন। এ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই দেখা যায় ভারতে শিল্পায়নের ঝোঁক, যার প্রধান বিশিষ্টতা আমদানী নির্ভরতা কমানো। এর একটি কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে পণ্যসামগ্রী আমদানী প্রায় বন্ধ হবার দরুন স্বয়ম্ভর শিল্পায়নের প্রবণতা দেখা দেয়। শিরোকভ দেখিয়েছেন যে আমদানী নির্ভরতা কমানো এবং ভারী শিল্পের উপর জোর পরস্পর সম্পর্কিত, ভারতে অর্থনৈতিক যোজনা ভাবনার জনক এস বিশ্বেশ্বরাইয়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ভাবী শিল্পের উপর প্রাধান্যদানের কথা বলেছিলেন বিশের দশকে (পৃঃ ৫৬-৫৮)। পরবর্তীকালে যোজনার কাঠামোগুলিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভারী শিল্প গড়ে তোলার কথা বলা হয়।

ভারতে শিল্পায়নের সমস্যাবলী যে মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনের অবদান, শিরোকভ এদিকটা নানাভাবে দেখিয়েছেন। অনেকে মনে করেন

---

* G. K. Shirokov : Industrialisation of India—Peoples Publishing House, Delhi, 1980 (p p 325) Rs. 20/-

যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সৃজনশীল অবদান অনেক। লেখক সেই ধারণার মূলে আঘাত করেছেন। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে যখন দেশীয় মালিকানায় শিল্প সংস্থাগুলি গড়ে উঠছিল এবং দেশীয় চাহিদার পরিমাণে প্রসার লাভ করছিল (যার আগে বিদেশী বাজারের দিকে চোখ রেখেই শিল্পসংস্থা স্থগিত হয়েছিল বিদেশী লেয়ার পুঁজিতেই), তখন (১৮২৬) ব্রিটিশ সরকার দেশজ তুলার উপর আবগারী শুল্ক বসালেন, যাতে দেশীয় বাজার মার খায় এ অবস্থায় নতুন শিল্পসংস্থাগুলি চালানো খুব কঠিন হয়ে উঠল, বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রচুর অর্থ লোকসান দিতে হল (পৃ ২২-২৩)।

আজ বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে এত কথা উঠেছে তার ভিতও তৈরী করেছে ইংরেজ সরকার। স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে শুধু চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক কম ছিল এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিব্যয় ছিল বিশ্বে সর্বোচ্চ (পৃ ৪০)। বরং বামপন্থী হিসেবে পরিচিত কিছু কিছু গবেষক ও পণ্ডিত এখন ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে 'বেনেভোলেন্ট ডেসপট, হিসেবে বর্ণনা করেন, এর বাস্তবভিত্তি নেই। আছে নয়া-উপনিবেশবাদের পদলেহিতা। শিরোকড তথ্য সহকারে বলছেন : "ব্রিটেন চেয়েছিল ভারতকে শহরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কৃষি ও কাঁচামাল সরবরাহের বশংবদ উৎস করতে। এতে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের বিশেষ কৃষকদের উপর শোষণ বাড়ল এবং তাদের সঞ্চয় ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হল। এতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও আধুনিক প্রকৌশল প্রচলন কমে এলো।" (পৃ ১৫)।

লেখক যেমন ভারতের শিল্পায়নের সদর্থক দিকগুলি দেখিয়েছেন তেমনি বারবার নানা দিক থেকে দেখিয়েছেন শিল্পায়নের উপর পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসরণের বিষময় ফল। বহুস্তর কাঠামো বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায় (সম্ভবত জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত চরিত্র থাকার জন্য) শিল্পায়নের লক্ষ্যমাত্রা সব সময়ই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। যেমন শিল্প লাইসেন্স প্রথার কথা। শিল্প লাইসেন্স ব্যবহার করেছে মালিক শ্রেণী, তাতে রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির চেয়ে ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হয়েছে। লাইসেন্স প্রথার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা-যোগান সুসমন্বয় প্রতিযোগিতা হ্রাস ও সামাজিক পুঁজির কাম্য বিনিয়োগ। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্প ধ্বংস অবরোধও প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু পুঁজির অভাবে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি দক্ষতার সঙ্গে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে নি।

৬০ দশকের মধ্যভাগে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকের বেশী অপ্রযুক্ত। শিরোকভ লিখেছেন : "নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাধারণ অপারগক্ষমতা বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের উপর প্রভাব ফেলেছে। সামগ্রিকভাবে লাইসেন্স প্রথার এক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বাধীন শিল্প সংস্থাগুলিতে নতুন পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ করেছে, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এরা (অর্থাৎ বুর্জোয়ারা—শ. রা) পুঁজি থাকা সত্ত্বেও পুঁজি স্থানান্তর করে বিনিয়োগ করে নি (পৃ ৭৫)। লেখক বলছেন যে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ বৃহৎ পুঁজিপতিদের শিল্প ক্ষেত্রের সংকুচিতা ও একচেটিয়া মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ নীতি শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদী প্রবণতার জন্ম দিয়েছে (পৃ ৭৭)। তিনি ভারতের ক্ষুদ্রশিল্প সমীক্ষা করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সোভিয়েত গবেষকেরা তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন ক্ষুদ্রশিল্পের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর (অর্থাৎ নিম্নস্তর হতে পুঁজিতান্ত্রিক প্রকৃতিতে বিকাশ), কিন্তু সমস্যার জটিলতার অনেক কিছু এখনো অনির্নীত (পৃ ২৬৮)। অবশ্য বহুস্তর কাঠামো বিশিষ্ট ভারতের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার একটি বিশিষ্টতাও উল্লেখ করেছেন। "উন্নত দেশগুলিতে ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদন পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে সংগঠিত, ভারতে তা বস্তুত প্রাক পুঁজিতান্ত্রিক অথবা ভ্রূণগতভাবে পুঁজিতান্ত্রিক" (পৃ ২৬৯)। স্বভাবতই ভারতে বৃহৎ শিল্পের আধুনিক প্রকৌশলের পাশাপাশি প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষুদ্র শিল্পগুলি রয়ে গেছে শিল্পপুঁজির একক পুনরুৎপাদন পদ্ধতির (single process of reproduction) অঙ্গ।

অনেকের ধারণা আছে যে ক্ষুদ্র শিল্পকে সুযোগ দান ভারতের শাসকশ্রেণীর প্রগতিশীল চরিত্রের পরিচায়ক। অধ্যাপক শিরোকভ এ ধারণার সঙ্গে একমত নন। তিনি মনে করেন যে বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজিনিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিকে সাহায্য করার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের পক্ষপাতী, শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন : "The capitalist industrialisation inevitably ruined the most primitive forms of small-scale production. Since mass unemployment in India was rife and the growth rate of employment in other forms of production was extremely low, grave social tension threatened which could have undermined the position of the ruling class. Therefore it was in the interest

of the ruling class in general to encourage small-scale production." (পৃ ১১৫)।

তাছাড়া ভারতে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার অন্তরালে বৃহৎ পুঁজির শোষণ জাতীয় বুর্জোয়াদেরই ইপ্সিত। যেমন অনেক সংস্থা আছে যেগুলি আইনত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ সংস্থা। যেমন ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা লাভ করেও ভারতের বৃহত্তম ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক নির্মাতা 'ঈগল ফ্লাস্ক' ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে পরিগণিত হত, কারণ যন্ত্রপাতি বিনিয়োগের সীমা ১০ লাখ টাকার মধ্যে হলে যে কোন সংস্থাই ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে গণ্য হতে পারত (এখন এ সীমা ২০ লাখ টাকায় বর্ধিত হয়েছে)।

মাঝারি শিল্প সম্পর্কে সোভিয়েত গবেষকের পর্যবেক্ষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সংকর ইস্পাত, ফর্জিং, কাস্টিং প্রভৃতি নির্মাতা মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলির বিকাশ হার স্বল্পতম। এ সংস্থাগুলি প্রাথমিক উপকরণ থেকে তাদের বিপণনযোগ্য পণ্য তৈরী করত। কিন্তু এই সংস্থাগুলি আনুপাতিকভাবে কম যেজন্য প্রাথমিক উপকরণগুলি অব্যবহৃত থাকত। এ কারণে ভারতে পুনরুৎপাদনের পূর্ণবৃত্ত অসম্পূর্ণ (পৃ ১৮৫)। ভারতে শিল্পায়নের একটি বড় ত্রুটি এখানেই।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে অধ্যাপক শিরোকড সংক্ষিপ্ত অথচ মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন যে জাতীয়করণে ভারতের আর্থ-কাঠামোর পরিবর্তন হয় না এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর সরকারী প্রভাব বৃদ্ধি করে (পৃ ১২৭)। বুর্জোয়া সরকার অনেক শিল্প (যা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল) গড়ে তোলার জন্য প্রথমে বেসরকারী পুঁজিপতিদেরই আহ্বান করেছিলেন (পৃ ১২৮-২৯)। তিনি আরো একটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি ধারণা চালু আছে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র মুনাফার জন্য নয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক শিরোকডের মন্তব্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ "যখন ভারতে প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি (অর্থাৎ—রাষ্ট্রীয় সংস্থা-শ. রা) গড়ে উঠেছিল, তখন পণ্যমূল্য নির্ধারিত হত ফেবিয়ান 'না-লাভ-না-লোকসান' নীতিতে অর্থাৎ বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হত প্রকৃত পরিব্যয় অনুসারে। তত্ত্বগতভাবে, এর যৌক্তিকতা আছে কারণ উৎপাদনী উপায়গুলির ওপরতুকি-প্রদত্ত বিপণন বাড়িয়ে তোলে ভোগ ও আর্থ-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করে। কিন্তু একটি বহু স্তর কাঠামোবিশিষ্ট আর্থব্যবস্থায় 'না-লাভ

না-লোকসান' নীতির পরিণাম গুরুতর। উৎপাদন উপায়ের ভরতুকি প্রধানত ভোগ করে পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো, আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রসারের অর্থ আসে আর্থব্যবস্থার নিম্নতর কাঠামোয় উৎপন্ন তহবিলের পুনর্বণ্টনে," (পৃ: ১৪০)।

তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বিকাশের সদর্থক দিকগুলি দেখিয়েছেন যেমন তেমনি এমন কথা বলেন নি যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র প্রসারের উদ্যোগ প্রগতিশীল ভাবধারার সুনিশ্চিত পরিচয়। তিনি বরং তার ভ্রান্ত বিকাশ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন :

"ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র তার আমলাতন্ত্র ও নিম্নস্তর কার্যক্ষমতার জন্য পরিচিত। মোট পুঁজিবিনিয়োগ, এবং মোট ও নীট জাতীয় উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভাগ যত বাড়বে, তত এমন একটা অবস্থা আসবে যখন সামাজিক উৎপাদনের কার্যকারিতা কমবে ও দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে মন্থরতার সাথে সাথে পুঁজি-নিবিড়তা দ্রুত হ্রাস পাবে। এর একমাত্র নির্গমন পথ হল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রশাসন গণতন্ত্রীকরণ ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির পরিচালনার উন্নয়ন। কেবল তখনই এ সংস্কারের প্রগতিশীল সম্ভাবনা বোঝা যাবে' (পৃ: ৩১৩)।

বলা বাহুল্য, ভারতের কোনো ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া সরকারই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকে পালটে গণতান্ত্রিক প্রশাসন কায়েম করতে আদৌ আগ্রহী নয়। ড. শিরোকভের এ উক্তি বাস্তব ও সঠিক।

এ গ্রন্থটি গবেষক মহলে সমাদৃত হয় নি, কারণ তাদের কাছে এ বইটি তেমনভাবে পৌঁছায় নি। মাকারিপনার ভীড়ে এই উল্লেখ্য গবেষণা অবলোকিত হয় নি। কিন্তু গবেষক, ব্যবহারিক রাজনীতিবিদ এমনকি গণতন্ত্রপ্রিয় ছোট শিল্পপতিদের এ গ্রন্থটি সুখপাঠ্য, মতান্তর হতে পারে, কিন্তু মতান্তর গুণাবলীর প্রতিভাস নয়।

শঙ্কর রায়

সম্পাদকীয়

বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির সপক্ষে

"ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না—এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না ?···

"ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না, কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন ?"

রবীন্দ্রনাথ

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার একমাত্র বাহন ঘোষণা করা এবং এই স্তর থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়া সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমরা তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার জের হিসাবে শিক্ষার সর্বস্তরে, এমনকি, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত, প্রকারান্তরে ইংরেজীর প্রাধান্য সংরক্ষণ করার একটি প্রবণতা এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদদের মধ্যে আজও দেখা যায়। আসলে, এঁরা এক "এলিটিষ্ট" (elitist) শিক্ষা-রীতি চালু রাখার পক্ষপাতী। শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে, নিরক্ষর কৃষকসমাজে শিক্ষার আলো ছড়াতে হলে, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা, এই ইংরাজীর প্রাধান্যের উপর অবিলম্বে আঘাত হানার প্রয়োজন। বামফ্রন্ট সরকার যে সাহস করে এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন, এতে আমরা বিশেষ খুশী হয়েছি। বামফ্রন্টের এই শিক্ষানীতি "এলিটিষ্ট" শিক্ষারীতির বিরুদ্ধে একটি আঘাত মনে করেই আমরা তাকে সমর্থন জানাই। আমরা মনে করি, এই সিদ্ধান্ত গ্রামের অসংখ্য মানুষদের মধ্যে, নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে, শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার কাজকে সহজ

করবে। এক অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে শিক্ষাকে এক স্বাভাবিক পরিবেশে নিয়ে এসে এই ব্যবস্থা সমাজের অধিকাংশের পক্ষে কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

আমরা মনে করি, প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরেই মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। বাংলা ভাষা অনুন্নত —এই অজুহাতে যাঁরা ইংরেজী শিক্ষার প্রাধান্যের পক্ষে ওকালতী করেন— আমরা তাঁদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা মনে করি, বিজ্ঞান শিক্ষা সমেত সর্ববিষয়ে বাংলাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে, বাংলা ভাষাকে ক্রমেই উন্নত করার জন্যে সচেষ্ট থাকা কর্তব্য।

আমরা বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। বাংলা ভাষাকে একটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় উন্নীত করাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।

একটি বিষয়ে আমরা সকলকে সতর্ক থাকতে বলি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগের অসৎব্যবহার করে শিক্ষার মান কমিয়ে আনা চলবে না। শুধু ব্যাকরণ নয়, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তার সঙ্গেও আমাদের ছাত্রদের পরিচিত করে তুলতে হবে, সাহিত্যের মানবিক সম্পদে তাদের মন ভরিয়ে তুলতে হবে।

পশ্চিম বাংলার সরকারী ভাষা বাংলা। কাজেই সমস্ত সরকারী ও আধা-সরকারী কাজকর্ম বাংলা ভাষাতেই করতে হবে।

চাকরি অথবা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা চলবে না, বাংলা ভাষাকে পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, আমরা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী নই। বিশেষ করে, ঐতিহাসিক কারণে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার আজও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় জ্ঞানের আলো এসেছিল; রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাঙলার জাগরণের সারথিরা—আকণ্ঠ পান করে তাকে আত্মস্থ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। আজও ইংরেজী শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে আজও আমরা ইউরোপীয় ভূখণ্ডে, ও এশিয়া-আফ্রিকা আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে, চিন্তাক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। তাই ইংরেজী ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদাদানের আমরা পক্ষপাতী।

তবে, আমরা মনে করি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণী থেকে

চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই, বরং তা ক্ষতিকর। বিদেশী ভাষা হলেও বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশে ইংরেজীর যে গুরুত্ব এখনও আছে তা বিবেচনা করে আমরা মনে করি—মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা আবশ্যিক আছে ও থাকাই উচিত। ইংরেজী শিক্ষার আধুনিক ও উন্নততর পদ্ধতির ব্যবহার করলে এই সাত বা আট বছরে ইংরেজী অবশ্যই ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কোনো বৈষম্য রাখলে চলবে না। মাতৃভাষা যাদের ইংরেজী তাদের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রেই প্রাথমিক স্তরে কোনো বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা রাখা চলবে না। "ইংলিশ মিডিয়াম" স্কুলগুলি 'এলিটিস্ট' শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে। বামফ্রন্ট সরকারকে এই বৈষম্যমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মকে ক্রমশ সংকুচিত করে আনার নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সংবিধানের গণ্ডীর মধ্যে থেকে আইন করে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সরকার নিতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও উন্নতি ঘটানোর কাজ সরকারী শিক্ষা নীতিতে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়ের একটি প্রবল অংশ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। এই সূত্রে বলা দরকার—প্রাথমিক শিক্ষা শুধু অবৈতনিক করলেই চলবে না, একে ক্রমশ বাধ্যতামূলক করে তুলতে হবে। সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই একটি জাতীয় কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমরা জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী অধিবাসী অথচ বাঙলা ভাষাভাষী নন—যেমন নেপালী, সাঁওতাল প্রভৃতি তাঁদের ক্ষেত্রেও নিজ নিজ মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে মেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে, একটি সুস্থ ও সুসমঞ্জস শিক্ষানীতি পশ্চিমবঙ্গে চালু করুন—বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এটিই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

পরিমলচন্দ্র ঘোষ

পরিমলচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হল তা সত্যিই অপূরণীয়। যে কজন "মূল্যায়ন"-এর প্রাণ-স্বরূপ, তিনি ছিলেন তাদের একজন।

আজীবন তিনি রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপনার কাজে বৃত ছিলেন। রাজনীতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস-বাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে যাঁরা এদেশে অগ্রণী হয়েছেন তিনি তাঁদেরই একজন। বাঙলা ভাষায় রাজনীতি-বিজ্ঞানের চর্চা ও পঠন-পাঠনকে তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র ও সহকর্মী "কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার কর্ণধার হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুধু পঠন-পাঠনের মধ্যে তিনি তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি কলম ধরেছিলেন মেহনতী মানুষের স্বার্থে।

মার্কসবাদকে তিনি গ্রহণ করেন জীবন দর্শন হিসাবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃত্রিম বন্ধু।

তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ হারাল এক নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, আদর্শগত প্রাণ এক পুরুষকে, প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন এক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীকে।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

Jan ... 1981 R. N. 1378

শিক্ষার সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকার

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কি অর্জন করা গেছে—শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ, সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ে বেতন।

৩৪০০ বিদ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ, ৩১ লক্ষ শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য, সমস্ত শিশুর জন্য সব ভাষায় বিনামূল্যে বই, খাতা, শ্লেট, মেয়েদের জন্য পোষাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, ১৩,৮০০ নূতন প্রাথমিক শিক্ষক।

৯০০ নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সকলের জন্য সরকারী অর্থে ১৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, খেলাধূলা, বিজ্ঞানাগারের উন্নতি, ১০,০০০ নূতন মাধ্যমিক শিক্ষক। প্রাথমিক স্তরে জীবনমুখী শিক্ষার পাঠক্রম, গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গণতান্ত্রিক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ গঠন।

১৫৭৫টি নূতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার যেখানে মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭০১টি, গ্রন্থাগারগুলির জন্য সাহায্য ১০ গুণ বৃদ্ধি, বেসরকারী গ্রন্থাগারে সাহায্য, কোলকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

—আই. পি. এ ৩০৮৩/৮১—

মূল্যায়ন ১০, বেন্টিঙ্ক রোড, কলিকাতা-১৯ দাম : দুই টাকা